বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি

নাজমা জেসমিন চৌধুরী

আ হ ম দ পা ব লি শিং হা উ স

সূচীপত্র

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস

সপ্তম পরিচ্ছেদ

২৪৪-৩১৮

পূর্ব বাংলার উপন্যাস

ক. মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের পটভূমি ;

খ. বঙ্গভঙ্গ ;

গ. মুসলমানদের ওপর বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ,

ঘ. মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও অবাঙালী নেতৃত্ব ;

ঙ. মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিকাশ ;

চ. রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবাহ ও দ্বন্দ্বের সাহিত্যিক প্রতিফলন ;

ছ. মুসলমানদের আত্মমর্যাদা জাগানোর প্রয়াস, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী —সাম্প্রদায়িক ও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব, কংগ্রেসী কিন্তু উগ্র স্বাতন্ত্র্যপন্থী মুসলমান —তাঁর সমাজের দ্বন্দ্ব : বাঙালীত্বে ও মুসলমানত্বে, তিনি পাকিস্তানবাদী চেতনার বাঙালী প্রতিনিধি ,

জ. কাজী নজরুল ইসলাম —সমাজতান্ত্রিক চেতনা-মণ্ডিত জাতীয়তাবোধ —'মৃত্যুক্ষুধা' —সন্ত্রাসবাদে আস্থা, —'কুহেলিকা' ; অসাম্প্রদায়িক বোধ সত্ত্বেও নজরুল নিজের অজান্তে পাকিস্তানবাদী ধারাকেই পুষ্ট করেছেন ;

ঝ. স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি ;

ঞ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ;

ট. বিভাগোত্তর সমস্যাবলী ,

ঠ ঔপন্যাসিকদের বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষা ও সামন্তবাদী মানসিকতার দ্বন্দ্ব ;

ড. আবুল ফজল —তাঁর উপন্যাসে ভাববাদী সমাজতান্ত্রিক ইঙ্গিত এবং অসাম্প্রদায়িক ;

ঢ আবুল মনসুর আহমদ —সামন্তবাদী মানসিকতা —পুথির আবেগ নিয়ে উপন্যাস রচনা, পাকিস্তানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ;

ণ. সত্যেন সেন —সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি —সংখ্যালঘুদের সমস্যা ও সমবণ্টনে সকল সমস্যার সমাধান হবে এমন ইঙ্গিত ,

ত. আলাউদ্দিন আল-আজাদ —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও পাকিস্তান-পূর্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা, অবৈজ্ঞানিক, ভাববাদী সমাধান ;

থ. সরদার জয়েনউদ্দীন —পাকিস্তান সৃষ্টির অনিবার্য কারণগুলি দেখানো হয়েছে আদর্শবাদী মধ্যবিত্তের চোখে পাকিস্তান-পূর্ব ও পাকিস্তানোত্তর কাল, শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র —লেখক উদারনৈতিক ভাববাদী ফলত সমাধান নেই ;

আমার আম্মা ও আব্বাকে

বাংলা
উপন্যাস
ও
রাজনীতি

উপক্রমণিকা

উপন্যাস হচ্ছে আধুনিক যুগের মহাকাব্য এবং এ কালের সাহিত্যিক রূপকল্প-সমূহের মধ্যে সব চাইতে বিস্তৃত। মহাকাব্যের মতোই এই রূপকল্প সমগ্র সমাজের চিত্র উপস্থিত করবার চেষ্টা করে। সে সমাজ হচ্ছে ঐতিহাসিক সমাজ, অর্থাৎ কল্পিত সমাজ নয়। এ জন্য উপন্যাসে রাজনীতি আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, আর বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি বিশেষভাবেই আসে, কেন না উপন্যাস রচনার প্রাথমিক লগ্নে দেশ ছিল বিদেশীদের অধীন। পরাধীনতা ছিল একটি রূঢ় সত্য। পরাধীনতার সচেতনতা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন রয়েছে তেমনি উপন্যাসেও এসেছে। উপন্যাসে বরং বেশী করেই এসেছে, কারণ উপন্যাসের জীবন-সংলগ্নতা অধিকতর। যে জাতীয়তাবাদী চেতনা স্বাধীনতার জন্য আগ্রহী হয়েছিল সেই চেতনাই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

চূড়ান্ত বিচারে রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের সূচনা-কালে ও পরবর্তী সময়েও আমরা যে-রাজনীতির চর্চা দেখি তা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে তুলে ধরে না। সে রাজনীতি মূলত শ্রেণীস্বার্থের। ঔপন্যাসিকরা সকলেই মধ্যশ্রেণীর কাজেই তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তায় তাঁদেরই শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত। বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে, "আধুনিক ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে"।[১] তাঁর বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার অনাবশ্যক, কিন্তু এই অনুভূতি বঙ্কিম যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেই শ্রেণীর জন্য সত্য। এই অনুভূতি থেকেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। কাজেই এই জাতীয়তাবাদের একটা শ্রেণীগত ভিত্তি ছিল। এই জাতীয়তাবাদ ব্যাপক জনসাধারণকে আপনার সঙ্গে নেয়নি বা জনসাধারণের স্বার্থচেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। জাতীয়তাবাদী ধারণাটা প্রথম দিকে ইংরেজকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে সাহস পায়নি, শত্রু করেছে ইতিহাসের আলোকে প্রতিবেশী মুসলমানদের। এ জন্য জাতীয়তাবাদ একটি সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত চরিত্র গ্রহণ করেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ পরিচয়ে এই জাতীয়তাবাদ পরিচিত বলে এর শ্রেণীগত চরিত্রটা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের অন্তরালে অপ্রকাশিত থেকে গেছে। পরবর্তী-কালের সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমনি এই সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত জাতীয়তা-বাদের ধারার প্রবলতাই আমরা লক্ষ্য করি।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের স্রষ্টাদের অন্যতম। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এই ধারার অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ অন্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। তাঁর চেতনা বুর্জোয়া উদারনৈতিক। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মধ্যে সামন্তবাদী চিন্তাচেতনা প্রবল। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা ভিন্নধর্মী। তিনি শ্রেণীদ্বন্দ্বের বাস্তবতায় বিশ্বাসী এবং এর অনিবার্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ। তাঁর উপন্যাসে তিনি সেই দ্বন্দ্বের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর যে ঔপন্যাসিকদের লেখায় রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দোপাধ্যায়। এঁদের প্রত্যেকের ওপর স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি। রাজনীতিকে উপজীব্য করে এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল এবং মনোজ বসু। একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে এঁদের রাজনীতি বিষয়ক উপন্যাসগুলির পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। আলোচ্য ঔপন্যাসিকরা পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত ও কোথায় স্বতন্ত্র এবং সমাজে প্রবাহিত রাজনৈতিক স্রোতধারার সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক বা রাজনীতিযুক্ত উপন্যাসসমূহের যোগাযোগ কোথায় ও কতটা তা লক্ষ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনীতি বলতে এই আলোচনায় মূলত দেশের শাসনক্ষমতার অবস্থান এবং শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সমঝোতা এবং শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি স্বভাবতঃই একটি মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও গড়ে উঠেছে এবং সেই আন্দোলনের প্রভাবও সাহিত্যে যথাযথ রূপে দেখতে পাওয়া যায়। মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও মধ্যবিত্ত মুসলমানের শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতোই তা জনসাধারণের বৃহৎ স্বার্থকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেনি এবং আপন অবস্থানকে দৃঢ়তর করার প্রয়োজনে হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই জাতীয়তাবাদও একটা সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাঙালী মুসলমান --মধ্যবিত্ত বাঙালী এবং মুসলমান এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রধান করে তুলবে সে বিষয়ে তাদের মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ধর্মীয় পরিচয়টাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর অবাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনাই ক্রমশ মুখ্য হয়ে উঠল। উনিশশো বাহান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এই নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম বিস্ফোরণ।

চারের দশক থেকে বাহান্ন সাল পর্যন্ত সময়কে উপজীব্য করে লেখা পূর্ব বাংলার উপন্যাস এখানে আলোচিত হয়েছে। কারণ তার পরে এতদঞ্চলে রাজ-

নীতির একটা নতুন ধারা প্রবাহিত হয়েছে যার সাহিত্যিক প্রকাশ এখনও সুসংগঠিত হয়নি। এই আলোচনায় তাই স্থান পেয়েছে আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, সত্যেন সেন, আবু রুশ্‌দ, সরদার জয়েনউদ্দীন, আলাউদ্দিন আল-আজাদ ও শহীদুল্লা কায়সারের কয়েকটি উপন্যাস।

এই উপমহাদেশের রাজনীতির ধারার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত রাজনৈতিক চিন্তারও বিবর্তন ঘটেছে। এ কথা মূল উপন্যাসে বিধৃত রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে সত্য, পূর্ব বাংলার উপন্যাস সম্পর্কেও একইভাবে সত্য। দেশের রাজনীতির মধ্যে মধ্যবিত্তের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসের রাজনীতি চিন্তাও মূলত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, অনস্বীকার্য বাস্তববাদিতা সত্ত্বেও বঙ্কিমের চিন্তাধারা ছিল মূলত সামন্তবাদী ও ভাববাদী। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ইংরেজ রাজত্ব চিরস্থায়ী। তাঁর যুগে একদিকে সুযোগপ্রাপ্ত এবং অপরদিকে ইংরেজের বিপুল প্রতাপ ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ দ্বারা প্রভাবিত শ্রেণীর পক্ষে এমন ধারণা করাই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া ইংরেজকে শত্রু হিসাবে জানলেও প্রকাশ্যে সেটা বলার মতো পরিবেশ তখনও ছিল না। সর্বোপরি তাঁর শ্রেণী ইংরেজকে শত্রু রূপে জানতেও চায়নি।

বঙ্গভঙ্গের পর থেকে রাজনীতির সুর চড়া হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র ধরে নিয়েছেন ইংরেজ চলে যাবে। অথচ তিনি সংস্কারবাদী হলেও তারাশঙ্করের মতো আধ্যাত্মিকতা প্রচার করেননি। শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালের হয়েও তারাশঙ্কর বঙ্কিমের সামন্তবাদী ধারাকে আবার সামনে টেনে এনেছেন। তিনি কংগ্রেসী ও গান্ধীবাদী। অবশ্য বঙ্কিম যা বলেননি তিনি তা বলেছেন। ইংরেজকে তিনি শত্রু রূপেই ভেবেছেন কারণ ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা ততদিনে অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনিও বঙ্কিমের মতোই সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান না যাতে তাঁর মতে, শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হবে। তাঁর চেতনা সুস্থির রূপে সামন্তবাদী। বস্তুত তাঁর শ্রেণীর দৃষ্টিতে ইংরেজ যদিও শত্রুপক্ষ তবু সাধারণ মানুষ মিত্রপক্ষ নয়। অর্থাৎ ইংরেজও শত্রু, সাধারণ মানুষও শত্রু।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই লক্ষ্য করি যে, তিনি বুর্জোয়া উদারনীতিকে জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তথাপি তিনি ভাববাদী ধারারই একজন অত্যুজ্জ্বল প্রতিনিধি এবং তাঁর উপন্যাসে তাই বুর্জোয়া উদারনীতির সহযাত্রী হিসাবে আছে আত্মিক উন্নতির ও শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ। স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তিনি কঠিন সমালোচক, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ শত্রু হিসাবে তেমনভাবে চিহ্নিত করলেন না যেমনভাবে শরৎচন্দ্র

করেছেন। সমাজকে তিনি সংশোধন করতে চেয়েছেন ব্যক্তির কল্যাণবুদ্ধিকে জাগ্রত করে এবং আস্থা রেখেছেন মানবিক সেবাধর্মে।

রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্যের পর থেকে সাম্যবাদী চিন্তার প্রতি পৃথিবী ব্যাপী একটা আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে সাম্যবাদী চিন্তার প্রভাব বাংলাদেশে অনেকের ওপর নানাভাবে পড়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাম্যবাদী চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী নন সেহেতু তাঁর পক্ষে যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন সম্ভব হয়নি। শুধু মাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেই আমরা দেখি যে মার্কসবাদী চিন্তা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে নেতৃত্বের। কার নেতৃত্বে আন্দোলন হবে? দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ব্যক্তির সুশিক্ষিত নেতৃত্বে বিশ্বাস রেখেছেন। শরৎচন্দ্রও তাই। তারাশঙ্কর প্রথম দিকে সাম্যবাদের প্রভাবে নেতৃত্ব অর্পণ করেছিলেন নিম্নমধ্যবিত্তের হাতে, পরে ছোট জমিদার ও মধ্যবিত্তের হাতে ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব তুলে দিতে চান উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের হাতে। ভিন্নপক্ষে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তি নেতৃত্বে বিশ্বাস করেন না, কারণ তাঁর মতে ব্যক্তি ক্ষমতাবিহীন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয় অনিবার্য। তাঁর কাছে নেতৃত্ব আপেক্ষিক, কারণ প্রয়োজনানুসারে নেতার উদ্ভব হয় বলে তাঁর বিশ্বাস। এই নেতা শ্রমজীবীও হতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষেও নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভবপর। তাঁর অনেক উপন্যাসে দিয়েছেও, কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব-দানের পূর্বশর্ত হবে শ্রেণীচ্যুতি।

অধিকাংশ প্রধান ঔপন্যাসিক রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কারণ তাঁরা স্বভাবতই বাস্তববাদী। যাঁরা রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাব্যপ্রবণতা অধিক এবং সে কাব্যপ্রবণতা রাজনৈতিক বাস্তবতার অভাবের ক্ষতিপূরণও বটে, আবরণও বটে। এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের নাম উল্লেখ করতে পারি।

পূর্ব বাংলার উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে, কয়েকজন প্রধান ঔপন্যাসিক, যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও শামসুদ্দীন আবুল কালাম, রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহিত ছিলেন না। তাঁরা প্রধানত গ্রামীণ জীবন নিয়ে লিখেছেন কিন্তু গ্রামীণ জীবনের যে সামাজিক চিত্র দিয়েছেন তা রাজনীতি বিবর্জিত। স্বভাবতই আমাদের আলোচনা নন্দনতাত্ত্বিক নয়, দৃষ্টিভঙ্গিটা মূলত সমাজতাত্ত্বিক; তথাপি রচনার শিল্পমূল্যকে উপেক্ষা করা হয়নি, কেন না আলোচনা সাহিত্যিক না হলেও অবশ্যই সাহিত্যকে নিয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পটভূমি

সিরাজদ্দৌলা যখন পলাশীর রণাঙ্গনে ক্লাইভের সঙ্গে জীবন-মরণ যুদ্ধে রত, শোনা যায়, তখন না-কি রণস্থলের নিরাপদ দূরত্বে উপস্থিত ছিল এ দেশের কৌতূহলী নিষ্ক্রিয় দর্শকবৃন্দ। যুদ্ধটা তাদের কাছে সম্ভবত প্রতিভাত হয়েছিল শক্তির ব্যক্তিগত পরীক্ষা রূপে। ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধে প্রজাকুলের ঔদাসীন্য ১৭৫৭ সালের সময়ের এবং তার আগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি স্মারকচিহ্ন। অতীতে ভারতবর্ষের স্বল্পতুষ্ট, স্ব-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক, অপরিবর্তনশীল গ্রামীণ জীবনে রাজকীয় ক্ষমতার লড়াই তেমন বিরাট করে আঘাত হানতে পারত না। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখড়দের প্রাণনাশের কথা সম্ভবত তখনও প্রবাদে দাড়ায়নি। রাজার অদল-বদলে জনজীবনে বিশেষত গ্রামজীবনে বিশাল কিছু পরিবর্তন ঘটত না। রাষ্ট্রচালক সম্বন্ধে এই নিরাসক্তি থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, রাজনীতি সে সময়ে ছিল রাজকীয় ব্যাপার, জনসংযোগ চেষ্টা সে রাজনীতিতে দুর্লক্ষ্য।

পলাশী-পূর্ব বাংলা কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে বণিক ইংরেজ শোষণেচ্ছায় অভিনব কৌশল এ দেশে প্রয়োগ করতে শুরু করল। আগে রাজার দায়িত্ব ছিল রাজ্য রক্ষা। রাজা পরাজিত হলেও প্রজার অবস্থানে যে নিরাপত্তা ছিল ইংরেজ বণিক রাজা হয়ে সেই নিরাপত্তার মূল শিকড়ে কুঠারাঘাত হানলো। ইংরেজের আগে যারা এ দেশে বিজয়ী হয়ে এসেছে তারা এ দেশেরই অধিবাসী হয়ে গিয়েছিল। ধন-সম্পদ অপচয়িত হলেও তা ভারতবর্ষের মাটিতে হয়েছে। ইংরেজ একাধারে হয়ে দাঁড়াল শাসক এবং শোষক —ভারতবর্ষের সম্পদ ভারতবর্ষের বাইরে পাচারকারী। প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো সে ভেঙে দিল নিজের স্বার্থে। ভারতবর্ষের প্রজারা এই সর্বপ্রথম তাদের অচলায়তন জীবনে পরিবর্তনের সূচনা দেখল। অবশ্য এ হেন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা তাঁদের জন্য সুখাবহ হয়নি, হয়েছিল শোকাবহ। ভুক্তভোগী হয়ে দাঁড়াল বাংলাদেশের উলুখড়েরাই, কারণ বাংলাতেই ইংরেজ শাসনের পত্তন।

ক্লাইভ ও তাঁর অনুচরবৃন্দ বাংলাদেশের শাসকদের দুর্বলতা ও অরাজকতার সুযোগে অবাধ লুঠতরাজ ও অত্যাচার শুরু করেছিল। সে ইতিহাস যেমন গ্লানিকর তেমনি মর্মান্তিক। বাংলায় এ সময়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ফলে রক্তক্ষয়ী গৃহবিবাদ, রাজনৈতিক, সামরিক এবং নৌবাহিনীর দুর্বলতা, মানসিক আলস্য ও জাতীয় ঔদাসীন্য বিরাজ করছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার বিংশতি বৎসর

বয়সের অভিজ্ঞতা হয়তো ক্লাইভের দেশের উন্নতমানের অস্ত্র এবং সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক পারিষদ দলের ছলকলার তুলনায় অপরিণত ছিল।[১] কিন্তু ভারতবর্ষ তার অনগ্রসর, নির্জীব সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থা এবং শাসকদের গৃহবিবাদের বিশৃঙ্খলায় বণিক ইংরেজদের বিজয়ের জন্য এক অবধারিত শিকার হতেই প্রস্তুত ছিল। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস বহিরাক্রমণকারীদের দ্বারা বিজিত হবারই ইতিহাস। শক, হুন, গ্রীক, আরবী, তুর্কী, তাতার, মুঘল যারা একের পর এক ভারতবর্ষ জয় করেছে তারা প্রজাদের উন্নততর সভ্যতা এবং এ দেশীয় অর্থ-নৈতিক কাঠামোর সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষীয় হয়ে গেছে। ইংরেজরা প্রথম ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নততর সভ্যতার বাহন হয়ে এ দেশে এসেছে।[২] একমাত্র তারাই দুশো বছর এ দেশে থেকেও ভারতীয় হয়নি, সম্পূর্ণ ইংরেজই রয়ে গেছে। —"Every Briton appears to pride himself on being outrageously a John Bull"।[৩] ইংরেজ আগমনে ভারতবর্ষে সূচিত হল নতুন ইতিহাস।

ইংরেজ শাসক বাংলা বিহারের শাসন-ক্ষমতা পেয়ে প্রাচীন জীবনের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করতে সক্রিয় হল। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে তারা ভূমিরাজস্বের নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা এবং বিহারের প্রাচীন গ্রামসমাজের ভিত্তি—যে ভিত্তি টিঁকে ছিল একটা স্থূল অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে—তাকে ধ্বংস করে বাংলা ও বিহারকে শ্মশানে পরিণত করল।[৪] এর আগে মুদ্রার প্রচলন ছিল শুধুমাত্র উচ্চস্তরে, সমাজের নীচের তলায় মুদ্রার চল ছিল নামমাত্র। মধ্যযুগীয় স্থিতিশীল অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়াতে বংশকৌলীন্যের স্থান নিল সচল মুদ্রা। আত্ম-কর্তৃত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন পল্লীগুলি ছিল নিশ্চল, উদ্যমহীন, প্রকৃতিবশ, মানবমহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং সেই সঙ্গে মানুষের আত্মাবমাননার আশ্রয়ও বটে।[৫] পল্লীর আত্মকর্তৃত্বে বিঘ্ন না ঘটিয়ে ইংরেজ-পূর্ব সামন্ত-শাসকেরা কর নিত ফসলের হারে, বিনিময়ে রাজশক্তি সেচের জন্য খাল, রাজপথ প্রভৃতির নির্মাণ ও রক্ষণ করবার দায়িত্ব নিত। কিন্তু ইংরেজ শাসক কৃষি-ব্যবস্থার কোনো

পরিবর্তন না ঘটিয়েই রাজস্বের হার বহুগুণ বৃদ্ধি করাতে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। কোম্পানি-সৃষ্ট নতুন ব্যবস্থায় রাজস্বের টাকা সংগ্রহের জন্য বাংলা ও বিহারের কৃষকরা বাধ্য হত তাদের সম্বল খাদ্য ফসল বিক্রি করতে। নতুন শাসকেরা বাংলা এবং বিহারের জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার নতুন ভিত্তি সৃষ্টি করল। এরা মুঘল যুগের গোমস্তাদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করল,[৬] এবং যথেচ্ছচারিতার অবাধ অধিকারের পথ খুলে দিল।

মুরশিদকুলী খাঁ তাঁর আমলে বৃহৎ জমিদারী সৃষ্টির প্রয়াসে সার্থক হয়েছিলেন। কয়েকটি পরগণার জমির রাজস্ব আদয়ের ভার তিনি একজনের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। ১৭৯৩ সালে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত নতুন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব প্রদানের কঠিন শর্তাদি পালনে অক্ষম বহু জমিদারের জমিদারী 'চিরস্থায়ী' প্রবর্তনের প্রথম দিকেই নিলাম হয়ে যায়। এইসব জমিদারী হস্তান্তরিত হয়েছিল প্রধানত বেনিয়া মুৎসুদ্দী মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছে। সামাজিক অবস্থানে বাংলাদেশের ভূমির মালিকরা অভিজাত বলে গণ্য হত। ব্যবসায়ীরা ধনী ছিল কিন্তু মানী ছিল না। যেহেতু জমিদার হলে ধন ও মানের সোপান ডিঙিয়ে অভিজাত ধনীর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় সেহেতু ব্যবসায়ী শ্রেণীর অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিদার হয়ে বসে। এ ছাড়া সহজে অর্থসমাগমের উপায় রয়েছে বলে স্বাভাবিকভাবেই এদের ঝোঁক গিয়ে পড়ল জমিজমা সংক্রান্ত লাভজনক দিকটির ওপব।[৭]

এই বন্দোবস্তের আওতায় এ দেশের ভূমি-ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। কারণ এই শোষণ-ভিত্তিক রাজস্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে এ দেশীয়দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাও জড়িয়ে পড়ল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জমির মালিক ছিল কৃষক স্বয়ং। কারণ মুঘল আমলে সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবেই সরকার ভূমির মালিক রূপে গণ্য হত। কিন্তু চিরস্থায়ী ভোগদখলকার হিসেবে কৃষকই ছিল জমির প্রকৃত মালিক। নতুন ব্যবস্থায় জমির মালিক হল আগে যারা ছিল রাজস্ব আদায়কারী সরকারী এজেন্ট —জমিদার শ্রেণী। এই জমিদার শব্দটিতে মুঘল আমলে জমির মালিক বোঝাত না। জমির খাজনা সংগ্রহকারী বোঝানো হত। নতুন জমিদাররা যেহেতু জমির ব্যাপারে অনভিজ্ঞ সে জন্য তারা শহরে থাকত। ফলে জমিজমার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর হাতে। তিনটি শ্রেণীর উৎপত্তি হল এতে —জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী এবং কৃষক শ্রেণী। জমির

৬ ॥ সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৭ ॥ N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, (1956), p. 5

স্বত্ব উপস্বত্ব থেকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকায় দ্রুত সমাজের চেহারা বদলে যেতে থাকল।[৮] আর কৃষক জমির ওপর স্বত্ব-স্বামিত্ব চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলল।

কোম্পানি জমির বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল। এ ছাড়া এই বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। বিদেশী শাসকের স্বার্থ সংরক্ষণের সঙ্গে এই নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থ যুক্ত হয়ে পড়ল।[৯] হয়েছিলও তাই। এই ভূম্যধিকারীগণ[১০] ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে কুণ্ঠিত

৮॥ বিনয় ঘোষ এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "বাংলার গ্রাম্য সমাজে যে বিপুল কলেবর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হল, অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক রইল না।" এর ফলে গ্রাম্য সমাজে 'যুগান্তকারী' পরিবর্তন দেখা দিল। কারণ "উৎপাদন কর্ম থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এ রকম শোষণমুখী অর্থলোভী বিপুলকায় মধ্যশ্রেণী বাংলার গ্রাম্য সমাজে ব্রিটিশপূর্ব যুগে, মুসলমান বা হিন্দু রাজত্বকালে, ছিল না।" —'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', (১৯৬৮), পৃ. ৩০।

৯॥ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লর্ড কর্নওয়ালিস বলেছিলেন যে, "আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ দেশীয় ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করতে পারে, তাহার মনে তাহার কোনো রূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।" —Radhakamal Mukherjee, *Land Problems in India*, p. 35, —উদ্ধৃত স্বপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

১০॥ বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলতে গিয়ে এর ত্রুটি নির্দেশ করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গে না হয়ে প্রজার সঙ্গেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঐ সঙ্গে তিনি বলেন যে, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন,

হয়নি তেমনি নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও মোটেই উদাসীন থাকেনি।[১১]

কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এ দেশের মূল অর্থনীতি জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি-ব্যবস্থা একেই ছিল অবহেলিত তার ওপর কৃষি উন্নয়ন কাজে পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলকাঙ্ক্ষী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দিব।" - -"বঙ্গদেশের কৃষক", 'বঙ্কিম রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-১০।

১১॥ ফ্লাউড কমিশনের (১৯৩৮-৪০) কাছে ১৯৪০ সালে, ইংরেজের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া যখন নিকটবর্তী তখনও, সাক্ষ্য দেবার সময় জমিদারদের প্রতিনিধি স্যার বিজয়চাঁদ মহাতব ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁদের নোটে লেখেন, "To make exinct the great landholders in the Province may not be so difficult, although they might deserve greater consideration as they and their ancestors contributed in no small measure in the past to the establishment of many of the charitable and educational institutions to be found in the Province today. But with the disappearance of all intermediary landlords, who have formed the backbone of the Province, and the intelligentsia, and are the creators of modern social and political Bengal, we shall be running the definite risk of a social upheaval of a magnitude which requires very careful thought, for with an undeveloped Proja Party and Raiyats' Association we might easily usher in communism which would become a menace to the state itself. The Province is not ready for such a revolutionary step and that is why we consider the proposal of state purchase as unsound in practice, premature and inopportune." Note of Dissent in *Report*, Vol I, 1940, p. 223 —উদ্ধৃত, অমলেন্দু দে,

কৃষকদের নিজস্ব শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্য-মূল্য নানা স্তর পেরিয়ে হাতবদল করার ফলে কোনো দিনই কৃষকের কাছে লাভজনক হয়ে উঠত না। ফলে কৃষকরা একদিকে যেমন প্রভুর চাহিদা মিটিয়ে বাঁচবার মতো সম্বল ঘরে রাখতে পারত না, অন্যদিকে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্যও কোনোকালে তারা পায়নি। ক্রমশ তারা পরিণত হয়েছে ভূমিহীন কৃষকে, নত হয়ে গেছে দারিদ্র্যের চাপে। সর্বোপরি ছিল বণিক রাজার ক্রমবর্ধমান রাজস্বের হার বৃদ্ধির চাপ। এ চাপ গিয়ে পড়ত কৃষকদের ওপর। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বাংলার কৃষকরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। মুসলমান জমিদারদের সংখ্যা সে তুলনায় খুবই কম। এই অসমতা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ তার রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার শুরু করেছিল বাণিজ্যিক ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখতে। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণ এবং সেই নির্মম শোষণ-ব্যবস্থা চালু রাখতে নির্দয় শাসন। ইংলণ্ডে যখন একই সঙ্গে কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব চলছিল তখন এই উপমহাদেশে ইংরেজ প্রবর্তন করল এমন ব্যবস্থা যাতে ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে এ দেশের কৃষিজাত কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিশেষত্বই হচ্ছে যে, বিদেশী শাসক উপনিবেশকে নিজ দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের একচেটে বাজারে পরিণত করে তুলবে, দ্বিতীয়ত, নিম্নতম মূল্যে প্রচুর কাঁচামাল নিজেদের দেশের জন্য উৎপন্ন করানো এবং তৃতীয়ত, উপনিবেশকে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে রপ্তানি ও আমদানী দু'রকমেই বাজারে পরিণত করে তোলা।[১২] ফলে এ দেশের নিজস্ব শিল্প-ব্যবস্থা যা ছিল তার ধ্বংস হয়ে পড়ল অনিবার্য।[১৩] শিল্পোন্নয়নের অভাবে এ দেশীয় কৃষিজাত পণ্যের আভ্যন্তরীণ বাজার নষ্ট করে ঐ কাঁচামালের বিদেশে চাহিদা বাড়ানো হল।

এর ওপরে ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত মুনাফা এবং লুঠতরাজ

১২ ॥ Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Under-developed Regions*, (London, 1959), pp. 57-60.

১৩ ॥ "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাত থেকে পুঁজিবাদী কারখানায় তৈরি সস্তাদরের কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানী করে এ দেশের কারিগরি শিল্পের বিপদ ঘটিয়েছিল। পুঁজিবাদী শিল্পে তৈরি কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের দর সস্তা হত এবং এ দেশের বাজার দখল করবার উদ্দেশ্যে তা বিশেষভাবে সস্তা দরে বিক্রী করা হত। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে এ দেশের কারিগরি ও কুটিরশিল্প পিছু হটতে লাগল।" —আবদুল্লাহ্ রসুল, 'কৃষকসভার ইতিহাস', (১৩৭৬), পৃ. ১৩।

ও অত্যাচারের বিভীষিকার রাজত্ব। ১১৭৬ সালের মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারালেও রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেক বেশীই হয়েছিল।[১৪] অর্ধমৃত অবশিষ্ট কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায়ের নিষ্ঠুর ইতিহাস সহজেই কল্পনা করা যায়। কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের অন্তর্বাণিজ্য একচেটে করে নিল। শুল্কবিহীন অন্তর্বাণিজ্য এবং বিভিন্ন শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপরে কর্মচারীদের শাসন-শোষণও বাংলার শিল্প ও কৃষি ধ্বংস হয়ে যাবার আর একটি প্রধান কারণ। অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্য স্বভাবতই ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া থাকে। ফলে এ দেশীয় পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবার সম্ভাবনা রইল না। দেশীয় বণিকদের এমন অবস্থায় বিদেশীয় বণিকদের সঙ্গে শিল্প-প্রতিযোগিতায় পুঁজি বিনিয়োগে লাভের আশা কম। এবং সরকার কর্তৃক দেশীয়দের শিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হত না। এই সমস্ত কারণে জমিদারী ক্রয়ে পুঁজি বিনিয়োগে এ দেশীয় বণিকদের অদম্য উৎসাহ দেখা গিয়েছিল।

স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, শিল্পকে নষ্ট করে এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল ইংরেজ তাকে ধ্বংস করে দিল। এই সর্বাত্মক ধ্বংসলীলার মধ্যেও পরবর্তীকালে একটি উজ্জীবনী শক্তি দেখা গিয়েছিল তা হচ্ছে ভারত উপমহাদেশে রাজনৈতিক ঐক্য গঠন, যা এর আগে এমন সুসংহত ও প্রসারিত হয়নি।[১৫] অবশ্য এই একতা কোনো সামগ্রিক রূপ পায়নি। বিচ্ছিন্নতা ভারত উপমহাদেশের রাজনীতির সর্বাধিক ক্ষতিকর ব্যাধি। শাসকের সঙ্গে শাসিতের, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের, হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, খ্রীষ্টানের সঙ্গে অন্যদের বিভেদ রয়ে গেছে। বিত্তগত বিভেদ তো ছিলই। রাজনীতি ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। দ্বিতীয় অবদান যা ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র প্রগতিশীল ভূমিকা রূপে বিবেচিত হয় তা হচ্ছে ইংরেজ-পূর্ববর্তী নিশ্চল, অপরিবর্তিত সমাজ-জীবনে একটা সচলতা তারা আনতে পেরেছিল।[১৬] পরিবর্তনটা এসেছিল ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঙ্গে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যোগস্থাপনের ফলে। অবশ্য পরিবর্তনের ফলাফল যে আপামর জনসাধারণের জন্য কল্যাণময় হয়নি তা আমরা দেখেছি।

১৪ ॥ J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal*, (London, 1927), pp. 95-102.

১৫ ॥ মার্কস-এঙ্গেলস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৬ ॥ "প্রাচীন বনেদী জমিদার শ্রেণীর ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে - city capitalist দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতিকে নতুন চিরস্থায়ী স্বত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার শ্রেণীতে পরিণত করে —মধ্যস্বত্ব-ভোগীদেরও নতুন জমিদারদের মতো কৃষকদের শোষণ ও পীড়নের

বিদেশী বুর্জোয়াদের আগমনে ভারতবর্ষে ইউরোপের মতো সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একটা বুর্জোয়া লক্ষণাক্রান্ত সমাজ গড়ে উঠল এমন নয়। দেশীয় লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কলকারখানা স্থাপনের অধিকার পায়নি। তাই সামন্ত-সমাজ বা বুর্জোয়া-সমাজ কোনোটাই পুরোপুরি পাওয়া গেল না—অধিকাংশ মানুষের কেবল দুঃখ-দারিদ্র্য বাড়ল। সে জন্য বাংলায় খাঁটি বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠবারই সুযোগ পেল না। প্রথমত দেশটি উপনিবেশ, দ্বিতীয়ত নতুন সুষ্ঠু কোনো অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হল না, এর ওপর ভূমিকে কেন্দ্র করে কর্নওয়ালিশী ব্যবস্থাকে এক ধরনের বণিকবৃত্তি বলা গেলেও জমিতে আদিম উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম হয়েই রইল। এমন ব্যবস্থায় বুর্জোয়া লক্ষণাক্রান্ত সমাজ গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব নয়। বরং এর পরিবর্তে গড়ে উঠল সামন্ত মানসিকতা সম্পন্ন কৃষক-শোষক জমিদার শ্রেণী এবং মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া শ্রেণী। ব্রিটিশ ধনবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শেষ পর্যন্ত পরিণত হল ব্রিটিশের দাসে। তারাই হয়ে উঠল এ দেশে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের প্রধান অবলম্বন। বাংলা সাহিত্যে যেটা মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত তার শেষপর্বে পুরনো সামন্ততন্ত্রীয় ধারণা এবং বিশ্বাসগুলি একটু একটু করে শিথিল হয়ে পড়ছিল। হয়তো একদিন আপন নিয়মেই সমাজের ভেতর থেকে অদল-বদলের বৃহৎ কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যেত। কিন্তু বিদেশী বণিকরাজের নিজস্ব স্বার্থে উপনিবেশ ভারতবর্ষের সামন্ত-বাদী অবয়বে রূপান্তরের সূচনা দেখা দিল, যে রূপান্তর চরিত্রগতভাবে ঔপনিবেশিক, বিদেশীদের লুণ্ঠনস্বার্থ সংরক্ষণকারী, যা স্বাধীন নয়, জাতীয়তা-বাদীও নয়। এই সময়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রভাবশালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব।

মধ্যবিত্তের উদ্ভবের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে

অধিকার দিয়ে —ভূমিরাজস্বকে বাণিজ্যের পণ্যের মতো 'স্পেকুলেশন' ও মুনাফার বস্তুতে পরিণত করে —পণ্যফসল নীলের আবাদে যথেচ্ছা-চারী নীলকরদের উৎসাহিত করে—বিনিময়ের বাজারে বিদেশী ব্রিটিশ পণ্যের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় স্বদেশী শিল্প ও কারুবর্গকে উৎখাত ও বৃত্তিচ্যুত করে —নবযুগের নতুন বিনিময়-মাধ্যম টাকার আর্থনীতিক একাধিপত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে, গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত করে —বিদ্যা, বাণিজ্য, সামাজিক ক্ষমতা ও মর্যাদা, সমস্ত কিছু নতুন টাকার মানদণ্ডে পরিমাপ করার আদর্শ প্রচার করে, ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার পল্লীসমাজের অস্থিমজ্জায় যে প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়ায় সেকালের জীবনধারার গতির অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছিল।" —বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, "সমাজবদ্ধ মধ্যবিত্ত-সমাজের আত্মপ্রকাশের সহজাত বাহন গদ্য সাহিত্য। পদ্য নিঃসঙ্গ মানুষের ভাষা···। কিন্তু গদ্যের এভাবে চলবার উপায় নেই। তার পরিবেশের জন্য চাই সমাজবদ্ধ একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।" তিনি এরপর বাঙালী মধ্যবিত্তের উদ্ভব সম্বন্ধে বলেছেন, "···মধবিত্ত সমাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতন্ত্রের পরিণাম আর সেইজন্যেই এর গোড়াপত্তন হয়েছিল কলকাতা ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই নূতন সমাজ ও নূতন সাহিত্য এক জন্মসূত্রে গ্রথিত।" ['বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক', (১৯৫৫), পৃ. ২১-২২]। ১২৯১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উল্লসিত হয়ে লিখেছেন, "সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ধনের হাত হইতে বুদ্ধি-বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালার ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্তা।··" ["লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ" 'বঙ্কিম রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯১৯]। এই উক্তিতে অবশ্য অতিশয়োক্তি রয়েছে। জমিদারেরা ধনবান ও ক্ষমতাবান ছিল, কিন্তু সবাই যে শিক্ষিত ছিল তা নয়। তবু মধ্যবিত্তের উদ্ভব অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।।

প্রাচীন অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে দেওয়ার বিরাট ক্ষতির পূরণ হত যদি তার জায়গায় একটি উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠত। অথচ নতুন গঠনমূলক অর্থনীতি গড়বার লক্ষণও দেখা গেল না, বরঞ্চ যেটা গড়তে যাচ্ছিল সেটাও নষ্ট করে দেওয়া হল। আয়ের তুলনায় ধার্য গুরুভার করের পরিবর্তে জন-ব্যবহার্য নির্মাণ কাজ, যা ছিল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ, সে সব নির্মাণ কাজে শাসকদের কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। ভারতবর্ষীয়দের জন্য ধনবিপ্লব ঘটানোর কোনো শুভ উদ্দেশ্য ইংরেজদের ছিল না। শোষণই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংসের পর শাসক সম্প্রদায়ের প্রশ্রয়ে গড়ে উঠল আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থা।

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি এবং তাঁর প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখান। ১৮৫৩ সালে মার্কস লেখেন যে, 'গৃহবিবাদ, বাইরের শত্রুর আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, পরাধীনতা এবং পরপর দুর্ভিক্ষ —এমন ধরনের বিচিত্র অঘটনে দেশের বাহ্যিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোটা-কেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ধ্বংসস্তূপে পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না'।[১৭] অবশ্য এই পরিবর্তন ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়নি। কারণ পুরনো অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছিল এমন নয়। মার্কস ইংরেজের অর্থগৃধ্নু স্বরূপটি ধরেছিলেন এভাবে, "Quite apart from what

১৭॥ মার্কস-এঙ্গেলস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

they appropriate to themselves annually within India, speaking only of the value of commodities, the Indians have gratuitously and annually to send over to England what amounts to more than the total sum of income of the sixty millions of agricultural and industrial labourers of India! This is a bleeding process, with a vengeance! The famine years are pressing each otherand in dimensions till now yet unsuspected in Europe."[১৮]

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের মূলে যে সব আবিষ্কারকের উদ্যম এবং সেই আবিষ্কারকে যোগ্য কাজে ব্যবহারের অতিপ্রয়োজনীয় মূলধনের বৃহত্তম অংশই ছিল ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য। আর ঐ শিল্পবিপ্লবে ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। ইংলণ্ডের শিল্পমালিকরা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটে বাণিজ্যিক অধিকারের বদলে সমস্ত ইংলণ্ডেরই অবাধ বাণিজ্য তথা শোষণের দাবি তোলে। আঠারো শতকের শেষাংশে হাউস অব কমনস্-এ এ বিষয়ে বিতণ্ডা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্যিক অধিকার হারায়। এইভাবে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের বৃহত্তম বাজারে পরিণত হল।

গোটা আঠারো শতক ধরে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে যে সম্পদ পাঠানো হয়েছিল তা মূলত সংগ্রহ হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বাণিজ্যের দরুন নয় বরং ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শোষণের ফলে। ঐ সঙ্গে বিপুল ঐশ্বর্য বলপূর্বক আদায় করে ইংলণ্ডে পাচার করা হয়েছিল। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল প্রধানত রপ্তানিকারক দেশ। কিন্তু পরে সে পরিণত হল আমদানীকারক দেশে। প্রাচীন কাল থেকে দুনিয়ার সুতীমালের বৃহৎ কারখানা ভারতবর্ষ এ বার ছেয়ে গেল ইংরেজী টুইড ও সুতীবস্ত্রে।[১৯] নিজেদের পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবার তাগিদে এবং কৃষিজাত কাঁচামালের নির্বিঘ্ন সংগ্রহ-ব্যবস্থার জন্য পুরনো যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হল। এত কালের অচলায়তনের বিনিময়-সম্পর্কের রূপান্তর ঘটল।

বাংলা দেশেই শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসন। দেশ শাসনের জন্যে এ দেশীয় লোকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই আবশ্যকতা থেকে সৃষ্টি হল শিক্ষিত শ্রেণী। এই শ্রেণী ছিল ইংরেজের আশ্রয়লোভী।[২০] প্রথমে এরা সরকারী

---

১৮ ॥ *Letters of Marx and Engels*, (Moscow, 1940), p. 340.

১৯ ॥ মার্কস-এঙ্গেলস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

চাকরী, ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির দালালি, মুৎসুদ্দিগিরি অথবা কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত জীবিকায় সন্তুষ্ট থেকেছে। এই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত তাদের দ্বারা উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলাদেশে ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য কলকাতা নগর-কেন্দ্রিক একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা ও ভাবধারার ক্ষেত্রে যে একটা নতুন স্রোত[২১] এসেছিল তা অনেকটাই ব্যক্তিক, আদর্শগত এবং নৈতিক। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনে ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতিক ভাবনার ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার কারণ এক কথায় বলা চলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব।

রামমোহনের সময় থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলোদ্ভূত হিউম্যানিজমের প্রভাবে ফরাসী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য মানবমুখী বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে এই বিদ্বান-সমাজে এক ধরনের বিপ্লবপ্রিয়তা দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ কোনো বিপ্লব ভারতবর্ষেও ঘটুক এমন কল্পনা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র করতেন।[২২] অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, বাংলাদেশের অত্যাচারিত কৃষকদের বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহগুলির প্রতি এই শিক্ষিত শ্রেণীর কোনো দৃষ্টি তখন বা তার পরেও পড়েনি। এই শ্রেণীর জন্মদাতা ছিল ব্রিটিশ শাসক। ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে

২০॥ "বাংলাদেশে ইংরেজ আমলে চাকরী বিশেষ করে ইংরেজের অধীনে চাকরী 'social status'-এর সবচেয়ে শক্তিশালী 'elevator' হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে উত্থান মুখ্যত চাকরী-নির্ভর হয়। চাকরীর পদমর্যাদা দিয়ে সামাজিক মর্যাদা যাচাই হয়।" বিনয় ঘোষ তথ্যটি দিয়েছেন 'সোমপ্রকাশ' (১৮৮১-৮২)-এর লেখা থেকে। —'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

২১॥ বাংলাদেশের এই নতুন ভাবধারাকে অনেকে 'রেনেসান্স' বলে অভিহিত করেন। তথাকথিত 'রেনেসান্সের উৎপত্তি সম্ভবত এভাবে হয়েছিল। "Rammohun allegdly told Alexander Duff, the missionary, that 'I began to think that something similar to the European renaissance might have taken place here in India". (Quoted in G. Smith *Life of Alexander Duff*, 1, p. 118). The Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee (1838—1894) frequently employed the word renaissance either in the context of a revitalized Bengali language or literature. or as

এদের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। ফলে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যে সব কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহ গ্রামবাংলাকে আলোড়িত করেছিল তাদের সঙ্গে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো সম্বন্ধ না থাকাই স্বাভাবিক। সিপাহী বিদ্রোহ, যাকে মার্কস বলেছেন 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ', সেই যুদ্ধের ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্তদের মনোভাব ও ভূমিকা তো সর্বজনবিদিত। বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সিপাহী বিদ্রোহ বিমুখতার কারণগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর অনেকগুলি সম্পাদকীয় বিদ্রোহীদের তীব্র, নির্দয় সমালোচনায় মুখর। সাম্প্রদায়িক মনোভাব সিপাহীদের সমালোচনার অন্যতম প্রধান কারণ। ৭-১২ ১২৬৫ সনের 'সংবাদ প্রভাকর-এ এমন নিষ্ঠুর সমালোচনার পরিচায়ক অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হল, "নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য 'শাহাজাদা' 'পিরজাদা' 'খানজাদা 'নবাবজাদা' হইয়া উঠে, রাতারাতি আর হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের মুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদগদ হইয়াছিলেন, এদিগে জানেন না যে 'বাঙ্গাল বড় হেঁযাল'।" —বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, প্রথম খণ্ড (১৯৬২), পৃ ২৫৩।

উক্ত শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থন পেয়েছিল নীল বিদ্রোহ। কিন্তু নীল বিদ্রোহে ইংরেজ সম্পর্কে তারা যত অভিযোগ করেছে, দেশীয় জমিদারদের হাতে কৃষকদের লাঞ্ছনা সম্বন্ধে ততটা করেনি। এর মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) একটি ব্যতিক্রম। এর কারণ স্পষ্ট। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ বিদেশী নীলকরদের আগমনে বিঘ্নিত হয়। কাজেই

the modern reinterpretation of Hindu tradition...One type of source that was apparently instrumental in popularizing the concept of the Bengal renaissance was for example, the autobiography of the Bengali nationalist Bepin Chandra Pal (1858-1932), *Memories of My Life and Times*, in which he looked at the whole of the nineteenth century background as a glorious period of renaissance", David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, (California, 1969), p.3

২২ ‖ B. B. Majumdar, *History of Political Thought*, Vol. I. (1934), p. 84

তাদের পক্ষে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। এ থেকে আর একটি সত্য ধরা পড়ে। ইউরোপের রেনেসান্স এসেছিল সমাজ-জীবনের ভেতরের প্রেরণা ও প্রয়োজন থেকে। বাংলার এই তথাকথিত রেনেসান্সের কৃশতনু উজ্জীবনে অনুপ্রেরণা ছিল অন্য রকম। এই ভাবান্দোলনের ভিত্তি নগরকেন্দ্রিক এবং শহরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি। জন-সাধারণের সঙ্গে তা ছিল সম্পর্কহীন এবং এটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ বিদেশী শাসন ও সেই শাসনের সহায়ক রূপে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্তদের দ্বারা। একে রেনেসান্স না বলে বলা সঙ্গত ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ে সৃষ্ট নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

হিউম্যানিজম হচ্ছে নবযুগের মানুষের এগিয়ে চলার পথের জীবন-দর্শন। 'নবযুগ' মানে অবশ্য ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক যুগ। নবযুগের প্রধান মানুষ ধনিকশ্রেণীর উঠতি সময়ে প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটি জীবন-দর্শনের যা মানুষকে ঈশ্বর-চিন্তা থেকে মুক্ত করে ইহলৌকিক চিন্তায় যুক্ত করবে, মানুষের মনে যা ঈশ্বর-নির্ভরতা কমিয়ে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে এবং মানবমুখী জীবনবোধ বিকাশে সাহায্য করবে।[২৩] কিন্তু এ দেশে ইহলৌকিক জীবনবোধ কখনই ঈশ্বর-মুখাপেক্ষিতা ছাড়া গড়ে ওঠেনি। ঈশ্বর-মুখাপেক্ষিতার কারণ হচ্ছে এ দেশের ধনিকশ্রেণী যথার্থ অর্থে বুর্জোয়া ছিল না। ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা যেমন স্বাধীন এ দেশীয় বুর্জোয়ারা তেমন নয়। ফলে ঈশ্বর-নির্ভরতা ও ইংরেজ-নির্ভরতা একই কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তা হচ্ছে স্বাবলম্বনের অভাব এবং এর সঙ্গে যুক্ত স্বার্থবোধও। স্বদেশের বিপ্লবের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার বদলে ফরাসী, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশীয় বিপ্লব নিয়ে উক্ত বিদ্বৎসমাজ আলাপ আলোচনা করে উদ্দীপ্ত হত। আসলে ইংরেজ-বিরোধী কোনো বিপ্লব চিন্তা করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংরেজের ভয় ছিল, তার চেয়েও বড় কথা — নিষেধ ছিল নিজেদের স্বার্থের। এদের রাজনীতির ভাবনা ছিল অস্ফুট এবং কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনীতি বিষয়ক পরিকল্পনাবিহীন। ব্রিটিশ শাসককে মেনে নিয়েই এরা বিদেশী প্রেরণায় উদ্দীপনা বোধ করত।[২৪] ফলে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের অগভীর বিপ্লবী চেতনা সংস্কার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। যথার্থ কোনো বিপ্লব-চিন্তা এরা দেখায়নি। শ্রেণীস্বার্থের বাইরে কিছু করা এদের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার শিক্ষিতদের গুরুতর বেকার সমস্যার সম্মুখীন হওয়া শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিনয় ঘোষের বক্তব্য, "ইংরেজি

শিক্ষা গোড়া থেকে 'mercenary' ও 'commercial' হয়ে উঠেছিল বলে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাংলাদেশে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে, দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। চাকরি হয়ে উঠেছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তাই চাকরিজীবী মধ্যবিত্তেই (salariat middle class) ইংরেজি-শিক্ষিতদের প্রধান অংশ।" লেখক এর পর শিক্ষিতদের হার নির্ণয় করে বলেছেন যে, "১৮৮৯ সালে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭০০। তাদের চাকরির ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা একটি তথ্য থেকে পাওয়া যাবে —(গ্রাজুয়েট) গবর্নমেণ্ট সার্ভিস : ৫২৮, প্রাইভেট সার্ভিস : ১৮৭, বেকার : ৬৩৫, খবর জানা নেই : ৩২০, মৃত : ৪২। দেখা যাচ্ছে, ১৮৮১ সালে গ্রাজুয়েটরা চাকরির ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেকই বেকার।"[২৫]

এরা দেখল যে, বড় বড় উঁচু পদগুলি কেবল মাত্র ইংরেজদের জন্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজ সরকারকে দোষারোপের মনোবৃত্তি তখন থেকে জেগে উঠেছিল।[২৬] এ ছাড়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে নানা প্রকার অসন্তোষও ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। এরা ক্রমেই নিজেদের দাবি-দাওয়ায় প্রতি সচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং এই সচেতনতা থেকে জন্ম নিচ্ছিল পরাধীনতার বেদনা, জাতীয় চেতনা, আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাজাত্যগরিমা। ইংরেজ-সৃষ্ট শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বাদেশিকতার অনুভূতি এবং এমন ইচ্ছার পেছনে কার্যকরী ছিল সম্পূর্ণই তাদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের মানসিকতা।

উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল সর্বাংশেই প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাববাদী। ঐ দেশাত্মবোধ হিন্দু বাঙালীর একটা সাংস্কৃতিক চেতনা যা ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়াদের ধারণা। কিন্তু উপনিবেশের বুর্জোয়াদের পক্ষে পুরোপুরি বুর্জোয়া হওয়া সম্ভব নয় —বিত্তের দিক দিয়ে নয়, মানস্বিকতার দিক থেকেও নয়। মধ্যবিত্তের নিজ শ্রেণীর চরিত্রানুযায়ী জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল কিছুটা সামন্তবাদী কিছুটা বুর্জোয়া চেতনা মিশ্রিত। ধর্মীয় আচ্ছাদনে মোড়া জাতীয়তাবাদকে পরে শ্রেণী-আন্দোলন অর্থাৎ সুবিধাবাদী আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল। হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আত্মসম্মানের উদ্বোধন ঘটাতে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। অতীত স্মৃতি ও বীরপূজা ছিল তাদের আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানের উদ্বোধক। কয়েকটি বিনীত আন্দোলন ইংরেজের কাছে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য হলেও কেউই ইংরেজ শাসনের অবসান কামনা করছিল না। এমন কি বিশ

২৫ ॥ বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', পৃ. ২০৭-৮, ২১১

২৬ ॥ B. B. Majumdar, *op cit*, pp. 322-26.

শতকের শুরুতেও সে মনোভাবের খুব একটা রদবদল হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারীতে কলকাতায় যুবরাজের সম্মানে যে-ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয় সে সভায় প্রিন্স জর্জ গোখলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "Would the peoples of India be happier if you ran country ?" "No sir", Mahatma Gandhi's Guru replied, "I do not say they would be happier but they would have more self-respect." (Stanely Wolpert, *Morley and India, 1906-1910*, California, 1967, p. 39)। যে বুদ্ধিজীবীরা উনিশ শতকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, ইতিহাসে রূপ দিয়েছেন তাঁরা সকলেই সরকারী চাকুরে বা ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জড়িত। আন্দোলনগুলি ছিল শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের। এদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল অতি সামান্যই।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ও জাগরণে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ সৃষ্টি উপন্যাসের দ্বার খুলে দিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা এবং উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্র মিলের উপযোগবাদ এবং কঁতের দৃষ্টবাদের প্রভাবে 'বঙ্গদর্শন'-এ 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' (১২৭৯) ও 'সাম্য' (১২৮০-১২৮২) নামে দুটি দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে 'সাম্য'র মত সম্পূর্ণ নতুন এবং তাঁর মূল মতের পরিপন্থী। পরবর্তীকালে সাম্যের মতকে তিনি ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করে 'সাম্য'র পুনর্মুদ্রণ করেননি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' এর উল্লেখ রয়েছে। "বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে'। নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে। কিন্তু আর ছাপাব না'..." (ব. র. দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩)। তিনি তাঁর কালের শিক্ষিত সমাজের নেতা এ পুস্তকে ফরাসী বিপ্লবের অবদানকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এমন কি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরও এ প্রবন্ধে অলভ্য নয়। কিন্তু তিনি মূলত ভাববাদী এবং সামন্তবাদী। দরিদ্র কৃষকদের প্রতি করুণা রয়েছে, কিন্তু তাই বলে তিনি জমিদারী প্রথার বিলোপ চাননি। জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করেই কৃষকদের অবস্থার একটা পরিবর্তন চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের পক্ষ নিয়ে বলেন, "যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।...এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগের হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জন দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন-এর জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্র-

দায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না, জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে"। ('সাম্য' ব. র. দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩)। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম পর্যায়ে সোশ্যালিজমের চর্চা করেছিলেন বঙ্কিম। পরবর্তীকালে অর্থাৎ 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে গেলে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন। প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে তাঁর রক্ষণশীল আপসধর্মী প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। বুর্জোয়া মানসিকতাকে ছাপিয়ে সামন্তবাদী মনোভাবের অধীন হয়ে পড়লেন। আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর উপন্যাসগুলি তাঁর রক্ষণশীল ভাবনারই পরিচয় বহন করে।

'আনন্দমঠ' (১৮৮২) বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী ধারণার মুখপাত্র। 'আনন্দমঠ'-এর 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল"।[২৭] 'আনন্দমঠ'-এর সমাপ্তিতে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের সমর্থন নেই, বরঞ্চ ইংরেজ আগমনে সংগ্রামকে বলপূর্বক থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'আনন্দমঠ'-এর একদিকে রয়েছে পরাধীনতার বেদনায় স্বাধীন হবার জলন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না-করে উলটো ইংরেজ-প্রশস্তি। এই আপাত বৈষম্যমূলক আপসধর্মিতা সে যুগের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মানস-চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালীর যোগ্য প্রতিনিধি। ইংরেজ শাসন এ শ্রেণীকে যেমন দিয়েছে আধুনিক জ্ঞান তেমনি সেই সঙ্গে দিয়েছে শাসকের প্রতি অনুগত হবার প্রেরণা। 'আনন্দমঠ'-এর বক্তব্য পর্যালোচনা করলে ইংরেজ বিদ্বেষের চাইতে মুসলমান বিদ্বেষই বরং অধিক চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ—[ক] "কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ?" ('আনন্দমঠ', ব. র. ১ খণ্ড, পৃ. ৭৭১); [খ] "ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় গভর্ণর জেনারেল" (ঐ, পৃ. ৭৭৯); [গ] "হরে মুরারে। উঠ। মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়ে মার"। (পৃ. ৭৮৪) বঙ্কিমের নিজস্ব বিবরণ অনুযায়ীই স্মরণযোগ্য যে, ইংরেজপক্ষের সেনাদলে শুধুমাত্র মুসলমানই ছিল না। তৈলঙ্গী, হিন্দুস্থানী এবং ইংরেজ সৈন্যও ছিল।

শ্রেণী অবস্থানে ইংরেজ বঙ্কিমের নিজের শ্রেণীর প্রতিযোগী নয়, উপকারী ও

২৭। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, (১৩৬৯), পৃ. ৪২।

ভু। এ দেশীয় মুসলমান তাঁর প্রতিবেশী এবং অসম হলেও এই প্রতিবেশীকেই
র নিয়েছেন তিনি প্রতিযোগী রূপে। বঙ্কিম তাঁর বিভিন্ন রচনায় এবং 'আনন্দ-
' 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) প্রভৃতি উপন্যাসে হিন্দু
াতীয়তাবাদকে রূপ দিচ্ছিলেন। জাতীয়তাবাদ সব সময়েই একটা শত্রু
াজে। জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম শত্রু হিসেবে মুসলমানকেই বেছে নিলেন।
রেজকে শত্রু বলে ভাবা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। একে তো ইংরেজ শক্তিতে
বল, তার ওপর ইংরেজের কাছে বহু সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে
ী। দুর্বল, হৃতগৌরব মুসলমান শাসককে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা
রেছেন যা তাঁর উদারতা প্রমাণ করে না।

'আনন্দমঠ'-এর রাজনীতিতে ভ্রান্তি ছিল। সেই ভ্রান্তি এখানে যে, যে
তনার হবার কথা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পরিণামে তা রূপ নিয়েছে
প্রদায়-বিরোধিতায়। হিন্দু মুসলমানের অভিন্ন শত্রু হিসাবে ইংরেজকে চিহ্নিত
করে মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যাতে করে
ম্প্রদায়িকতা উদ্‌বেজিত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা তার একরৈখিকতা
রিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের একার নিজস্ব চেতনা নয়,
া তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই উদ্ভূত। 'আনন্দমঠ'-এ মুসলমানকে সহকারী
প না দেখে শত্রু রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব
বস্থ জীবনেরই ছবি। মূলত এমন বিদ্বেষ থেকেই মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ তথা
সলিম জাতীয়তাবাদী ধারণা জন্ম নিয়েছিল।

'আনন্দমঠ'-এর শেষাংশের সংলাপ বিশ্লেষণ করলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়
ঙ্কমচন্দ্র বুঝি-বা পুস্তকে ইংরেজের বিরোধিতা প্রচার করতে চাচ্ছেন। কিন্তু
সময়ে লেখা তাঁর অন্যান্য রচনা থেকে ঐ যুক্তি সমর্থন পায় না।

উদাহরণস্বরূপ —"সত্যানন্দ বলিলেন, 'হে মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা
রাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজ রাজাই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর,
ব আমাদিকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?' মহাপুরুষ
লিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক —অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে
হে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে
ধ্য হইবে কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না'…।" মনে
খতে হবে যে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে হলেও তাঁর এ বক্তব্য প্রকাশ
য়েছে ১৮৮২ সালে। ইংরেজ তখন প্রতিষ্ঠিত শাসক। 'লর্ড রিপণের
সবের জমা খরচ' রচনাটিও বঙ্কিমচন্দ্রের একনিষ্ঠ রাজভক্তির প্রকাশ। যেমন,
ামরা এ উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভক্তি। অনেকে বলিবেন, আমাদের
জভক্তি ছিল বলিয়াই উৎসব করিয়াছি। সকলেই বুঝেন যে, ঠিক তাহা নহে,
ন্য কারণে এ উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবেই আমাদের রাজভক্তি

বাড়িয়াছে। রাজভক্তি বড় বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ"। (বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯১৯)। অথবা, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি গুরুর মুখে বলেছেন, "...প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান —নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রিপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এই রূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে।" (বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬১৬)। আবার ঐ 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, "...সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানী। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯)। কিছু পরেই তিনি বলছেন, "সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।" ভারতীয়দের অস্ত্রধারণ আইনে নিষিদ্ধ এই সত্যটা জানালে গুরু বলছেন, "সেটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা. আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব..." (প্রাগুক্ত)।

কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য মনে করেন যে 'আনন্দমঠ'-এর সাম্প্রদায়িকতা এই গ্রন্থের অন্তর্গত নয়, আরোপিত। যেমন সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন যে, "কেহ কেহ মনে করেন 'আনন্দমঠ' মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে এবং ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুরাজত্বের পুনপ্রতিষ্ঠা করা। যাঁহারা এই রূপ মনে করেন তাঁহারা উপন্যাসখানি পড়িয়া দেখেন নাই। ভবানন্দ ও সত্যানন্দের মত বঙ্কিমচন্দ্রের মত নহে"। ('বঙ্কিমচন্দ্র', ১৩৬৮, পৃ. ১৬১)।

এ কথা সত্য যে, মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ উক্তিগুলি ঔপন্যাসিকের নিজের নয়, সেগুলি সত্যানন্দ ও ভবানন্দের। 'আনন্দমঠ' যদি কোনো দূর দেশের ও বিদেশী ভাষায় রচিত উপন্যাস হত তাহলে হয়তো ঐ উক্তিসমূহকে কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক কল্পিত চরিত্রের নাটকীয় বক্তব্য হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব হত। বাঙালী পাঠকের পক্ষে —সে হিন্দুই হোক কি মুসলমান হোক, 'আনন্দমঠ' কোনো দূরবর্তী বা বিদেশী ভাষায় রচিত উপন্যাস নয়, তার কাছে এ গ্রন্থ যতটা না উপন্যাস তার চেয়ে বেশী বাস্তব মতবাদ। এ বইকে সাধারণ পাঠক উপন্যাস হিসাবে পাঠ করেনি, একটি মতাদর্শের সাহিত্যিক উপস্থাপনা হিসাবেই গ্রহণ করেছে। তাই কোনটি ঔপন্যাসিকের উক্তি আর কোনটি চরিত্রের উক্তি সে তফাৎ নির্ণয় করতে তার কোনো আগ্রহ জাগে না। সকল উক্তিকেই ঔপন্যাসিকের উক্তি হিসাবে সে বিবেচনা করে।

এখানে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্কিম বলেছেন, "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেও মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না।..." কিন্তু উপন্যাসের ভেতরের ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা বাইরের এই কৈফিয়ৎকে নাকচ করে দেয়। কেন না উপন্যাসে আওরঙ্গজেবের পাষণ্ড-প্রতিম আচরণ সেটা আপেক্ষিক নয়। অন্তত পাঠকের কাছে তেমন মোটেই মনে হয় না। 'রাজসিংহ'-এর আওরঙ্গজেব অমার্জনীয় দুর্বৃত্ত এবং তিনি যে একজন মুসলমান তাতে ভুল করবার কোনো উপায় নেই।

'সীতারাম'-এর সীতারাম হিন্দু ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে তাঁর শত্রু মুসলমানরা। এই উপন্যাসে ইংরেজ নেই। সীতারামের সকাম চরিত্র তাঁর ধর্মরাজ্য বিনাশের কারণ বলে বঙ্কিম বলেছেন। সেই তাত্ত্বিকতা বাদ দিলে যে সত্যটি সামনে আসে তা হল সীতারামের শত্রুপক্ষ মুসলমান। স্বদেশভক্তির জন্য অন্য কোনো পথের সন্ধান না করে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত ধর্মকেই অবলম্বন করলেন। এ দেশে ধর্ম যখনই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই তা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখেছি ইংরেজ শাসনামলে যখনই সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হয়েছে তখনই মূল শত্রু যে ইংরেজ সেটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বঙ্কিম সাহিত্যকে সব সময় সাহিত্য হিসেবে দেখতেন না। তাহলে বলতেই হয় বঙ্কিমের প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যে পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে, সেই পরিমাণেই ইংরেজদের দ্বারা গৃহীত বিভেদ নীতিকে পরোক্ষ সমর্থন যুগিয়েছে।

আরও একটি বিষয় এখানে আলোচিত হতে পারে। 'সীতারাম'-এর প্রথম সংস্করণে চাঁদশাহ ফকিরের উপদেশ অংশটি পরবর্তী সংস্করণের তিনি বাদ দেন। এমন পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণও বটে। এ ছাড়া উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে শেষাংশে ছিল, "এখন যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর..." ('সীতারাম', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৩) —এই উক্তি উপন্যাস বহির্ভূত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম শেষের দিকে ধর্ম-প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই চরিত্রের আপেক্ষিকতা স্মরণ রাখেননি। জয়ন্তীর পক্ষে কিছুতেই প্রফুল্লর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রফুল্ল অনেক পরে এসেছে। জয়ন্তীকে তিনি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালের বেষ্টনী থেকে বের করে এনে একটি কাল-নিরপেক্ষ সত্তায় পরিণত করেছেন। এ পর্যায়ে শিল্পীকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠতে চাচ্ছেন প্রচারক।

উপন্যাসের শেষের দিকে সীতারামের 'মুসলমান কণ্টক কাটিয়া বৈরীশূন্যস্থানে,

উত্তীর্ণ' হওয়া এবং চাঁদশাহ ফকিরের 'যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে' —বলে মক্কায় চলে যাওয়ার ঘটনা বিশেষ অর্থবহ। শিল্পী বঙ্কিম ঠিকই ধরেছেন যে, উপন্যাসে চিত্রিত হিন্দু মুসলমানের পক্ষে সহাবস্থান আর সম্ভবপর নয়। অন্যদিকে এটাও বলা যায়, চাঁদশাহ ফকিরের উক্তি বঙ্কিমের মুসলমান পাঠকদের উক্তিও বটে।

ধর্ম সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়নের অসম্ভাব্যতা দুটোই এ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সীতারামের ধর্মরাজ্য চালাতে পারবে কে? প্রফুল্ল পারে, পারে হয়তো জয়ন্তীও। কিন্তু জয়ন্তী তো রক্তমাংসের মানুষ নয়। তাকে তাই বেরিয়ে যেতে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রায়। আর প্রফুল্লর পরিণতির কথা সবারই জানা। তাহলে ধর্মরাজ্য স্থাপন ও রক্ষা করবে কে? এর জবাব কি পাঠককে খুঁজতে হবে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ?

'আনন্দমঠ'-এ 'বন্দেমাতরম' গানটিও উপন্যাসের প্রয়োজনেই এসেছে এটা বলা যেতে পারে। এই গান উপন্যাসের চরিত্ররাই গাইত। কিন্তু পরে এই গান উপন্যাস থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রধান মন্ত্র এবং তারও অনেক পরে বিভক্ত ভারতের সর্বাপেক্ষা উদ্দীপনামূলক দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীত রূপে বিবেচিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ওপর 'আনন্দ-মঠ'-এর প্রভাব ঐতিহাসিক সত্য, এবং সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে, অভিপ্রেত কি অনভিপ্রেত যা'ই হোক, এ উপন্যাস একটা বড় প্রভাব রেখে গেছে। যে কারণে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছে ঠিক সেই কারণেই মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা এ গ্রন্থের প্রতি বিরূপ হয়েছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসারে 'আনন্দমঠ'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন যে, "বস্তুত ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের আঘাতেই হিন্দু প্রথম আন্তরিকভাবে ইংরেজের বৈরী হল। তবু ১৯৩০ সন অবধি তারা স্বাধীনতা কামনা করেনি। আবার ১৯০৫ সনের পরেও অন্য গ্রন্থের অভাবে 'আনন্দ-মঠ'কেই উত্তেজনাপ্রাপ্তির অবলম্বন করে।' —'বঙ্কিমবীক্ষা : অন্য নিরিখে' "ভাষা-সাহিত্য-পত্র", , পৃ. ৫৭।

এ কথাও বলা চলে যে, যে-মুসলমানকে শত্রু হিসাবে 'আনন্দমঠ'-এ চিহ্নিত করা হয়েছে সে মুসলমান শাসক মুসলমান. তারা অবাঙালী এবং বঙ্কিমের প্রতিবেশী মুসলমান নয়। তিনি তাঁর কোনো রচনাতেই ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি তেমন কিছু প্রচার করেননি। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এখানকার মুসলমানরা পরাধীনতার কালে নিজেদের শুধু বাঙালী ভাবেনি মুসলমানও ভেবেছে এবং যেহেতু তাদের চারপাশে কোনো ভবিষ্যৎ তারা দেখতে পায়নি তাই নিজেদের মুসলমান রাজা-বাদশাহের গৌরবের অংশভাগী কল্পনা করে তারা বাস্তব জীবনের ঘাটতির মানস-ক্ষতিপূরণ ও ইচ্ছাপূরণ ঘটাত। সুতরাং

মুসলমানদের ওপর যে কোনো আক্রমণই তারা নিজেদের ওপর আক্রমণ হিসেবে নিয়েছে। পরবর্তীকালে খেলাফৎ আন্দোলন তারই একটি প্রমাণ। আক্রান্ত ও স্পর্শকাতর মুসলমান পাঠকের কাছে কোন উক্তি বঙ্কিমের কোন উক্তি সত্যানন্দ ভবানন্দের সে কথা বিবেচনা করা অবান্তর মনে হয়েছে। সত্যানন্দই বলুক বা ভবানন্দই বলুক উক্তিটি যে একজন হিন্দুর এবং লেখকও যে একজন হিন্দু এ কথাটাই বড় মনে হয়েছে পাঠকের কাছে। পাঠক মনে করেছে যে, এ উপন্যাস একজন লেখকের মতবাদ নয়, একটা সমাজ ও সম্প্রদায়ের মনোভাব। সাহিত্যের এই সাহিত্যাতিরিক্ত আবেদন লেখক রূপে বঙ্কিমের শক্তিরই স্বীকৃতি। দুর্বলতর লেখকের রচনা হলে 'আনন্দমঠ' তেমন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারত না যা বঙ্কিমের অনন্যসাধারণ প্রতিভার অবদান হওয়ার কারণে এ গ্রন্থ সৃষ্টি করেছে। আজকের পাঠকের পক্ষে যে নিরাসক্তি সম্ভব সেকালের পাঠকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না— হিন্দু পাঠকের পক্ষেও নয়, মুসলমানের পক্ষেও নয়।

উপন্যাসের নিরিখে মনে হয় যে, এ উপন্যাসে মহাপুরুষই বঙ্কিমের প্রতিনিধি। মহাপুরুষ যে ইংরেজকে শেষাবধি শত্রু না বলে মিত্র হিসাবে গণ্য করতে শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইংরেজদের রাজত্বভার গ্রহণকে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' বলে গণ্য করতে নির্দেশ দিচ্ছে সে নির্দেশও মুসলমানের পক্ষে শুধু অগ্রহণীয় নয়, বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টাও বটে। কেন না ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানরা মনে করত যে, ইংরেজ তাদের শত্রু, কারণ ইংরেজ আগমনে মুসলমান রাজত্বের শেষ হয়েছে।

'আনন্দমঠ' যখন 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল তখন বঙ্কিম 'যবন' বলতে ইংরেজকেই বুঝিয়েছেন। পরে যখন তিনি 'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন তখন 'বঙ্গদর্শন'-এ যেখানে যেখানে ইংরেজ ও মুসলমান এক সঙ্গে ছিল সেখানে শুধু মুসলমানকেই বুঝিয়েছেন এবং 'যবন' শব্দটিকে বিশেষভাবে মুসলমানের বিশেষণ ও সর্বনাম রূপে ব্যবহার করেছেন। মহাপুরুষের বিখ্যাত উক্তিটি 'ইংরেজ মিত্র রাজা' 'বঙ্গদর্শন'-এ ছিল না। স্বভাবতই ভেবে নেওয়া চলে, ঔপন্যাসিকের শ্রেণী স্বার্থচেতনাই তাঁকে এমন সংশোধনের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। 'সাহেবদের চটানো' তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, এবং চটানোর ব্যাপারে তিনি কিছুটা সন্ত্রস্তও ছিলেন। তাঁর শ্রেণী তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করছিল, রোষ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র একবার ঝাঁসির রাণী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।" (অরবিন্দ পোদ্দার, 'বঙ্কিম-মানস', ১৯৫৫, পৃ ১৪৮)।

তাঁর ইংরেজপ্রীতি এবং সামন্তবাদী ধর্মপ্রীতির মধ্যে কোনো বাস্তবিক বিরোধ নেই। কেন না সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যে স্বার্থগত সমঝোতা সাম্রাজ্য-

বাদী শাসনের প্রত্যক্ষ ফল। বঙ্কিমের মধ্যে বুর্জোয়া চেতনা তাঁর কালের চেতনার তুলনায় নিঃসন্দেহে অগ্রসর ছিল। যার প্রধান প্রমাণ তাঁর গদ্যের প্রবহমানতায় ও তাঁর উপন্যাস রচনাতেই সমুপস্থিত। তাঁর আগে 'নববাবুবিলাস' ব 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ ব্যক্তি-চরিত্র প্রাধান্য পায়নি, সমাজচিত্র প্রধান রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তি তখন ছিল সমাজের প্রতিনিধি মাত্র। বঙ্কিমই প্রথম ব্যক্তিকে এমন একটা ব্যক্তিত্ব দিলেন যে ব্যক্তিত্ব তখনও তাঁর সমাজে বিকাশিত হয়নি এবং এই মানবিক ব্যক্তিত্বে আস্থা বুর্জোয়া মূল্যবোধ হতে উদ্ভূত। তথাপি তাঁর রচনার মধ্যে আমরা ভক্তিবাদের যে প্রাবল্য দেখি তা নিঃসন্দেহে সামন্তবাদের আভ্যন্তরিক উপস্থিতির প্রমাণ ও প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদ তাঁর মিত্রপক্ষ কেন না সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্যে নিজেদের সুযোগ-সুবিধার বিকাশ ঘটেছে এবং তার বিরুদ্ধাচারণে ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি ও শ্রেণীগত স্বার্থের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; তদুপরি রয়েছে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের আশঙ্কা। বঙ্কিম কখনই 'সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক' ছিলেন না।

ইউরোপীয় রাজনৈতিক মতবাদ ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞানে তিনি উৎসাহী ছিলেন। সাহিত্যকে যে সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ বিধানে ব্যবহার করা সম্ভব ও প্রয়োজন সে ব্যাপারে তাঁর প্রত্যয় ছিল সুদৃঢ়। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি তাঁর সমাজের তুলনায় বহু ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা সংরক্ষণশীলতা ছিল এবং তিনি যখন সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন তখন এই সংরক্ষণশীলতা প্রতিক্রিয়াশীলতায় পরিণত হয়েছে। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ধনীপুত্রের যে অধিকার কৃষকপুত্রেরও সে অধিকারের কথা বলেছেন এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে জনশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির সমর্থন করেছেন[২৮] (এমন কি বিদ্যাসাগরও যে জনশিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির সমর্থন করেননি)। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের তিনি নিন্দা করেছেন। স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্রের প্রতি তাঁর যে 'সাম্যবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত তা তাঁর শ্রেণীর অন্যান্য মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল না। তথাপি তাঁর মধ্যে সংরক্ষণশীলতা ছিল। তিনি যে শেষ পর্যন্ত 'সাম্য' প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ক্রমশ ভক্তিবাদের ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠছিলেন তার দ্বারা যে সত্যটি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে —নিজের সংরক্ষণশীলতার ওপরে সামন্তবাদের গভীর এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব। প্রভাবই বুর্জোয়া উদারনীতিকে বিকাশিত হতে দেয়নি, বস্তুত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে। তাঁর এই মনোভাব তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই এসেছে। সিপাহী

---

২৮ ॥ দ্রষ্টব্য : "সর্ উলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল", বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯৩।

বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও বিভিন্ন কৃষক-বিদ্রোহের কোনো সমর্থনই যে তাঁর রচনায় নেই তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেন না তিনি ও তাঁর শ্রেণী সমাজবিপ্লবের তো বটেই সমাজ-বিদ্রোহেরও বিরোধী ছিলেন।

এই শ্রেণী হচ্ছে সেই শ্রেণী যারা কলকাতা থেকে ঘোড়ায় চড়ে গেলে আধ ঘণ্টার দূরত্বে সংঘটিত তিতুমীরের কৃষক-বিদ্রোহের কালে কলকাতায় বসে "ইংরেজ শাসকদের কাছে নিজেদের অন্ধ রাজভক্তি ও গোলামির দাসখৎ লিখে দিয়ে, স্পেন বা ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশের 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে' উল্লসিত হয়েছে এবং 'ভোজসভায় ইংরেজের আপ্যায়ন' করেছে।" (বিনয় ঘোষ, 'তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ', "এক্ষণ", শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ. ৩০)। এই শ্রেণীর চরিত্র নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নানা সময়ে পরীক্ষিত ও উন্মোচিত হয়েছে। এরই একটা উদাহরণ তিতুমীরের বিদ্রোহের প্রতি এই শ্রেণীর ঔদাসীন্য।

সেইজন্যেই আমরা দেখি যে, 'আনন্দমঠ'-এর বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত 'বিসর্জনে' শেষ হয়েছে। গুরুর নির্দেশে সত্যানন্দ কর্মের পথ ত্যাগ করে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে। তেমনি মহা-বিদ্রোহিনী দেবীচৌধুরাণীও শেষপর্যন্ত জমিদারগৃহের তিন গৃহিণীর এক গৃহিণী হয়ে বাসনকোসন ধোঁয়া ও রান্নাবান্না তদারক করার কাজ সহ সামন্তবাদী সংসারধর্ম পালন করে নারীজন্মের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। আরও দেখি ভবানী পাঠক তার কৃতকর্মের জন্য ইংরেজের কাছে দোষ স্বীকার করে 'প্রফুল্লচিত্তে' দ্বীপান্তরে চলে গেছে। বঙ্কিমের বিকাশমান বুর্জোয়া চেতনা সুপ্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদের সঙ্গে বিরোধিতায় যায়নি, বরং শেষপর্যন্ত সামন্তবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই শেষ জীবনে তিনি ভক্তি ও আনুগত্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' লেখেন।

বণিক ইংরেজকে বঙ্কিম চান না, সুশাসক ইংরেজকে চান। কিন্তু ইংরেজ তো শোষকও বটে। বঙ্কিমের কাছে এ সত্যও অজানা ছিল না মোটেও। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়টাকে তিনি দেখেছেন এভাবে "রাজার ধর্ম ক্ষত্রিয়-ধর্ম। বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্য ধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাংলার শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। ...বাংলা এমন দারিদ্র্য সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৬২-৬৩)। বণিকের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ কেন না তিনি বাণিজ্যের প্রতি সামন্তবাদী বীতশ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং সরকারী চাকুরে হিসেবে তিনি শাসক ইংরেজকেই শ্রেয় মনে করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও শুধু বঙ্কিমের সময়ে নয়, পরবর্তী-যুগেও 'আনন্দমঠ'-এর ধর্মযুক্ত সামন্তবাদী দেশভক্তির অনল-উচ্ছ্বাস মধ্যবিত্ত হিন্দু

বাঙালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'সাম্য'-এর মানবতা ও হিতধর্ম হিন্দু-বাঙালীর আদরণীয় হয়নি। যেমন হয়নি পরবর্তীকালে মার্কসীয় দর্শন। শ্রেণীস্বার্থে আঘাতকারী 'সাম্য'-এর মানবতা ও হিতের পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল 'আনন্দমঠ'-এর ব্যাপক আবেদনের কারণ অত্যন্ত স্বচ্ছ। 'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞপ্তি' সত্ত্বেও এই গ্রন্থের হিন্দু ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সহিংস জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণাই বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীর অনুশীলনীয় হয়ে উঠেছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যেমন তার আন্দোলনগুলিতে মুসলমানকে গ্রহণ করেনি, তেমনি সে দূরে সরিয়ে রেখেছে শ্রমজীবী শ্রেণীকেও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস গ্রন্থাকারে একই বছরে ১২৮৯ সনে (১৮৮২ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-এ 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয় চৈত্র ১২৮৭ সন থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ সন পর্যন্ত। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮, কার্তিক থেকে ১২৮৯ সনের আশ্বিন পর্যন্ত। আনন্দমঠীয় উত্তুঙ্গ জাতীয়তার যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট'-এর প্রতাপাদিত্যকে বীরচরিত্র রূপে চিহ্নিত না করে-করলেন দুশ্চরিত্র রূপে। ইতিহাসকে তৎকালীন ধারণায় গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি বীরগাথার মৌসুমেও। বীরে নয়, তাঁর পূজা চরিত্রে, উদয়াদিত্য এবং বসন্তরায় চরিত্রে যার প্রকাশ দেখি। তদুপরি এমন ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি তাঁর একটা অনাস্থা একেবারে প্রথম জীবন থেকেই ছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন একচ্ছত্র হয়ে পড়ে এবং অন্যের অধিকার অস্বীকার করে (যেমনটা আমরা প্রতাপাদিত্যের আচরণের মধ্যে দেখি), তখন তাকে রবীন্দ্র-নাথ চিহ্নিত করেন দুঃশাসক রূপে। সে জন্য তিনি রাষ্ট্র-ক্ষমতার বাইরে সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। অথচ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী অবরোধের মধ্যে থেকে কোনো সমাজই বিকাশিত হতে পারে না। উদয়াদিত্য ও বসন্তরায়ের পরিণতিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির যে অক্ষমতা ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যকে যথার্থ রূপে উন্মোচিত করেননি, বা করতে চাননি।

'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ রবীন্দ্রনাথ যদিও কোনো জাতীয়তাবাদী ধারণা তুলে ধরেননি তবু তাঁর লেখা ঐ সময়ের প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি তখন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলয়ের মধ্যেই ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদী আবেষ্টনীর অন্তর্গত ছিলেন তিনি। তবে তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা বঙ্কিম-চন্দ্রের মতো আক্রমণাত্মক ছিল না, সাম্প্রদায়িকও নয়। তিনি তখনও উগ্র হিন্দু ছিলেন কিন্তু ঐ হিন্দুত্ব আর উদার ভারতীয়ত্ব প্রায় অভিন্ন। এর কারণ, তাঁর পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের গোড়া থেকে একটা মঙ্গলময় স্বদেশী সমাজ গঠন করবার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। এ সময়ে তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণায় হিন্দুয়ানী উগ্রতা উনিশ শতকের তুলনায় যদিও অনেক কম তথাপি একেবারে অপসারিত হয়নি। কারণ কোনো কোনো লেখায়, যেমন 'নববর্ষ' (১৩০৯) 'ব্রাহ্মণ' (১৩০৯) প্রবন্ধদ্বয়ে, তিনি উগ্র হিন্দুরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। রবীন্দ্র-

নাথের এমন ধারণার পেছনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল বলে মনে হয় না বটে কিন্তু সামন্তবাদী মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল বলেই মনে হয়।

সামন্তবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতের একটি উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের···প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইতেছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ···পূর্বে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী অতি সহজ সরল, অতি প্রশান্ত অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বর মাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতার আরোহণ করিতে, সৈনিক-সিপাহি অকাতরেই চানা-চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত। আচার রক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজ রক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন করা তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে, আমরা নিজেই ইহাকে জানি না।"[১]

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তাযুক্ত প্রবন্ধ, বক্তৃতাগুলি লক্ষ্য করলে তাঁর চিন্তাধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রাজনীতি তাঁর কাছে সব সময়েই অনাদরণীয় বিজাতীয় ভাব রূপে দেখা দিয়েছে।[২] কারণ তাঁর মতে ভারতবর্ষের ইতিহাস কখনোই "রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।"[৩] ভারতীয়দের রাজনৈতিক কূটকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া তাঁর সমর্থন পায়নি।[৪] কেন না "পাশ্চাত্ত্য ন্যাশনালিজমকে" দেশাত্মবোধ থেকে পৃথক গণ্য করে রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন, সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হওয়া তার বাঞ্ছনীয় মনে হয়নি— "···Nationalism-এর। পরিণতি Imperialism-এ। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তার মূল খুঁজেছেন লোভের মধ্যে"।[৫] রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের সার্বিক কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন না। ইউরোপে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভারতবর্ষের জন্য কোনো মতেই তিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। কারণ ভারতবর্ষে সমাজ সকলের বড়। সে জন্য একটা মঙ্গলময় ভারতবর্ষীয় সমাজের কথা তিনি কল্পনা করতেন। প্রবৃত্তি, যা রাষ্ট্রপ্রধান সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য, সে প্রবৃত্তি দিয়ে আদর্শ সমাজ গড়া সম্ভব নয়। আর রাজনীতির চাওয়া-পাওয়ার খেলাটাকে তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায়

—

১॥ 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষ', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

২॥ 'বর্তমান যুগ', 'শান্তিনিকেতন', র. র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

৩॥ 'ধর্মপদং', 'ভারতবর্ষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১।

৪॥ 'অত্যুক্তি', 'ভারতবর্ষ' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

৫॥ সুশোভন সরকার, 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি', 'নতুন সাহিত্য', (১৯৬১), পৃ. ৩৭।

শা।াবত হচ্ছে বলেই জানতেন। তার সাধনা নিবৃত্তির। যে নিবৃত্তির পথে ভারতবর্ষের অতীতে সভ্যতা চালিত হয়েছে সেই নিবৃত্তিই তাঁর কাম্য।[৬] স্বভাবতই তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না। বরঞ্চ সমর্থন জানিয়েছেন সমাজ ও শিক্ষাস ংবিযুক্ত আন্দোলনগুলির প্রতি।

আত্মত্যাগ, আত্মশক্তি অর্জন ও জনসংযোগের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই জোর দিয়েছেন। তিনি ছিলেন তাত্ত্বিক। তাই তাঁর লেখায় কর্তব্য-বুদ্ধির তুলনায় শুভবুদ্ধির প্রাধান্য দেখা যায়।

শিক্ষিত সমাজের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস, তা সে যতই মহৎ উদ্দেশ্যে চালিত হোক না কেন, তা রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশী অংশের ক্রিয়াকর্মে জনসংযোগহীনতা ছিল এক ধরনের অদ্ভুত অসঙ্গতি। রবীন্দ্রনাথ এমন অসঙ্গতি দেখে বলেছেন, "দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য আমরা সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজী শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি, আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না"।[৭] জনসাধারণ ও শিক্ষিতের সম্পর্কশূন্যতা দেখে তিনি বারবার সচেতন করতে চেয়েছেন শিক্ষিতশ্রেণীকে। আত্মশক্তির প্রতি তাঁর আস্থা ছিল সুদৃঢ়। আত্মশক্তি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর মতে, আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই।"[৮] তিনি রাজনীতির একটি মাত্র মঙ্গলময় উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন, "পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা।"[৯] রাষ্ট্রের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে সমাজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে তিনি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মহিমাময় সামাজিক মঙ্গলবোধটির উল্লেখ বহুবার করেছেন। গঠনমূলক স্বাদেশিকতাই তাঁর কাম্য। "বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব"[১০] —এহেন ইংরেজ শাসক-বাধী দরখাস্ত-সর্বস্ব রাজনীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা যেমন অস্বীকার করেছেন তেমনি 'এ্যাজিটেশান' আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। বরং ক্রমে এমন দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন।

৬॥ ভারতবর্ষীয় সমাজ, 'আত্মশক্তি', র. র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২২-২৩।

৭॥ 'স্বদেশী সমাজ', 'আত্মশক্তি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৮॥ 'সফলতার সদুপায়', ঐ, পৃ. ৫৭৩।

৯॥ 'স্বদেশী সমাজ' ঐ, পৃ. ৫৩২।

১০॥ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', ঐ, পৃ. ৬০৪।

অথচ তিনি শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। বিদেশী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে বৈধ আন্দোলনকেও মাথা বাঁচিয়ে চলতে হয় এবং বলতে হয়, সে জন্য ঐ ধরনের আন্দোলনে নানা রকম অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনপাশ থেকে মুক্ত হতে এ ধরনের আন্দোলনের সূচনাকালে ত্রুটি সত্ত্বেও যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চাননি। রাষ্ট্রের পরিচালিকা শক্তির বিরোধিতার তুলনায় প্রজার গভীর আত্মশক্তি উদ্বোধনে তাঁর আস্থা অধিক।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি-বিবর্জিত, রাষ্ট্রবিমুখ স্বাদেশিকতা কামনা করেছেন। বিদেশী সরকারকে অগ্রাহ্য করে নিজের দেশকে ও দেশবাসীকে বিশেষ রূপে চেনা-জানা, আত্মশক্তি সঞ্চয় করা, প্রয়োজনানুসারে সেবাধর্ম পালন —এক কথায় বলা চলে স্বল্পতুষ্ট একটি প্রাচীন তপোবনাশ্রয়ী চেতনাই ছিল তাঁর স্বাদেশিকতার ভিত্তি। তিনি বরাবরই সমাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে। কিন্তু লক্ষ্য করছেন না যে, ইংরেজ এ দেশে একটি জীবন্ত রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করেছে এবং ভারতীয় সমাজ সেই রাষ্ট্রযান্ত্রিক বেষ্টনীর মধ্যে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। ফলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পরিবর্তন না আনলে, অর্থাৎ ইংরেজকে বিতাড়িত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করলে সমাজের যে মুক্তি নেই এ সত্যটাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। যে কারণে দেখতে পাই তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষেও শান্তি-নিকেতনকে তপোবনে রূপান্তরিত করা যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি সম্ভব হয়নি নিজ জমিদারীতে প্রজাদের মঙ্গলার্থে দীর্ঘকালের জন্য কোনো সুষ্ঠু সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখা।

বিশ শতকের শুরুতে কংগ্রেসের স্বরূপটি ছিল আধারাজনৈতিক। উনিশ শতকীয় ইংরেজ-প্রশস্তিতে কংগ্রেস তখনও মুখর। তবে কংগ্রেসের আন্দোলন-গুলির প্রাণকেন্দ্র ছিল দেশীয় যোগ্য লোকদের দ্বারা শাসনকাজ চালাবার প্রস্তাব ও দাবি উত্থাপন করা। কংগ্রেসের বাহ্যিক গড়নটা ছিল এ-সময়ে অসাম্প্রদায়িক। দেশের ভেতরে সংঘটিত কুশাসন বা অবিচারে কংগ্রেসকে এ-সময়ে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছিল না। বরং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও দেশ ও বিদেশে সংঘটিত বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলেছেন। তাঁর বহুসংখ্যক প্রবন্ধে অন্যায় অত্যাচারের বিপক্ষে প্রতিবাদ রয়েছে। ভারতবর্ষের বর্তমান দুরবস্থার কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে —এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ 'হাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া' —এক সময়ে ভারতে পৌরুষ রক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরানিগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টাপূর্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্যে

দীক্ষিত করিয়াছে, আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মতো নিমগ্ন হইয়াছে। —ইংরেজ বলে, 'তোমরা কেবলই চাকরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যবসা কর না কেন?' এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচশত কোটি টাকা খাজনায় ও মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়?"[১১] রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক চেতনা এখানে নির্ভুল, এখানে তাঁর দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতো স্বচ্ছ।

তবু এর মধ্যেও কিন্তু আছে। প্রতিকারের উপায় রূপে তিনি নির্দিষ্ট করলেন আত্মশক্তি অর্জন করাকে। এ ছাড়া সর্বদাই তিনি সমগ্র দেশের ঐক্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। একতা তাঁর মতে একটি মঙ্গলময় শক্তি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, একতা কার সঙ্গে কার? ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, প্রবলের সঙ্গে দুর্বলের, নিপীড়নকারীর সঙ্গে নিপীড়িতের একতা তো কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং ধন বণ্টনের অসাম্য বজায় রেখে প্রকৃত ও কার্যকর একতা গড়ার আশা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তির ভূমিকার ওপর। কিন্তু এই ব্যক্তি কোন ব্যক্তি? শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তির অবস্থান অবশ্যই কোনো না কোনো শ্রেণীতে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কাছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটি যদি হয় জমিদার বা আমলা-বুর্জোয়া শ্রেণীর তবে শ্রেণীগত অবস্থানের অনিবার্য কারণেই সে ব্যক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সহযোগী না হয়ে উপায় থাকে না। তার স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং তার কাছ থেকে সমাজ ব্যবস্থার যথার্থ অর্থাৎ মূলগত পরিবর্তন আনার জন্য সংগ্রাম প্রত্যাশা করা অত্যন্ত অন্যায়। ব্যক্তির আত্মত্যাগের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জনের দ্বারায় পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাতেই দিব।"[১২] কিন্তু এ কথা তো অত্যন্ত স্পষ্ট যে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করা ভিন্ন সামাজিক রোগের প্রতিকার বা নিরাময় নেই, আর সেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভের উপায় নিশ্চয় ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ নয়, উপায় হচ্ছে সমবেত শক্তি, সম্মিলিত সংগ্রাম। আত্মশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে বিবেচনা করতেন। এতে নিজের শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর আস্থাই প্রকাশ পায়। তাঁর সমাজে—কি রাজনীতিতে কি শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাই প্রধান ছিল, রবীন্দ্রনাথও সে ব্যক্তিত্ববাদেই আস্থা রাখছেন। এই আস্থা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

১৯০৫ সালে সুবিশাল বঙ্গদেশকে লর্ড কার্জন বিভক্ত করলেন। বঙ্গভঙ্গে

১১॥ 'অত্যুক্তি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১-৫২।

১২॥ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। নেতারা শুরু করলেন ব্যাপক আন্দোলন। মূলত বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ এই বিভাগের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। বহু বর্ণহিন্দু জমিদার এবং উচ্চবিত্তজীবীর সম্পত্তি ছিল পূর্ববঙ্গে। উভয় বাংলাতেই বাঙালী হিন্দু ছিল সংখ্যালঘু। স্বল্পসংখ্যক মুসলমান আংশিক সহানুভূতি দেখিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি। নবগঠিত প্রদেশে অনেক মুসলমান তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। এমন অবস্থায় স্যার সলিমুল্লাহ্ ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ঢাকায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের বিপদগ্রস্ত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটা আন্দোলন গড়ে উঠল যা হিন্দু পুনর্জাগরণকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বর্ণহিন্দুদের এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন বলে মেনে নেয়নি। অপর দিকে "মৌলবী, মোল্লা, মুন্সী, ছোট সরকারী কর্মচারী, মোক্তার, সম্পন্ন কৃষক ইত্যাদি শ্রেণীর সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরাই দরিদ্র মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষোভকে ধর্মীয় অস্ত্রের সাহায্যে হিন্দু জমিদার, মহাজন, আইনজীবী প্রভৃতির বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন।"[১৩] ফলে স্বদেশী আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠলে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবও জোরালো হয়ে ওঠে।

স্বদেশপ্রেম এতদিন একটা 'আইডিয়া' মাত্র ছিল। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী তাকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কর্মে রূপান্তরিত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। বঙ্গভঙ্গের দরুন শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে পড়লেন। দেশ-প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হল দৃঢ়তর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শ এর প্রেরণা। এ ধরনের জাতীয়তাবাদী ধারণা ভারতীয় জাতীয় চেতনার পক্ষে বড় ত্রুটি। ভারতবর্ষের মতো বহু ধর্মাবলম্বী, অসংখ্য জাতি ও বিচিত্র সম্প্রদায়ের দারিদ্র প্রপীড়িত দেশে জাতীয় ঐক্যের জন্য দরকার ছিল বস্তুবাদী অর্থাৎ অর্থনীতি নির্ভর ভাবধারা। তা না এসে এল 'হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদ'। এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার গেল পিছিয়ে। অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় মিলন ঘটল। সম্মিলিতভাবে তারা এ দেশে অভূতপূর্ব 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করল। নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনে অংশ নেয়নি। তবু আন্দোলনের এমন প্রসার এ দেশে আগে কখনও দেখা যায়নি। বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বের পরিচয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকেই লভ্য। এই

১৩॥ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

আন্দোলন যেমন সাহিত্যকে স্পর্শ করেছে তেমনি তার সাহিত্যিক প্রকাশ জাতীয় চেতনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কয়েক মাস মাত্র সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অতুলনীয় স্বদেশী গানগুলির প্রধান সুর অভয়বাণী, স্বদেশকে চেনা ও চেনানো। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ রূপে হিন্দু হলেও অন্তরে মানবিক ও ন্যায়নিষ্ঠ। তার রাজনীতি সমাজনীতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংরেজের ওপর রাগ করে দেশকে ভালোবাসতে গেলে দেশ উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এ হেন দেশপ্রীতির সততায় তিনি অবিশ্বাসী, সীমাবদ্ধতায় ক্ষুব্ধ। ভাবুক ও তাত্ত্বিক বলে তিনি চেয়েছিলেন বাঙালীর অন্তরের উত্তরণ হোক, জড়তা কাটিয়ে জাতির মানসমুক্তি ঘটুক। কিন্তু আন্দোলন চলল তার নিজের ধারা অনুসারে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ সরে গেলেন তার নির্জনতায়। উগ্র স্বাদেশিকতা তার জন্য নয়। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফরাসী বিপ্লবকে প্রথমে আগ্রহের সঙ্গে বরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনকে প্রথমে এমন একটা উদ্দীপক জীবনীশক্তি ভেবেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লব বা আন্দোলনকে প্রাথমিক ঝোঁকে এই দুই কবি তাঁদের চিত্তবৃত্তির অনুসারী বলে কল্পনা করেছিলেন। বাস্তবে এর রূঢ়তা তাদের অসহ মনে হয়েছে।

আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের বিরোধী রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি। ১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকেই তার চিন্তাধারার কিছুটা রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে মানবতার বিরোধ আর হিন্দুত্বের ঊর্ধ্বে জাতীয়তাবোধ ডানা মেলতে পারে কিনা এ দুটি প্রশ্ন তাঁকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছিল। 'গোরা' (১৯১০ খৃঃ.) তাঁর এই সময়ের মানস-চিত্র। এ উপন্যাসে তাঁর জীবন-দর্শনের রমণীয় প্রকাশ। প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্যে মতবাদ কতটা বাস্তব মানুষ হয়ে উঠতে পারে? 'গোরা'র একটি চরিত্র বিনয়ের প্রসঙ্গে এর উত্তর রয়েছে—"মত হিসাবে একটা কথা যেমনতরো শুনিতে হয়, মানুষের ওপর প্রয়োগ করিবার বেলায় সকল সময় তাহার সেই একান্ত নিশ্চিত ভাবটা থাকে না—অন্তত বিনয়ের কাছে থাকে না, বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে, কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশী না মানিয়া থাকিতে পারে-না।"[১৪]—মানুষকে বেশী করে মেনে নেওয়াতেই 'গোরা'র সার্থকতা। 'মতের পুতুল' না হয়ে, শিল্প-ব্যত্যয় না ঘটিয়ে বিকাশমান চরিত্রগুলি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'গোরা' তর্ক-মুখর। উনিশ শতকের শেষাংশে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজ নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল 'গোরা' সেই তর্কযুদ্ধের ফলশ্রুতি। চরিত্রগুলির সবাক রূপায়ণ এইসব তর্কের সূত্র ধরেই। কতকগুলি

১৪॥ 'গোরা', র. র. ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৯।

প্রধান প্রধান তর্ক ব্যক্তিত্ব-বহ। আর গোরার পরিবর্তন বা পূর্ণতা এক অর্থে তার ধর্মমতেরই পরিবর্তন ও পূর্ণতা।

গোরার সব কিছুই স্বতন্ত্র। উচ্চতা, গলার স্বর, বলার স্টাইল, চলার ভঙ্গি, বর্ণচ্ছটা সকলকে সচকিত করে তোলে। গোরা আজন্ম ভিন্ন প্রকৃতির। ইংরেজ বিদ্বেষ আবাল্য তার চরিত্রে জড়ানো। কেশববাবুর বক্তৃতা শুনে ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্ম হয়ে যায় আর কি। আচারবাতিক পিতার ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে প্রায়ই গায়ে পড়া তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের। তার উক্তিতে সে সময়ে যুক্তির চেয়ে জেদই প্রধান। কিন্তু সে নতি স্বীকার করল বিদ্যাবাগীশ হরচন্দ্রের কাছে। কেন না তার চরিত্রে "ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন একটি অবিচলিত ধৈর্য ও গভীরতা ছিল যে তাঁহার কাছে নিজেকে সংযত না করা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল" (১৩৮)*। ব্রাহ্ম পরেশবাবুর চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে বিনয়নম্র হরচন্দ্রের। বেদান্তচর্চা ও বেদান্তদর্শনের মধ্যে গোরা তলিয়ে গেল। মিশনারী পাদরির সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এবং 'হিণ্ডুয়িজম্' বই লিখতে যেয়ে গোরা আচারনিষ্ঠ হিন্দু হল। তার হিন্দুয়ানীর উগ্রতায় হকচকিত আশপাশের মানুষ।

গোরার দ্বিধা লক্ষ্য করবার মতো। কারণ ধর্মের শুচিবায়ু আক্রান্ত কৃষ্ণদয়ালের তুলনায় "মাতার অনাচারকে সে যতই নিন্দা করুক, এই আচারদ্রোহিণী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি সমর্পণ করিয়া পূজা করিত" (২৪৯)। আনন্দময়ীর অনাচারকে নিন্দার কারণ, "যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব' (৩৮)। এই রকম আচারনিষ্ঠার জন্ম নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেম থেকে। আর গোরা এমন উদার ও স্বার্থহীন বলেই উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী উগ্রতা থেকে দূরবর্তী। তার চরিত্রের সংগ্রামী তর্কোন্মুখ প্রবণতা অসঙ্গত হলেও এ জন্যই সহনীয়।

বিনয় বলেছে, "গোরা বলিতে শুধু যে গোরা মানুষটি তাহা নহে, গোরা যে ভাব, যে বিশ্বাস, যে জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে সেটাও বটে।" (৬২২)। সুচরিতার ঐ কথারই প্রতিধ্বনি, "গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং, সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে—তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশ প্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা মত নয় যে

* অতঃপর বৃত্ত-বন্ধনীর মধ্যে আলোচিত গ্রন্থের পৃষ্ঠার ক্রমিক দেওয়া হচ্ছে।

তাহাকে প্রতিবাদ করিয়াই চুকাইয়া দেওয়া যাইবে—তাহা যে সম্পূর্ণ মানুষ —এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে।" (২৬৪)

গোরার আর একটি বিশেষত্ব তার জনসংযোগের চেষ্টা। "নিচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই যথার্থ নিষ্কৃতি নেই" —এ তার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত অশিক্ষিতের দূরত্বে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। জনগণ মন না জানলে অধিনায়ক হওয়া যায় না, নেওয়া যায় না সেবা করার দায়।

বিনয় ও গোরা দু'জনেই পড়ল প্রেমে। এতকাল গোরার ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক ছিল না। বিনয়-ললিতা প্রসঙ্গ দ্বন্দ্ব-মধুর। তাদের পরিণতি স্বভাবানুযায়ী সবল। "এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল।" কিন্তু এই 'মাধুর্যের আবর্তে' বেদনার ও আনন্দের 'প্রগাঢ় অনুভূতি' তার 'সমগ্র প্রশ্নকে সমগ্র দ্বিধাকে' নিরস্ত করে দিল। ব্যক্তি প্রেমের এই অনুভব থেকে নিস্তারের আশায় তার পলায়ন প্রবৃত্তি। 'নির্দয় উৎসাহে' গোরা কলকাতার বাইরের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে লাগল এবং বিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, দুর্বল, অশক্ত, অচেতন, অজ্ঞ ও উদাসীন ভারতবর্ষের মূর্তি এই প্রথমবারের মতো দেখে বিচলিত হল। একটি জমিদারী যা নীলকর সাহেবদের ইজারা, তার চরে নীলের জমি নিয়ে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে দেশীয় প্রজাদের তুমুল বিরোধ। নীলকর সাহেব এবং তার সহযোগী দেশীয় লোকদের অন্যায় অবিচার দেখে ক্রোধে গোরা উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং এর পরই গোরাকে কারাগারে যেতে হল—কিন্তু সেটা অন্য ঘটনার সূত্র ধরে। কলকাতার পরিচিত ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামার জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে যেতে হল কারাগারে। সেখানকার দুঃসহ দিনগুলি সহনযোগ্য করে তুলেছিল অনেকটা সুচরিতার স্মৃতি। কারামুক্ত হয়ে সেইজন্যই সে নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছে সুচরিতার কাছে, "তোমার সঙ্গে একসঙ্গে একদৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব, এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে।" অবশ্য হরিমোহিনীর সমালোচনায় নিজের ঐ আত্মস্মৃতিতে গোরা নিজের ওপর নির্মম হয়ে উঠল। প্রায়শ্চিত্তের ভূত চেপে বসল কাঁধে। অজস্র লোক সমাগম ও স্তাবকদের সরব কোলাহলের থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে সকাল থেকে সন্ধ্যা কলকাতার বাইরের গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াত। তরুণ পরিব্রাজক এ বারে গ্রামের দুর্দশা দেখে নিজেকে আর বিচ্ছিন্নতার ইন্দ্রজালে জড়িয়ে রাখতে পারল না, "দেশের প্রতি তাহার অনুরাগের প্রবলতাই তাহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্য রূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়" (৫৩২)। সুচরিতাকে ছাড়পত্র লিখে দেবার পর তার বেদনা কি গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। কাহিনীতে আপাত অসম্ভব চরিত্রের মিলন সাধন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দ্বিমুখী ধারণা ছিল জনতা সম্বন্ধে। তাঁর সাহিত্যে

জনতাপ্রীতি ও নির্জনতাপ্রীতির দুই বিপরীত ধারা লক্ষণীয়। জনারণ্য যখন দুঃসহ বোধ হত নির্জনতার শান্তিকেই আশ্রয় করতেন। কলকাতার হট্টগোলে অস্থির চিত্তে চলে যেতেন বাইরে। নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে তাঁর দেশ এবং বিশ্বভ্রমণ, জনতা থেকে মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে নির্জনতা অনুসন্ধানেরই রূপক যেন। "তাঁর দার্শনিক দাদা বলেছিলেন, 'রবি, জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত এভাবে ছুটে বেড়াস কেন? তোর মত লোকের উচিত নিজের মধ্যে গোটা জগতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা, জগতের মধ্যে নিজেকে খোঁজার বদলে।" (পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ', ১৩৭০, পৃ. ১১০)। এই অন্বেষণের রহস্যের প্রকাশ তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে লভ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য, "Rabindranath possesses a double personality however dynamic it may be. When he visits western countries and on his return addresses the people here (in India), his poetic sensitive soul is enraptured by the energy of the life in the west, its freedom, expansiveness and her magnificent works of art. When he stays in India for a sufficiently long time to intensely feel with a subject race (his own people, his kith and kin) what western man has made of man in India, his rebellious spirit flares up in righteous indignation." (Taraknath Das, *Rabindranath Tagore—His Religious, Social and Political Ideals* (1932, p. 51)। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ফলে একদিকে স্বাদেশিক চেতনায় তিনি ঋষি, অন্যদিকে আবার তিনি ইউরোপীয় প্রাণশক্তির স্তাবক। কিন্তু এই প্রবণতা অবিমিশ্র রয়ে গেছে তাঁর চেতনায়।

'গোরা'র পটভূমি কলকাতা। এই উপন্যাস পাঠ কালে চরিত্র মাহাত্ম্যে এমন অভিভূত থাকতে হয় যে, স্থানমাহাত্ম্য মন কাড়বার অবকাশ পায় না। যুগের দ্বন্দ্বে উপন্যাসখানিতে জড়িয়ে আছে রোমান্সের আমেজ। গোরার ঋজুতা, সুচরিতার বুদ্ধিদীপ্ত নম্রতা, আনন্দময়ীর সস্নেহ অভিব্যক্তি, পরেশবাবুর ভক্তিমিশ্রিত ঔদার্য, পানুবাবুর শীলিত কর্কশ রূঢ়তা, বিনয়ের প্রেম ও বন্ধুপ্রীতি, ললিতার ললিত রহস্যময়তা, বাঙালী গৃহস্থ মহিম—সমস্ত চরিত্রগুলি বক্তব্য ও প্রকাশের অবিভাজ্য অখণ্ডতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের সংহত ঐক্যে, চরিত্র-স্ফুটনে, প্রেমের মধুর বর্ণনে, দেশকে ভালোবাসার কথায়, আলাপে সংলাপে ভাষার অলংকার ও সৌষ্ঠবে 'গোরা' অনুপম সৃষ্টি।

শেষ পর্যন্ত গোরা ধর্মের সংস্কার মুক্ত হল। জনসেবা দেশসেবার সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ দিক। রবীন্দ্রনাথ তাই দেশপ্রেমিক গোরাকে ধর্মীয় বন্ধনমুক্ত করে, সংস্কার-উত্তীর্ণ করে কল্যাণকামী সেবকদের নির্বিবাদ অসঙ্কোচ উদার হৃদয়ের ভিত্তি দেখাতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের মুক্তি যে খুঁজবে তার নিজের মুক্ত হওয়া দরকার সবার আগে। ভারত-পথিক গোরার আত্মানুসন্ধানের এই পরিণতি তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধ্রুপদী উপন্যাসের বিশাল অবয়বে একটা যুগ কথা বলে উঠেছে। সে যুগটা হচ্ছে উনিশ শতকের শেষভাগ। স্বদেশপ্রেমের উন্মেষপর্ব বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চাচ্ছেন স্বদেশী আন্দোলনের সত্যপথের কথা। জাতীয়তাবাদ নয় ভারতাত্মা-সন্ধানই 'গোরা'র মূল লক্ষ্য এবং সেটা রবীন্দ্রনাথেরও।

স্বদেশী-উদ্দীপনার যুগে 'গোরা' রচিত। বঙ্গভঙ্গ তখনও রহিত হয়নি। ১৯০৫-১০ সালের মধ্যে অনেক বড় বড় ঢেউ বয়ে গেছে দেশের ওপরে। স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জন এবং সন্ত্রাসবাদের বহুমুখী উত্তেজনার আগুনে বাঙালীর হৃদয় তখন প্রজ্বলিত ছিল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি লক্ষণ যদি হয় যুগের গভীরে অনুপ্রবেশ করে যুগাতীত হওয়া, যুগের বিশিষ্ট সত্যের সঙ্গে মানবতার চিরকালের সত্য প্রকাশ করা তবে সেই মিলিত বিচারে 'গোরা' অবশ্যই সফল সৃষ্টি। ব্যক্তি-গত আত্মা অন্বেষণের মতো নিরপেক্ষ অনুশীলনকেও কালোচিত হতে হয়। 'গোরা'র মধ্যে রয়েছে একদিকে স্বদেশী যুগের সত্যপথ আবিষ্কারের প্রয়াস, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের আত্মানুসন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহ।

গোরার সংস্কারবদ্ধতা, ইংরেজ-বিদ্বেষ, হিন্দু সভ্যতাকে এবং ধর্মকে অনুসন্ধান করে ফেরা এ দিকটি স্বদেশী যুগের উন্মেষ ও বিকাশ পর্বের। তবে 'গোরা'র সত্যের উৎস হচ্ছে নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম এবং 'স্বদেশী'-র শ্রেণীস্বার্থযুক্ত দেশপ্রীতির মধ্যেকার পার্থক্যটা বিরাট। স্বদেশী যুগের 'দেশহিত' করার প্রয়াসকে তিনি দেশপ্রেম নাম দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন। 'গোরা'র শেষাংশ রচনা এবং 'গীতাঞ্জলি' লেখার শুরু একই সময়ে। হিন্দু পুনরুজ্জীবন ঘেঁষা স্বদেশবোধ থেকে একটা উদার মানবতাবোধে রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তীর্ণ। স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'গোরা' রচনার পর তিনি আশ্রমের সামাজিক সংস্কারগুলি আস্তে আস্তে ভেঙে দেন।

এই প্রসঙ্গে একজন ফরাসী সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের তুলনা করতে যেয়ে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা উল্লেখযোগ্য, "Both were of feudal origin, and both went to the people. At the beginning they both thought of helping the downtrodden masses by half-hearted methods of political and material charity; later on when they realised that these means are not worthy of them and of humanity at large, they both escaped into

religion, the Russian into a revivalist evangelism, the Indian into a broadened but also weakened Hinduism, which is akin to western doctrines, with its conception of a personal God : and both became, either in prose or in verse, great religious poets. Confronted by the problem of the destiny of humanity, both have one principle in common, that of non-resistance to evil, if the only remaining form of resistance is violence". (A. Aronson, *Rabindranath Through Western Eyes*, Allahabad, 1943, p. 112)।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে উপন্যাস হিসাবে 'গোরা' সার্থক। এই উপন্যাসে তত্ত্বকে সৃষ্টিশীল কল্পনার বিষয় করে তোলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে সমাজের বৃহৎ একটা চিত্র, বড় জীবনের ছবি রয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমাজের ছবিটা বড় হলেও, চিত্রিত সমাজ কিন্তু তেমন বড় নয়। 'গোরা এবং তার সন্নিকটবর্তী ব্যক্তিরা (দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) সমাজ অন্তরালবর্তী ক্ষুদ্রতা, সংস্কারবদ্ধতা ও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কর্মহীনতার দ্বারা বেষ্টিত। গোরার জীবনেও চাঞ্চল্য আছে কিন্তু কর্ম নেই। সমাজ এক জায়গায় এসে থেমে পড়ছে। গোরা নিজেও সে সত্য উপলব্ধি করেছে। নিজের জন্ম-পরিচয় জানার পর সে ছুটে গেছে পরেশবাবুর কাছে। গোরা বলেছে, "পরেশবাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি, একটা না একটা জায়গায় বেধেছে," (৫৬৯)। উদার ধার্মিক পরেশবাবুর কাছে গোরা শিষ্যত্ব যাচ্ঞা করেছে, তেমন এক দেবতার মন্ত্র চেয়েছে "যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা" (৫৭১)। গোরার এই উক্তিটি আবেগমথিত। এটি শুনলে খুব মহৎ কোনো সত্যের সন্ধান সে পেয়েছে বলে মনে হয়।' ভারতবর্ষের যে ঐক্যের কথা গোরা এত বড় করে ভাবছে সে ঐক্য অনেকটাই তার মনগড়া। তার প্রারম্ভিক কথনে "আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেই জন্যেই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পাননি" (৫৭১) বলে গোরা অতীব বাস্তব, রূঢ় সত্য উন্মোচিত করে দিয়েছে। এই কঠিন বাস্তবকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। গোরা'র আবেগ-মন্থনজাত অনুভূতির পথ রোধ করে সেই অনিবার্য সত্যটি দাঁড়িয়ে আছে যে, প্রচলিত কোনো সমাজেই এদের জন্যে স্থান হবে না।

গোরার এই ধর্ম-বিচ্যুতি আসলে এক ধরনের আকস্মিক পরিণতি। নীহাররঞ্জন রায় গোরার এই অবস্থানকে 'শ্রেণীচ্যুতি' বলে অভিহিত করেছেন। গোরাকে সমাজচ্যুত বলা যেতে পারে কিন্তু তার এই বিচ্যুতিকে

'শ্রেণীচ্যুতি'[১৫] বলা যায় না। গোরা যে সমাজের মানুষ সেই সামাজিক পটভূমিতে তার অবস্থান ও অগ্রগতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পরেশবাবুর মতো গোরাও সমাজে ঠাঁই পাবে না। বাইরে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হয়তো তার মেলামেশা করবার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেল, কিন্তু এই জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে গেলে বিরোধিতা আসে শাসকের কাছ থেকে। কারণ গোরা যে সমাজের মঙ্গল করতে চাচ্ছে সে সমাজ স্থবির। এ সমাজ উপনিবেশের সমাজ, সাম্রাজ্যবাদের শাসনে সামন্তবাদ দ্বারা বেষ্টিত।

গোরার অর্থনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ এই সূত্র ধরে আসে। কৃষ্ণদয়াল এককালে ছিল ইংরেজদের দালাল এবং 'মিউটিনি'র সময়ে 'কৌশলে দুই-একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়া ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন' (১৩৬)। এই লাভজনক জায়গির কৃষ্ণদয়াল গোরাকে দান করবে বলে আনন্দময়ীকে জানিয়েছে (১৪১)। গোরা নিজেও শেষ পর্যন্ত জানতে পারল সে 'মিউটিনি'র সময়ে ভারতবর্ষীয় সিপাইদের সঙ্গে লড়াইতে নিহত আইরিশম্যানের সন্তান —অবশ্য তার এই পরিচয় চারজন বাদে সবার কাছে প্রচ্ছন্ন থেকেছে। সে অবশ্য নিজের জন্মদাতা পিতার সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখায়নি এবং কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে তার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই মনে করেও স্বস্তি লাভ করেছে। অথচ গোরা কৃষ্ণদয়ালের ওপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্ভরশীল। 'পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেছে, নিজে খেটে উপার্জন করে খাবে' (১৪১) বলে যদিও আনন্দময়ী গোরার একটা অর্থনৈতিক জীবনের সম্ভাবনার কথা প্রথমেই বলেছিল কিন্তু তেমন সম্ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ উপন্যাসের কোথাও দেখা যায়নি। পরাধীন ভারতবর্ষে গোরার মতো এমন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রের পক্ষে উপযুক্ত জীবিকা কি হবে সেটা কল্পনা করা সহজ নয়।

'গোরা'র মহাকাব্যিক উপস্থাপনায় চরঘোষপুর একটা প্রান্তিক অবস্থান। এখানে গোরা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে দেখেছে, অত্যাচার দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিবাদ করে জেলেও গেছে। এই নিপীড়িত শোষিত সম্প্রদায়ের মুক্তি ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত কোনো নায়ক আনতে পারবে না, এমন মুক্তি আসতে পারে একমাত্র সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বারা। এমন মুক্তির মন্ত্র গোরা যদি নেয় তবে তাকে হতে হবে রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা নেতা। চরঘোষপুরের অত্যাচারীকে ইংরেজ-বিদ্বেষী গোরা প্রত্যক্ষ করেছে। সে হচ্ছে 'ছোট ইংরেজ' অর্থাৎ কুশাসক ইংরেজ। কিন্তু এই সত্যটা গোরা উপলব্ধি করেনি যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এ দেশের জনগণের মূল শত্রু। উপন্যাসের শেষাংশে নিজের বিজাতীয় পরিচয় পেয়ে গোরা ইংরেজ চিকিৎসকের দিকে

১৫ ॥ নীহাররঞ্জন রায়, 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা', (১৩৬৯), পৃ. ৪১৬।

কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এমন কথা আমরা জানতে পারি। গোরার এই তাকানোটা হয়তো মনস্তাত্ত্বিক কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজ-বিদ্বেষী গোরা যে ইংরেজের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে সে কোন ইংরেজ? সে ইংরেজ 'বড় ইংরেজ' কারণ এ চিকিৎসক, কুশাসক 'ছোট ইংরেজ' নয়।

উপন্যাসের একেবারে শেষে গোরা লছমিয়ার হাতের জল খেয়ে নিজের সংস্কার-মুক্তির কথা কাজে ঘোষণা করে। এই কাজটি কিন্তু বিনয় উপন্যাসের একেবারে শুরুতে করেছে অতি সহজে, কোনো রকম হৈচৈ না করে এবং স্বাভাবিকভাবে (১৪৭)। 'নবলব্ধ অনুভূতির প্রবল উৎসাহের বেগ' নিয়ে গোরা বলেছে, "আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে" (৫৬৯)। কিন্তু গোরার এই মানসিক ইচ্ছা পূরণের পেছনে যতটা আবেগ আছে ততটা যুক্তি নেই।

'গোরা' সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক বুর্জোয়া লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস। সেখানেই এর সার্থকতার উৎস। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ বুর্জোয়া উপনিবেশের বুর্জোয়া। গোরার আত্মানুসন্ধান তাই এক জায়গায় থেমে যেতে বাধ্য। কারণ সে পরাধীন দেশের বুর্জোয়া। দেশের মঙ্গল সাধনার সদিচ্ছাও তার সীমিত হতে বাধ্য। নগণ্য চরঘোষপুর বিশাল ভারতবর্ষের আত্মানুসন্ধানের অংশ হয়ে উঠেছে, এটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। কিন্তু ঐ চরঘোষপুরের হতভাগ্য লাঞ্ছিতদের মুক্তি ঔপনিবেশের রাজনীতিতে উদাসীন বুর্জোয়া গোরা সমস্ত উদারতা দিয়েও এনে দিতে পারে না এটাও চরম সত্য। কারণ দেখা গেছে যে, চরঘোষপুরে গোরা ছিল বহিরাগত, পর্যটক। যেই মুহূর্তে গোরা ঐ এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইল, সেই মুহূর্তে তাকে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হল। চরঘোষপুরের মঙ্গল করতে হলে তাকে পুনরায় ঐ একই সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হবে।

গোরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবে না এটা স্পষ্ট। গোরার সমাজ স্থবির এবং ক্ষুদ্র। বৃহৎ ব্যক্তিত্ব এখানে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। যে কারণে পরেশবাবু সমাজ বিচ্ছিন্ন। গোরার কাহিনীকে যদি রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে নিয়ে যেতেন তবে তার বিচ্ছিন্নতার ছবি দেখাতে বাধ্য হতেন। যে কারণে পরবর্তী উপন্যাসে নিখিলেশ, বিপ্রদাস, অমিত সবাই সমাজ-বিচ্ছিন্ন। সে সত্যটাই এখানে ধরা পড়ে যে, গোরা আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি হয়নি। সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গোরা কোনো ভূমিকা পালন করে না এবং এমন কি গোরার কার্যক্রম সমাজকে নাড়াও দেয় না। সমাজে ব্যক্তির ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ যত বড় করে দেখিয়েছেন আসলে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা তত বড় নয়। 'গোরার উত্তরণ আসলে বুর্জোয়া উত্তরণের প্রক্রিয়া। তাহলে গোরার পরিণতি কোথায়? গোরা কি তবে পরেশবাবুরই নবীন সংস্করণ? পরেশবাবুর বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করে যে,

ভারতবর্ষের বৃহৎ সমাজ পরিবর্তনে তাদের আর কোনো ভূমিকা থাকবে না।

পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-র নায়ক নিখিলেশ গোরার তুলনায় নিষ্প্রভ। গোরার স্বপ্রতিভ চিন্তাধারা, আদর্শকে রূপ দেবার আকুলতা তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। অথচ নিখিলেশ তার আদর্শের ভারবাহী, হাঁটা-ফেরায় মন্থর, গোরার তুলনায় ক্ষীণকায়ও বটে। 'গোরা'র দেশপ্রেম বাংলাদেশের সীমা উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেছে। এর সমস্যা সমগ্র ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষকে ঐভাবে ধর্ম-উত্তীর্ণ গভীর সহানুভূতিতে, প্রীতিতে, ঐক্য পাবার সাধানার সঙ্কেত রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে দিয়েছিলেন। অবশ্য সে বোধ সম্পূর্ণ তাঁরই।

স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার কথা আমরা জানি। তিনিও সে সময়ে বাঙালী ছিলেন তবে স্বতন্ত্র প্রকারের। স্বদেশীর তেজ যখন কটু হয়ে উঠল তখন শুধু সরেই দাঁড়ালেন না---সমালোচনাও করলেন। এই আন্দোলনের সঙ্কীর্ণতা দেখে নতুন চিন্তা, প্রাগ্রসর মত তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। সংস্কার-মুক্ত মনে সমগ্র ভারতবর্ষকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করলেন। সমস্যা সমাধানের চেষ্টার শেষে এই সত্যে পৌঁছালেন যে, ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র, বিচ্ছিন্ন নানা জাতির ও ধর্মের সেবা সে-ই করতে পারবে যার হৃদয় ভারতবর্ষের মতোই সমস্ত বিরোধ বিচ্ছিন্নতাকে অন্তরের ঐক্যে বেঁধে রাখতে পারবে। এর জন্যে দরকার সংস্কার আন্দোলনের। সংস্কারকের কোনো সংস্কার থাকবে না। গোরার জাতিচ্যুত হওয়ার কারণ, বিশেষ তাৎপর্য ও সবিশেষ সার্থকতা বোধকরি এখানেই, এই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কার মুক্তিতে। বিজাতীয় জন্মের জন্যেই গোরার আচার-আচরণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

উপন্যাস রূপে 'গোরা' নিঃসন্দেহে 'আনন্দমঠ'-এর তুলনায় শিল্পকর্ম ও বক্তব্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সত্যানন্দ আনন্দমঠের সন্তানদের সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং সাংগঠনিক দেশভক্তি শিখিয়েছিল। 'আনন্দমঠ'-এর দেশভক্তি আক্রমণাত্মক এবং ধর্মীয় আবেদনময়। পক্ষান্তরে গোরা বলছে দেশকে ঘিরে তার একক উদাত্ত, সংস্কারমূলক, সেবাপরায়ণ আত্মিক অনুভূতির কথা। গোরা ভারত-বাসীকে নিজের ধর্মের গোঁড়ামীমুক্ত উদার উপলব্ধির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু 'আনন্দমঠ' পেরেছিল সাম্প্রদায়িক, আক্রমণাত্মক হিন্দু জাতীয়তা-বোধে জাতিকে টেনে নিতে। 'আনন্দমঠ'-এর এই অসাধারণ উদ্দীপনশক্তি মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীর মানসিকতার দর্পণ। 'আনন্দমঠ'-এর দেশমূর্তিস্বরূপা দেবী, যার প্রতিষ্ঠাকল্পে সন্তানেরা দলে দলে প্রাণ বিসর্জন দিল, সে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার মূলে সক্রিয় ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্তের নিজ শ্রেণীর যশমান, ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা-কামনা। 'গোরা'র নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম স্বভাবতই তাদের কাম্য হবার কথা নয়।

অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঐ এক কথাই বলেছেন, "মহাত্মাজি সংগঠনমূলক কর্মের মধ্যে দেশকে উদ্বুদ্ধ করুন —আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিব, আমার দেশবাসীর সহিত আমাকে সেবার দ্বারা সহযোগ করিতে বলুন। কিন্তু, I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, ১৩৫৩, পৃ. ৬৫)।

আলোতে-অন্ধকারে অবগাচ্ছন্ন 'আনন্দমঠ'-এর তীব্র আক্রমণাত্মক সামন্ততান্ত্রিক হিন্দুজাতীয়তাবাদী রাজনীতির পাশে 'গোরা'র উদারচিত্ত সর্বমানবীয় উজ্জ্বল বুর্জোয়া কল্যাণবোধটির পার্থক্য সময়ের দিক থেকে যতটা নয় চরিত্রের দিক থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী। দু'টি উপন্যাসের মধ্যে রচনাকালের সময়ের দিক থেকে দূরত্ব ত্রিশ বছরের কম, কিন্তু দু'টি উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ সময় দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যে যুগে 'গোরা' লেখা হয় সেই যুগের মধ্যেও অস্থিরতা ছিল, ছিল আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি। উপন্যাসের প্রথম দিকে যে গোরার দেখা পাই তার মধ্যে সেই অস্থিরতা ও আক্রমণের প্রকাশ দেখা যায় কিন্তু উপন্যাসের শেষে যে গোরাকে দেখি, সে ঝড়ের বেগে কথা বলে বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে যে প্রসারিত শান্তি এসেছে তা ঝড়ের পরের প্রকৃতির মতো। গোরার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগকে ধারণ করে সেই যুগকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু এই অতিক্রমণ তাঁর সমাজের নয় শুধু তাঁর নিজের। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ এখানে সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন সংগঠিত আন্দোলনের ওপর বিশ্বাস রেখে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশের একতার কথা বলেও ব্যক্তির একক সাধনায় আস্থা রাখেন এবং ব্যক্তির ওপর এই আস্থার কারণে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করেছেন, যদিও রবীন্দ্র-কল্পিত ব্যক্তি সমসাময়িক সমাজে সুলভ ছিল না, দুর্লভই ছিল। সেই ব্যক্তিকে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে যতটা দেখেছেন, সমাজের মধ্যে ততটা পাবার কথা নয়।

'ঘরে-বাইরে' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে, নোবেল প্রাইজ পাওয়া রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির শিখরে। উপন্যাস রচনাকালে এ দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিজাত যে আন্তর সত্যের দীপ্তি দেখি তা এতদিনে অনেকটা ধূসর হয়ে এসেছে। গোরার মতো সবল, সরল, অমল চরিত্রের জন্য যে মাটি, পরিবেশ, যুগ দরকার তাকে আর চারপাশে পাচ্ছেন না কোথাও, এমন কি মনের মধ্যেও নয়। পুরনো মূল্যবোধগুলি একে একে ধ্বংস হচ্ছে দেখে তিনি বিচলিত। 'গোরা'-র পরবর্তী উপন্যাসগুলির

চরিত্রে এসে পড়েছে সেই জটিলতার ছাপ।[১৬] নিখিলেশ গোরার মতো উদার-নৈতিক, কিন্তু প্রাণ ও শক্তি উভয় দিক থেকেই সে ক্ষীণকায়। নিখিলেশ যখন 'ভারতবর্ষ'কে (১১৮)[১৭] নিয়ে ভাবতে বসে তখন তা প্রায়ই 'বাংলা'র (১৪৮-৪৯) ধারণার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। 'গোরা'র পারিবারিক চিত্রের অনেকাংশই ধর্মীয় সংস্কার এবং অদ্ভুত সংঘাত দখল করে রয়েছে। 'ঘরে-বাইরে' কেবলমাত্র একটি নেপথ্যবাসিনী চরিত্র ধর্মীয় আচারপালনের দায় বহন করেছে। সে হচ্ছে নিখিলেশের বড় বৌদি। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে ধর্মীয় সংস্কারের স্থানে এসেছে স্বদেশী-সংস্কার, বাধ্যতামূলক দেশপ্রেমের পালনীয় দায়। 'আমার পথ আর সরল নেই' (২১৫) —নিখিলেশ তার যুগোচিত কথাই বলেছে। গোরা যেমন পেয়েছিল, তেমন মনের মতো স্থান ও পাত্রপাত্রী না পেয়ে এবং সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার দরুণ নিষ্ক্রিয় নিখিলেশ গৃহবাসী প্রণয়ী।

অপরপক্ষে সন্দীপের উদ্যম আছে, কাজও রয়েছে। তাই সে জীবন্ত, বেগবান। সন্দীপ তার কর্মের ক্ষেত্রে যে রকম আবেগ ও উচ্ছ্বাস দেখিয়েছে, সে রকমের আবেগ-উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন স্বদেশীর কালটাতে। সপ্রতিভ এবং কর্মী সন্দীপকে দুর্বৃত্ত চরিত্র মনে করার জন্য দায়ী তার লোভ ও

১৬॥ কবি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ, মঙ্গলবোধ ও আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব। কাব্যজগতে তাঁকে বাস্তব জীবনের জটিলতা এসে আক্রান্ত করতে পারেনি তেমন করে। কারণ কাব্যজগৎ ভাববাদী ও ব্যক্তিগত। কবিতার জগৎকে তিনি গদ্যের বাস্তবতা থেকে দূরে রাখতে পেরেছেন (দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন)। নিজ অন্তরের ঐশ্বর্যে দৈনন্দিন দৈন্য গ্লানির ঊর্ধ্বে উঠে অবলীলায় তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি: করেছেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর কাব্যজগতের অনুভূতি ১৯১০-এর 'গোরা'র মূল্যবোধের সমতুল্য—

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

—'পত্রপুট', পনের সংখ্যক কবিতা, র. র. বিংশ খণ্ড, পৃ. ৪৮।

১৭॥ 'ঘরে-বাইরে', র. র. অষ্টম খণ্ড।

প্রবৃত্তির চিত্র। হীন প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েই সে বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী এবং দরিদ্র প্রজার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনে যখন উদ্দীপনার স্থানে উন্মাদনা যুক্ত হল তখন তার মূলে লোভ রিপুরই প্রবলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। নিখিলেশের মানী সংসারে ঐ স্বদেশীর ঢেউ কিভাবে প্রবেশ করল, তার পরিণতি কি দাঁড়াল সে বিষয়টাই হচ্ছে উপন্যাসের উপজীব্য। পরিবেশ প্রতিবেশে রাজনীতির উদ্দাম হাওয়া নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত নিখিলেশের সুরক্ষিত রাজবাড়ির মধ্যেও ঢুকে পড়ে। নিখিলেশের ভদ্রতার শিথিল পথে সন্দীপ গৃহদাহে প্রবৃত্ত হল। সন্দীপ বিমলাকে —যে ছিল ঘরের প্রদীপ, তাকে দেওয়ালি উৎসবে বাইরে টেনে আনার উদ্‌যোগ করতে শুরু করল এবং বিমলার স্বভাবটা হচ্ছে 'উৎকটের উপরে ওব অন্তরের ভালোবাসা' (৪৫) —এ যেন বিমলার কালেরই বাংলাদেশ। বিমলার মতোই জীবনের দীনতা, কর্মহীন আর আলস্যের একঘেয়েমিতে বাংলা তখন ঝিমাচ্ছিল। নিখিলেশের ভাষায়, "আজ বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ বাট জুড়ে গোরুটার মতো চোখ বুঝে পড়ে আছে— কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে ব্যাধিতে, উপবাসে" (২৪৪)। বিমলা নিজের আত্মকথায় লিখেছে, "সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারিনে। —কত যুগযুগান্তরের ছাই রসাতলে পড়েছিল·· কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না,· সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল·" (২২৫)। তাই এই জড়তার তন্দ্রা থেকে স্বদেশী ডাকে, সন্ত্রাসের পথে জেগে ওঠা তরুণ প্রাণের আবেগে ছুটে গিয়েছিল। স্বদেশী, সন্ত্রাস নিখিলেশের সংসারে সন্দীপের মতো অতিথি। তিথি না-মানা আগন্তুক এরা। নিখিলেশের ছক-বাঁধা 'আব্রু' দেওয়া সংসারে খোলা উদ্দামতা শোভা পায় না। বিমলাও সে কথা জানে। কিন্তু তবু সে মনে প্রাণে সন্দীপকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে। সন্দীপ বিমলার সঙ্গে বিদেশী এমন সব উগ্র বই আর আর্ট নিয়ে আলোচনা করে বসে বসে যা বিমলাকে শোনা-না-শোনার দোটানায় ফেলে দিয়েছিল, লজ্জাও লাগে বাসনাও জাগে এমন অবস্থা তার মনের। সন্দীপের মধ্যে বেআব্রুতা ছিল, ভাবে ভাষায় উভয়েরই। —এমন আব্রুর অভাব ছিল স্বদেশী প্রচার এবং স্বদেশী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও। কিন্তু যে সন্দীপ বেআব্রু তার মধ্যেও সঙ্কোচ আছে এক প্রকারের, যে জন্য আত্মকথনে সে নিজেই নিজের কাছে সম্পূর্ণ রূপে উন্মোচিত হয়নি। তার নিজের মধ্যে প্রবৃত্তির যে গোপন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্রোত প্রবহমান, সেই স্রোতকে সে দেখতে চায়নি সবটা। অশুভকে রবীন্দ্রনাথ চিনে নিতে চাননি তার সম্পূর্ণ পরিচয়ে। রাজনীতির উগ্রতার মধ্যে যে অশুভকে তিনি দেখেছেন, বা আছে বলে জেনেছেন তাকেও উন্মোচিত করে দেখে নেননি কল্যাণে বিশ্বাসী কবি। ফলে তাঁর কল্যাণবোধ এমন অবকাশ পায়নি যে, অশুভকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে পরাভূত করে আপন শক্তিকে বিকাশিত করবে।

বঙ্গচ্ছেদকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মনে যে দেশপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল তার সঙ্গে নিখিলেশের বিচ্ছেদ। তার সঙ্গী হচ্ছে চন্দ্রনাথ মাস্টারমশায়। বাকি সবাই 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। চন্দ্রনাথবাবু বলেছে "পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছটফট করেনি, তারা কাজ করেছে" (১৯০)। স্বদেশী কর্মীদের অকাজে তৎপর দেখে চন্দ্রনাথমাস্টার এমন উক্তি করেছে। চন্দ্রনাথমাস্টারের কাজ হচ্ছে সাধ্যানুসারে ব্যক্তিগত উদ্যমে দুর্গতদের সেবা করা। রবীন্দ্রনাথ, নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথমাস্টারের সমালোচনার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের তিনটি সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন। এই সীমানা ও দুর্বলতাগুলি হচ্ছে —উগ্র শক্তির প্রয়োগ, বর্জনবাদিতা এবং সাম্প্রদায়িকতা। অর্থাৎ আন্দোলনের তিনি নেতিবাচক দোষগুলি দেখেছেন। এ বিষয়ে অন্যত্র প্রবন্ধেও তিনি বারবার সতর্কবাণী প্রচার করেছেন। যেমন, "ক্রোধের তৃপ্তি সাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ, আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে।" ('সত্যের আহ্বান', 'কালান্তর', র. র. চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৩২৪)।

স্বদেশী কাজের ক্ষেত্রে আছে 'উভচর' সন্দীপ, যার কাজ ঘরে-বাইরে দু'জায়গাতেই উত্তেজনা সৃষ্টি করা। সঙ্গে রয়েছে তার অনুচরবৃন্দ, নিখিলেশের জমিদারী এলাকার গ্রামের ছেলেরা। বিমলা ঐ ছেলেদের মতোই তেজে, জীবনীশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। অপরপক্ষে যে বাংলা নিখিলেশের নিজের ভাষায়, 'ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে চোখ বুঁজে' 'গোরু'র মতো বসে আছে তার জড়ত্বে সে ব্যথিত হয়েছে। নিখিলেশ প্রতিকারেচ্ছায় ভেবেছে যে, "যেখানে আমার কাজ সেখানেই আমার উদ্ধার" (২৪৫)। নিখিলেশ আন্দোলনের আগে থেকেই কাজ করেছে। অবৈতনিক স্কুল[১৮] দেশীয় শিল্পোদ্যম, তাঁতের স্কুল, দেশের কাজে টাকা খরচ করাতে তার নিশ্চল, নিরুত্তাপ কর্মী জীবনের কথাই ফুটে ওঠে। কিন্তু এতেও নিখিলেশকে আদৌ কর্মঠ মনে হয় না। জনসাধারণের প্রতিও সন্দীপ, বিমলা ও নিখিলেশ ভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করে। নিখিলেশের ধারণা হচ্ছে যে, "... ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই

১৮॥ রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে ব্যক্তিগত উদ্যমে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে লোকসাধারণের শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি বিশেষের উদ্যমে "দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে" বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। —'কালান্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।

ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি যে, আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে" (২২৩)। বিমলা গরিবের ঘর থেকে এলেও জনসাধারণের মানসিকতা সম্বন্ধে তার মত হচ্ছে, "...যারা নীচের শ্রেণীর তাদের সুখদুঃখ ভালোমন্দের মাপকাঠি চিরকালের জন্যেই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়" (২২২)। আর সন্দীপ হচ্ছে 'জনসাধারণের মনোহরণ ব্যবসায়ী', "লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে। তার লক্ষ্য সে জানে না, শুধু আমিই জানি" (২১৪)। সন্দীপ তার মনোভাব আরও স্পষ্টতর করেছে এভাবে, "পৃথিবীতে একদল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি, তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক" (৫৬)।

বোঝা যায়, তিনজনের এই তিন রকমের বক্তব্যের মধ্যে নিখিলেশের বক্তব্যই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিকটের, কেন না অনুরূপ মন্তব্য তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে তিনি প্রায় সব সময়েই করেছেন। বিমলা ও সন্দীপ উভয়ের মধ্যে যে একটা গ্লানি আছে তা দুঃখী মানুষের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন আরও বড় করে প্রকাশ পেয়েছে তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে। বিমলা ও সন্দীপ মানসিকভাবে দরিদ্র। নিখিলেশে দারিদ্র্য নেই। কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ সেটা স্পষ্ট করে বলেননি। এ ব্যাপারটা স্বীকার করেছেন কিনা বোঝা যায় না। বিমলা ও সন্দীপ উভয়েই দরিদ্র পরিবেশ থেকে এসেছে। এই পরিবেশের দারিদ্র্য উত্তর জীবনেও তাদের মানসিকতার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। অর্থনীতির শক্তি যে এভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে তা হয়তো তাঁর অজান্তেই ঘটেছে। কিন্তু এমন মানসিকতা যে ফুটে উঠেছে তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মাহাত্ম্যকে মহত্তর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি নিখিলেশের দিকে। নিখিলেশ শুধু একজন চরিত্র নয়, সে-ই রবীন্দ্রনাথের মুখপাত্র। ইতিপূর্বে গোরাও তাঁর মুখপাত্র হয়েছিল। এই সমর্থনের ফলে সন্দীপের চরিত্র-চিত্রণ স্বভাবতই ব্যাহত হয়েছে —শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা তার ফলে রক্ষিত হয়নি। সন্দীপকে চিনে নিতে পারি এই উপন্যাসে তার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দেই। যেমন, 'লালসা' 'স্থূলতা' 'মাংসবহুল আসক্তি' 'মাংসাশী জীব' 'রক্তমাংসের মলাটে মোড়া' 'স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে ঢাকা' 'বস্তুর হাট' 'ফাঁকি' 'ছুতো' 'খাদে মিশিয়ে গড়া' 'দাঁত আছে, নখ আছে' 'লুট' 'রক্ত' 'ছলে বলে বাধা' 'ভরপুর ইচ্ছা' 'চটকাব' 'দলব' 'কামী' 'অজগর' 'সাপুড়ে' 'অপদেবতা' 'দানব' 'জাদুকর' 'ভেলকি' 'কুহক' 'নাগপাশ' 'মরণের মূর্তি' 'মহামারীর দূত' 'শিবমন্ত্র' 'নর্দমার ঘোলাজল' 'প্রেত' ইত্যাদি। অবশেষে সন্দীপের মধ্যে একটা সঙ্কোচ এবং 'কিন্তু' দিয়ে তার মধ্যে কিছুটা

বিবেকের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তখনই তাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। ত্রিভুজ পরিকল্পনায় নায়ক দু'জনের একজন অতিমানব অপরজন অমানুষ। সন্দীপকে বিমলা শেষে ভেবেছিল 'যাত্রা দলের রাজা'। কিন্তু সন্দীপের বিবেকের স্পর্শমাখা শেষের পরিচয়ে সে বিমলার কাছে এভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে —'যাত্রাদলের পোশাকের মধ্যেও এক এক সময় রাজা লুকিয়ে থেকে যায়'। আর আমরা এই স্বদেশীযাত্রাব বিবেকটিকে চিনে নিতে পারি নির্ভুলভাবে —সে হচ্ছে 'সত্যপ্রিয়' নিখিলেশ। বিদ্বেষহীন কল্যাণধর্ম নিখিলেশের। জাতীয় আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে উন্মত্ত স্রোতের খরতায় স্থিরবুদ্ধি নির্বিকার নিখিলেশকে রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করাতে চেয়েছেন যেন ঝোড়ো সমুদ্রের মধ্যে অচঞ্চল বাতিঘরটির মতো।

গোরাকে আমরা এমন ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখেছি যে একে একে তার সামান্তবাদী ধারাগুলি থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। গোরার যুগ উনিশ শতকের শেষাংশ। যখন এই উপনিবেশে উন্নততর পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রভাবে প্রাচীন সামন্তবাদের ভেতর থেকে একটা বুর্জোয়া মানবতাবোধ আপন উন্মেষের পথ খুঁজছিল। শিক্ষিত বাঙালীর মনে আশা সঞ্চারিত হচ্ছিল, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বোধ বিকাশে আগ্রহ ও আত্মপরিচয়ানুসন্ধানের কৌতূহল, উদারনীতিতেও এক ধরনের ইহলৌকিকতার উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। গোরা এই আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতীক। সে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে সব সময়। নিজের জন্ম পরিচয়ও তাকে কোনো গণ্ডীর মধ্যে না নিয়ে গিয়ে একটা বৃহৎ জগতের মধ্যে মুক্তির চেতনা এনে দিল। অপরাধ-চেতনা না এনে মুক্তির বোধ নিয়ে এল।

গোরার পরে দ্বিতীয় গোরা সৃষ্টি হয়নি। রবীন্দ্রনাথও পারেননি আর অমন একটি ব্যক্তি সৃষ্টি করতে, অন্যান্য উপন্যাসিকরাও নয়। এর কারণ হচ্ছে গোরা বুর্জোয়া বিকাশের যে আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি সে বিকাশ পরাধীন দেশে সম্ভব নয়। পরাধীন দেশের বুর্জোয়া সাধারণত দু'রকমের। হয় সে হবে 'যোগাযোগ'-এর (১৩৩৬) মধুসূদনের মতো, নয় সে 'শেষের কবিতা'র (১৩৩৬) অমিতের মতো। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। কারণ সে বুর্জোয়া হলেও সামন্তবাদের থেকে মুক্ত নয়। তদুপরি তার জীবনযাত্রা ও রুচি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও খাপছাড়া। অন্যদিকে অমিত রায় যে ধরনের বুর্জোয়া তার মধ্যে রুচি ও শৃঙ্খলা রয়েছে, বোহেমিয়ানতাও আছে কিন্তু কোনো গভীরতা নেই। সে জীবন ছেলেখেলা। তাহলে বোঝা গেল রাজনৈতিক পরাধীনতা যে স্বাধীন বুর্জোয়া চেতনার স্বাধীন বিকাশকে অসম্ভব করে তোলে মধুসূদন ও অমিত ভিন্নভিন্ন ভাবে দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে, সে সত্যকে উন্মোচিত করল। মধুসূদন ইংরেজের বিরোধিতা করে না, ইংরেজের আশ্রয়ে দালালী করে পয়সা করে। একদিকে সে ইংরেজের সঙ্গে তিসির ব্যবসা করে অন্যদিকে

অফিসে ইংরেজ কর্মচারী রাখে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে স্বাধীন নয় অন্যদিকে ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা সামন্তবাদী নিগড় ভেঙ্গে একটা বুর্জোয়া সভ্যত সৃষ্টি করতে পেরেছিল, সেটা সম্ভব হয়েছিল তাদের জাতীয় স্বাধীনতার কারণে পরাধীন ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেনি সামন্তবাদী মূল্যবোধকে মানসিক সঙ্গী রূপে নিয়ে রাজনৈতিক প্রভু ইংরেজে সঙ্গে সমঝোতা ও তোষামোদের সম্পর্ক গড়ে তুলে একটা ব্যবসায়ী স্বাচ্ছন্দ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এই বুর্জোয়া ব্যবসায়ী, শিল্পপতি নয়। মধুসূদন একদিকে ইংরেজের অধীন, অন্যদিকে সামন্তবাদের। সে যে সামন্তবাদী তার পরিচয় ে বিয়ে করতে চায় তার পুরুষানুক্রমিক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার কন্যাকে। অর্থা তার চেতনা পেছনে তাকিয়ে ছিল, সামনের দিকে নয়। সে বিয়ের জন্য নিজে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কন্যা খোঁজার কথা ভাবে না। এই মানসিকতা রাজনৈতিক পরাধীনতারই সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি।[১৯]

অপরপক্ষে অমিতও ইংরেজভক্ত। সে ব্যারিস্টার। সে নিজের নামকে করেছে অমিট এবং রে। লিসি, সিসি, কেটিরা এ সত্য তুলে ধরেছে ে তারা ইংরেজের অনুকারক। অর্থাৎ এখানেও, যদিও ভিন্নভাবে, মধুসূদনে বিপরীতে, সেই একই সত্য প্রতিভাত। সত্যটা হচ্ছে এই যে, পরাধীন দেশে বুর্জোয়াদের স্বাধীন বিকাশের পথ অবরুদ্ধ। মধুসূদন ও অমিত পরস্পর পরস্পরকে চিনবে না। দেখা হলে একজন আর একজনকে দেখে ঘৃণা করবে এড়িয়ে চলতে চাইবে। রবীন্দ্রনাথও এদের একজনের প্রতি বিরূপ অন্যজনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু এই দুই চরিত্র একই রাজনৈতিক বাস্তবতার দুটি ভিন্ন প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই দুই উপন্যাসে রাজনীতিকে আনেননি। কিন্তু যেহেতু অত্যন্ত বড় শিল্পী তিনি সে জন্য তাঁর শিল্প ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত একটা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন যে কোনো অবস্থাতেই রাজনীতি বহির্ভূত নয়, বরং অনিবার্যভাবে রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি অরাজনৈতিক উপন্যাস সেই সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব উভয় উপন্যাসেই বর্তমান।

'যোগাযোগ' ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জমিদারের দ্বন্দ্ব। উভয়েই বিত্তশালী —তবে একজন উঠতি আর একজন পড়তি। এখানে সাম্রাজ্যবাদী কর্মতৎপরতা বর্তমান। সাম্রাজ্যবাদ এককালে জমিদারকে সহযোগী করে নিয়েছিল, পরে নিয়েছে ব্যবসায়ীদের। রবীন্দ্রনাথের নিজের সহানুভূতি জমিদারদের দিকে।

সে কারণে যে মধুসূদন কর্মী, আপন হাতে নিজের ভাগ্য গড়তে চায় তাকে তিনি বিশেষভাবে অনাকর্ষণী রূপে চিহ্নিত করেছেন। আর যে বিপ্রদাস কোনো কাজ করে না, শুধু বই পড়ে, গানবাজনা করে এবং প্রায়ই অসুস্থ থাকে তাকে তিনি আদর্শ পুরুষ হিসাবে এঁকেছেন। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একজন বড় শিল্পী সে জন্য তিনি বিপ্রদাসের পরাজয় দেখালেন মধুসূদনের কাছে। এটা ব্যক্তির কাছে পরাজয় শুধু নয়, এটা একটা উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছে একটা পড়তি জমিদার শ্রেণীর পরাজয়। সে জন্যই বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় উঠতি ধনিক শ্রেণীর কল্পলোকচারী নাগরিক প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতাকে সহৃদয়তার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। যেহেতু তিনি অসামান্য প্রতিভাধর সে জন্য নিজের অজান্তেই তিনি লাবণ্য ও অমিতের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অবস্থানের দূরত্ব তুলে ধরেছেন। কেটি মিত্র উপলক্ষ মাত্র। অবশ্য তিনি সর্বদাই ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ একটা সমন্বয়ের পথে মিটিয়েছেন ব্যক্তির নিজের মধ্যেই একটা অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান দিয়ে। লাবণ্য অমিতের সঙ্গে তার নিজের দূরত্বটা প্রথমে দেখেছিল অনেকটা ভাবাবেগের বশে, "যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করিনে, আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। —কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওর নিজের সৃষ্টি নয়।"[২০] এরপর বাসস্থান বদল করে অমিত যখন হোটেলে যেতে বাধ্য হচ্ছে তখন লাবণ্যের অভিজ্ঞান জন্মাল, "...এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসেনি যে, অমিতের যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে...। যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলেছিল সেটা কোনদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না"। (শেষের কবিতা ৩৪৪-৪৫)। তারপরই লাবণ্য নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল।

এটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার গোরা সৃষ্টি করতে পারেননি। তার কারণ হল এই, রবীন্দ্রনাথ বড় শিল্পী হিসাবেই জানতেন বুর্জোয়া বিকাশের যে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা গোরার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল সে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার বিকাশ গোরা-র বিকাশের পরবর্তী স্তরে পৌছানো সম্ভবপর নয়। ঐ বিকাশের সীমা গোরা পর্যন্তই। আর বিকাশ যখন অসম্ভব হয় তখন যে স্তব্ধতা সৃষ্টি হয় সে স্তব্ধতা জন্ম দেয় নিস্পৃহতা ও হতাশার। নিখিলেশ এই নিস্পৃহতা ও হতাশার প্রতিনিধি। তার সামাজিক বাস্তবতা এখানেই। পরাধীন দেশের জমিদার সে। বুর্জোয়া বিকাশের প্রতি

২০॥ 'শেষের কবিতা', র. র. দশম খণ্ড, পৃ. ৩১৮-১৯

তার একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তেমন আকাঙ্ক্ষার বলেই সে স্বদেশী ব্যবসায়ে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু পরাধীন দেশে স্বাধীনভাবে যে ব্যবসা চলতে পারে না সে কথা অন্য কেউ মানুক না-মানুক দেশের অর্থনীতি মানে। ব্যবসায়ে তার সফলতা আসতে পারত যদি সে মধুসূদনের মতো ব্যবসায়ী ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার পথে যেত। কিন্তু মধুসূদনের ও নিখিলেশের পথ আলাদা। নিখিলেশকে বাধা দেয় তার রুচি, আরও বাধা দেয় তার স্বাদেশিকতার চেতনা। অন্যদিকে সে আবার ইংরেজের সাংস্কৃতিক প্রভাবটাকে আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। বিদেশী বইপত্র পড়ে, স্ত্রীকে আধুনিকা করতে চায়। কিন্তু সে 'কলোনি'র আধুনিক, ব্যারিস্টার নয়, জমিদার। সে জন্য সে অমিতের মতো পুরো শহুরেও হতে পারে না আবার নিজের গ্রামের সঙ্গেও মিশতে পারে না। সে না ঘরের না বাইরের। তাহলে বোঝা যাচ্ছে নিখিলেশের ঘর পরাধীন ভারতবর্ষেরই একটা প্রতিচ্ছবি। এই পরাধীন ভারতকে ইংরেজ উপকৃত করেছে উন্নততর সভ্যতার পরিচয় দিয়ে। এ ভারত সে-ভারত যে জানতে ইচ্ছুক নয় সে অর্থনীতির শিকলে সে সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্দী ও নিষ্পিষ্ট, যে খুঁজে পায় না তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে মুক্তির একটা পথ আছে বলে মনে করা হয়েছিল। সে পথটা হচ্ছে বিদেশী বর্জনের, বয়কটের ও গণ-আন্দোলনের পথ। রবীন্দ্রনাথ এই পথের দুর্বলতাটা জানতেন। শহরে এই আন্দোলন আংশিক সফল হয়েছিল। কিন্তু গ্রামে পরিপূর্ণ রূপেই ব্যর্থ। সন্দীপ যেন স্বদেশী আন্দোলনের গ্রামীণ ব্যর্থতার প্রতীক। শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহানুভূতি দিয়ে একে সত্য বলে জেনে নিয়েছিলেন যে, দরিদ্র মানুষ এই আন্দোলনের দ্বারা উপকৃত হবে না। তাদের জন্য এ আন্দোলন নয়। কিন্তু দরিদ্রের মুক্তি কোন পথে আসবে সে সত্য পথের সন্ধানও মনে হয় পাননি। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ভেবেছিলেন যে কৃষকের মুক্তি নিখিলেশের মতো মহৎ ও ইংরেজি শিক্ষিত জমিদারের নেতৃত্বেই সম্ভব, কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মতকে মানেননি। আর সে জন্যেই নিখিলেশ শেষ পর্যন্ত জয়ী নয়, পরাজিত। তিনি এটাও প্রত্যক্ষ করেছেন যে, 'ঘরে-বাইরে'-র পঞ্চুদের মতো দরিদ্র কৃষকদের মুক্তি দাতব্যে সম্ভব নয়। মুক্তি সম্ভব দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিন্যাসে, পরাধীন দেশে যা কখনও সম্ভব নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে সামাজিক বিপ্লবের প্রথম শর্ত সে কথাও তিনি ভেবে দেখেননি। তিনি পরাধীন বাংলাদেশের প্রধানতম সাহিত্যিক। এই পরিচয় তাঁর চিন্তার মধ্যেও উন্মোচিত। এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজের দেশ কাল ও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে নন। আমরা দেখি যে, তিনি দ্বন্দ্ব চান না, তিনি সমন্বয়পন্থী। তিনি ইংরেজের সঙ্গে দেশবাসীর দ্বন্দ্ব শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করেছেন। ইংরেজকে চিনতে তাঁর বহু দেরী

হয়েছিল, কারণ তিনি সমন্বয়ের পথটা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বড় শিল্পী বলেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, দেশী বুর্জোয়ার পক্ষে গোরার মতো ব্যক্তিত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়, আইরিশ বা ইংরেজের পক্ষেই এমনটা হওয়া, গোরার মতো হওয়া সম্ভব। কারণ আমরা গোরার পাশেই গোরার কালের যথার্থ বাঙালী চরিত্র-গুলির পরিচয় পেয়েছি, তারা হচ্ছে বিনয়, মহিম, অবিনাশ, হারানবাবু প্রমুখ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গোরার দ্বন্দ্ব দেখতে গিয়েও দেখালেন না, (চর ঘোষপুরের বৃত্তান্ত স্মরণীয়) সমন্বয়ের পথে গেলেন। সাম্রাজ্যবাদ যে একটা অন্যায় শক্তি সেটা তিনি যেন প্রত্যক্ষ করলেন না, এড়িয়ে গেলেন, অথচ যেটা তিনি দেখেছেন 'মেঘ ও রৌদ্রে'র (১৩০১) শশীভূষণ চরিত্রের মাধ্যমে। কাজেই দেখা যাচ্ছে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বাস্তবতাকে তেমনভাবে স্বীকার করেননি, যেমনভাবে স্বীকার করেছেন সামন্তবাদের বাস্তবতাকে। এখানেও তিনি তাঁর শ্রেণী, দেশ ও কালের প্রতিনিধি।

'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ নেতা নয়, সে ভাবুক কর্মী মাত্র। তার ডাকে দেশ সাড়া দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সমগ্র ভারতবর্ষ সাড়া দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সূচনা হয়ে গেল তাতেই স্বদেশী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটল। শুরু হল স্বদেশীর স্থানে স্বরাজ।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় থেকে সর্বজনমান্য নেতা হলেন গান্ধী। এই নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব একদিন রবীন্দ্রনাথ বাংলার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে দেবার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। সে আশা সেদিন পূর্ণ হয়নি। গান্ধীকে ভারতবর্ষের জাগরণের উদ্যোক্তা রূপে দেখে তিনি অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯১৯ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অহিংস অথচ অতীব শক্তিশালী সংস্থা হয়ে ওঠে। দলীয় শক্তির প্রধান উৎস ছিল সর্বসাধারণের সহযোগ। গান্ধীর প্রখর ব্যক্তিত্বে এবং সন্ন্যাসীতুল্য চরিত্রের প্রভাবে ভারতীয় জনসাধারণ রাষ্ট্রসচেতন হয়ে পড়ে। গান্ধী পরিকল্পিত 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনেব প্রধান অবলম্বন হল 'স্বদেশী' যুগের 'বয়কট' ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহার এবং নতুন একটি পন্থা, আইন অমান্য। সমস্ত আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে অহিংসা, যোগ্যতর অন্য পন্থা না পেয়ে অনেকে এই নীতিকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি ও মানবতাকে দেশের স্বাধীনতার চেয়ে বড় ভাবতেন। অনুরূপভাবে গান্ধী অহিংসাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উপরে স্থান দিলেন। দু'জনেই নীতি-চালিত।

এতকাল রবীন্দ্রনাথ 'পোলিটিক্যাল নেতা'দের দুর্বলতার দিকটির সমালোচনা করেছেন। কেন না, তাদের মধ্যে আত্মত্যাগ নেই এবং দেশের মানুষের ওপর যথার্থ টান দেখা যায়নি। এই উপেক্ষিত সমস্যাটার সমাধানে গান্ধী গুরুত্ব

অর্পণ করেছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছেন, "…তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেন না, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে।"[২১] এই প্রেমের আহ্বানে ভারতবর্ষের জাগরিত হৃদয়ের পটভূমিকায় তিনি ভেবেছিলেন, "ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্ররূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি —প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি।"[২২] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আনন্দের কারণ রূপে দেখি দেশবাসীর চিত্তের সুপ্তি থেকে মুক্তির প্রয়াস। নেতা গান্ধীর মহৎ গুণ তাঁর প্রণামযোগ্য এ কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু দেশের হাওয়ায় আবার তিনি লক্ষ্য করলেন উৎপীড়ন, লোভ, যে উৎপীড়ন ও লোভ তিনি স্বদেশীর কালটাতেও দেখেছিলেন। "মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেন না তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো —শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন, একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।"[২৩] গান্ধীর মতে বিদেশী কাপড অপবিত্র, অতএব, ঐ বিদেশী কাপড় পোড়াবার উৎসব পড়ে গেল। "অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল।"[২৪] গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে সেই 'জোর' 'বয়কট' দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হলেন। সন্দীপকে যা মানায় গান্ধীকে তা মানায় না। 'বয়কট' তাঁর কাছে 'দুর্বলের প্রয়াস নহে ইহা দুর্বলের কলহ'। 'দেশর কাজে রাগারাগিটা কথনোই লক্ষ্য হইতে পারে না'। রবীন্দ্রনাথের চরকা[২৫] বিরাগের

২১ ॥ 'সত্যের আহ্বান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

২২ ॥ ঐ পৃ. ৩২৯।

২৩ ॥ ঐ, পৃ. ৩৩৩।

২৪ ॥ ঐ, পৃ. ৩৩৫।

২৫ ॥ গান্ধী কেমন করে চরকার 'আইডিয়া' পেলেন সে সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ তথ্য পাওয়া গেছে, "গান্ধীজী লিখছেন '১৯০৮ সালে আমি যখন লণ্ডন শহরে তখনই চরখা আবিষ্কার করলাম। …সেখানে ভারতীয় ছাত্র এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর দেশেব সম্বন্ধে অনেক আলাপ হয়। এদের মধ্যে অনেকেই চরমপন্থার কথা ভাবছিলেন। আচম্বিতে এক ঝলকের মধ্যে গান্ধীজীর মনে হলো চরখাই সমাধান।' গান্ধীজী বলছেন, '……আমি কিন্তু তখন চরখা এবং তাঁতের মধ্যে পার্থক্যটা জানতাম না এবং 'হিন্দ-স্বরাজ' পুস্তকে 'চরখা' বোঝাতে 'তাঁত' শব্দ ব্যবহার করেছিলাম।' পরে আরও বলেছেন, 'এমন কি আমি যখন 'হিন্দ-স্বরাজ' পুস্তকে চরখাকে ভারতের বর্তমান

কথা অনেক প্রবন্ধে চিঠিতে পাওয়া যায়। চরকা ছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক। "চরকা কাটা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফল লাভ।"[২৬] জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে উদ্‌বোধিত না করে অন্ধ শক্তিতে পরিণত করা রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেননি। মৃত্যুর তিনমাস আগে পর্যন্ত অসংখ্য প্রবন্ধে তিনি দেশের নানা সমস্যা নিয়ে ভেবে গেছেন। শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। দেশকে ভিতর থেকে, গ্রাম থেকে সংস্কার করতে আবেদন জানিয়েছেন। সবচেয়ে বেশী বলেছেন শিক্ষার কথা। শিক্ষা না পেলে কোনো বাহ্য স্বাধীনতা কাজে লাগবে না। তাঁর মতে শিক্ষিত হলে সমস্যার সমাধান হবে আপনিই। লিখতে পড়তে শিখলেই নিজেকে চিনতে ও ব্যক্ত করতে পারবে জনসাধারণ। দেশের সমস্যা সংক্রান্ত তার প্রবন্ধ, বক্তৃতা, চিঠি পত্রের মূল বক্তব্য ই ছিল শিক্ষা, গঠনকাজ এবং আত্মশক্তি অর্জন বিষয়ে। শিক্ষা ব্যাপারে নিজেই তিনি শান্তিনিকেতনে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবাসী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। ঐ বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ ইংরেজকে অভূতপূর্ব রূপে সাহায্য করে। এই সাহায্যের প্রতিদানে মন্টেগু চেমসফোর্ডের ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন। প্রত্যাশিত শাসন-ক্ষমতার তেমন বিরাট কিছু অংশ পাওয়া গেল না দেখে এই শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতারা তুমুল বিক্ষোভ শুরু করলেন এ সময়ে সন্ত্রাস দমনের সূত্র ধরে অন্য আন্দোলনকেও ধামাচাপা দেবার জন্য ১৯১৯, ১৮ই মার্চ 'রৌলটবিল আইনে পরিণত হয়। প্রতিবাদে গান্ধী শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও হরতাল। ইংরেজ সরকার এর জবাব দিলেন ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডে। ভারতবাসী ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। একমাত্র নির্ভীক রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক চিঠিখানি লেখেন এবং সেই সঙ্গে 'স্যার' খেতাব ত্যাগ করেন। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানের খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হল। ১৯২২ সালে প্রবল অহিংস জন-সংগ্রামের প্রস্তুতি চলতে

দারিদ্র্যের মহৌষধ বলে লিখলাম তখনও আমি তাঁত বা চরখা দেখেছি বলে স্মরণ হয় না। এমন কি যখন ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরলাম তখনও বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও চরখা আমি দেখিনি।"
—সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌, 'লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ', (১৯৭১), পৃ ১১৭। অথচ এর আগেই বাংলাদেশে তাঁতের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং সেটা হয়েছে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে।

২৬॥ 'স্বরাজ সাধন', 'কালান্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

থাকল। কিন্তু চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনায় গান্ধীর আদেশে সমস্ত আন্দোলনের গতি রোধ করা হল। অসহযোগের ব্যর্থতায় বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা গোপনে দেশকে মুক্ত করবার কাজে লাগল। বাংলার বাইরেও সন্ত্রাসের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ১৯২৮-২৯ সালে রাজনৈতিক দলগুলির দলাদলিতে বাংলার রাজনীতির আসর অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে অনেকগুলি পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারা, কর্মধারা ও দল সক্রিয় হয়ে উঠল। কারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী আবার আলস্য ও একঘেয়েমি এবং অর্থনৈতিক উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবার পথ খুঁজছিল। সন্ত্রাসবাদীরা শক্তি সঞ্চয় করে কাজে নেমে পড়ল। দেশে সৃষ্টি হল তুমুল উত্তেজনা। ১৯৩০ সালের জানুয়ারিতে লাহোর কংগ্রেসে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল সমুদ্রতীরে লবণ উৎপন্ন করে স্বয়ং গান্ধী আইন অমান্য করলেন এবং এর কয়েকদিন পরই ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফলে সরকারের দমন নীতির নিষ্ঠুরতায় ভারতবাসী সন্ত্রস্ত হল।

এমন পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যান। "রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্বিষহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বসেছে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম"।[২৭] রাশিয়ায় যেয়ে তাঁর বিস্ময় বাঁধ মানেনি। দেশবাসীকে কোনোমতে লিখতে ও পড়তে শেখানো এবং সাধ্যমতো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর স্বপ্ন। রাশিয়ার শিক্ষার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও উপযোগিতা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে গেছেন। "এখানে শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে —তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়" (রা. চি. ২৭৪)। রাশিয়ায় দেখলেন 'সর্বব্যাপী নির্ধনতার সাম্য। দেখলেন 'ধনগরিমার ইতরতার দৈন্য সে দেশে নেই; এখানকার একমাত্র বাসিন্দা হচ্ছে জনসাধারণ। মহাজনী যুগের রাষ্ট্রশক্তির উন্মত্ততার পাশে পাশেই এ দেশে এসে মানবতার কবি দেখলেন, "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। —আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে" (২৮০) এবং আশ্চর্য হলেন এই ভেবে, "কটা বছরের মধ্যে মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে বিস্মিত করেছে···" (২৮৮) বিস্ময়েরই কথা যে, "এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই" (২৯৬)।

২৭॥ 'রাশিয়ার চিঠি', র. র. বিংশ খণ্ড, পৃ. ৬৬৭।

ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য কিন্তু তিনি ঐ 'কী করে'কে সযত্নে এড়িয়ে উপায় হিসেবে একমাত্র শিক্ষাকেই নির্দিষ্ট করলেন, "আমার মত এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম-বিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য —সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে" —অর্থাৎ রাশিয়ায় গিয়েও তিনি অর্থনীতির মূল সূত্রটি বুঝতে চাননি। তিনি ধনী নির্ধনের 'মাঝখানের দুস্তর পার্থক্য'-এর কথা জানেন। তাই 'বলশেভিক অর্থনীতি' সম্বন্ধে তাঁর মত হচ্ছে, "বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয় ; বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে যেমন বিদুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে এও সেই রকম কাণ্ড। ·· সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ বাষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। ···ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজ রক্ষা করবে কে" (৩৪৭)। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন মন্তব্য করাটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস "ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয় (৩৪৬)। পুরনো ধর্মতন্ত্র আর রাষ্ট্রতন্ত্রকে মূল থেকে উপড়ে দিয়েছে সোভিয়েট বিপ্লবীরা শুধু এটুকুই তাঁকে উল্লেখ করতে দেখা যায়। রাশিয়ায় অমন সাম্য, অমন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্ভবের গোড়ার কথা যে সামাজিক বিপ্লব সে বিষয়ে তিনি ভাবলেন না। তাই তাঁকে বলতে শুনি, "ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে ঘোরে, বিপ্লবীপন্থীরাও আনাগোনা করে, কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্য নয়, কেবল শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার" (৩১৫)।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার অনুপ্রেরণায় শিক্ষা ও সমবায় পন্থায় গ্রামীণ জীবনের উজ্জীবন চেয়েছিলেন। রাশিয়ার এ হেন সাফল্যের পেছনে যে রাষ্ট্র ও সমাজ-বৈপ্লবিক কারণ তা নিয়ে চিন্তা করেননি। কেমন করে ব্যবস্থা সম্ভব হবে এবং কবে হবে বলছেন না। নিয়মানুগতায় বিশ্বাস নেই, বিপ্লবের সম্ভাবনাও ভীতিপ্রদ। ব্যাধির রূপ নির্ণয়ে তিনি নির্ভুল, কিন্তু নিরাকরণের উপায় বলতে ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের আগে বা পরে মার্কসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেননি।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি কেবল উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী রূপেই। দেশের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের বিদেশী ধারণার অনুপ্রবেশ তাঁর ভাল লাগেনি।[২৮] ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের নিজস্ব উপায়ে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর

২৮ ॥ "India is on her path of self-realisation. She can not

বাসনা। পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপযোগিতার দিকটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কারণ তিনি পরাধীনতাকে দেখেছেন আত্মিক দিক দিয়ে। স্বাধীনতার বিচারেও তাই বাস্তবের অর্থনীতি নির্ভার আত্মার মুক্তিই যাঁর সাধনা পরাধীনতা অপনোদনের আলোচনায় তাঁর পক্ষে চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দেওয়াতে অস্বাভাবিকত্ব নেই।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তাবিদ। তাঁর লেখাও যখন তরুণকে পথ দেখাতে পারেনি, তাঁর লেখাও নিখিলেশের কথার মতো উচ্চস্তরের উপদেশের মতোই যখন আপন শুচিতায় মহিমান্বিত ও দূরবর্তী থেকেছে, তখন তরুণকে পথনির্দেশ দিতে প্রবীণের ব্যর্থতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক পথে মুক্তির আর উপায় রইল না। তখন যে হতাশার সৃষ্টি হল সেই হতাশা থেকে জন্ম নিল সন্ত্রাসবাদ। শিষ্ট আন্দোলনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতায় তরুণদল যে পন্থা নিয়েছে তাতে ছিল গোপন জীবনের উত্তেজনা ও রোমান্স। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দেশহিত উদ্যমের উন্মাদনার সমালোচনা করেছেন, 'চার অধ্যায়'-এ পার্টি-চালিত দেশপ্রেমিকদের করেছেন ভর্ৎসনা।

'ঘরে-বাইরে' লিখবার প্রায় উনিশ বছর পর লিখলেন তাঁর সর্বশেষে রাজনৈতিক উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। এর আগে ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'পথের দাবী' গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের পরেই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এই বইটি হয়েছিল অসামান্য জনপ্রিয়। নিবেদিত প্রাণ সন্ত্রাসবাদীদের শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধামিশ্রিত সহানুভূতি দিয়ে চিত্রিত করেছেন। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় যখন 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে ১৩৩৩ বৈশাখ) বের হচ্ছিল তখন সন্ত্রাসবাদীরাও সাগ্রহে সব্যসাচীর গতিবিধি লক্ষ্য করে অনুপ্রেরণা পাচ্ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল বইখানি বাজেয়াপ্ত করবার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করুন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। এ বিষয়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে একটা চিঠি (মাঘ, ১৩৩৩) লেখেন। চিঠিখানির অংশবিশেষ এ রকম, "বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। ...একমাত্র ইংরেজ

---

afford to waste her priceless spiritual and intellectual resources in enforced emulation of ready-made ideals from outside. She must evolve her civilisation unhampered by her dead past or her modern political slavery...". Unity, (Chicago), 30. 1. 1933, quoted in Taraknath Das, op-cit. Appendix, p. (vi).

গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র— তাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর — অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরাজ রাজের কাছে দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান।" বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্র চিঠিখানি পেয়ে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে বর্ণিত 'যথেচ্ছ আচরণের' প্রতিবাদেই বুঝি বা লেখেন 'চার-অধ্যায়' (১৯৩৪)। তিনি প্রথম থেকেই চরমপন্থার ঘোরতর বিরোধী। কারণ তাঁর মতে এ পন্থা বৈধ নয়, ভদ্র নয়, প্রকাশ্যও নয়। এ বই প্রকাশের সময়ে সন্ত্রাস-যুগ চলছে। সন্ত্রাসবাদীরা জনসংযোগে অবিশ্বাসী। কিন্তু জনসাধারণ সন্ত্রাসবাদীদের দেখেছে শ্রদ্ধার চোখে। বৈধ আন্দোলনের নিষ্ফলতায় এবং অন্য কোনো যোগ্য পথের অভাবে দুঃসাহসী তরুণ-তরুণী সন্ত্রাসের রক্তাক্ত পথ বেছে নিয়েছিল। হয়তো তারা ভ্রান্ত, হয়তো তাদের পরিকল্পনায় অবিবেচনা ও পাগলামি কম ছিল না। কিন্তু তাই বলে অহেতুক কালিমা লেপন করে সন্ত্রাসবাদীদের আঁকা ঔচিত্যবোধে কেমন দ্বিধা জাগায়। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য এঁরা যে গোপন ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তার "অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না" (চা. অ. ৩০৭) এমন নিরপেক্ষ বিচারের দিন তখনো হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এঁদের আত্মত্যাগের, আত্মদানের কথা উল্লেখ করেছেন কোনো কোনো প্রবন্ধে। যেমন বলেছেন, "সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয় হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এই জন্য তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।"[২৯] সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে কঠিন সমালোচক রূপে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল। সন্ত্রাসপন্থার বিরোধিতা করবার কারণ স্বরূপ তাঁর এই বক্তব্যটি তুলে ধরা যায়, "বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির

২৯॥ 'সত্যের আহ্বান' প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

আলোক জলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে, আমাদের যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকারে কোণ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে —দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন দৃশ্য দেখা যায় —এই চুরি ডাকাতি গুপ্ত হত্যা?"[৩০]

বিষয়বুদ্ধি উদাসীন ত্যাগী যুবকদের প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এভাবে "দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে যে কেবল চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি, মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই" —এ সত্য তিনি জানতেন, কিন্তু উপন্যাসে একে তিনি দেখাননি। অতিশয় খণ্ডিত এই উপন্যাস। বিভীষিকাপন্থীরাও খণ্ডিত। তাদের পন্থায় হয়তো বিকৃতি আছে। কিন্তু বিকৃতি ও আবিলতাই একমাত্র সত্য নয়। এ পথে এগিয়ে চলার স্রোতও আছে, আছে কঠিন আত্মত্যাগও। যে তরুণ জীবনের নির্মম অপব্যয় এ কাহিনীর বিষয়বস্তু সে হচ্ছে সন্ত্রাসের চাতুরীর ফাঁদে আটকে পড়া কবি অতীন। কাজেই বন্দী ব্যক্তিসত্তার আর্তনাদ এখানে ধ্বনিত হলেও অতীনের চারপাশে বিভীষিকার কারাগারটিকেও ভোলা যায় না।

উপন্যাসটি উপদেশাত্মক। উপন্যাস কাহিনীর মধ্যেই সাধারণত উপদেশ লুকিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই আবার উপদেশকে কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। 'চার অধ্যায়' এ কাহিনীর আগেই উপদেশ অংশের যোজনা ছিল। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ কালে আভাস[৩১] অংশে এক মনীষীর জীবন-

৩০ ॥ 'ছোটো ও বড়ো', 'কালান্তর প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-৮৬।

৩১ ॥ 'আভাস' এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল, "একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। ...এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী অপরপক্ষে, বৈদান্তিক তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে। ...এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প হলেন। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে

লব্ধ 'সত্য'কে উপদেশ হিসেবে কাহিনীর আগেই যোজনা করেছেন। 'গোরা'র সঙ্গে এখানেই 'চার অধ্যায়'-এর পার্থক্য। গোরা তার পরম সত্যকে পেল অনেক অন্বেষণের পর, আর অতীন জীবনের সহজ সত্যকে আবিল করে তুলল দলে যোগ দিয়ে। 'গোরা'য় স্বদেশ অন্বেষণ ও মুক্তচিত্তের কল্যাণ রূপ, 'ঘরে বাইরে' মোহমুক্ত দেশসেবা আর 'চার অধ্যায়'-এ দেশপ্রেমের 'সর্বনেশে রিসর্চ্চ'—যেটা চলছিল বাংলাদেশের এক সন্ত্রাসবাদী নায়কের ভীষণ ল্যাবরেটরিতে। রবীন্দ্রনাথকে এ ধরনের চিত্র উপস্থাপনের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, পরের সংস্করণে বাদ দিয়েছেন 'আভাস' অংশটি।

প্রবন্ধের উপকরণ নিয়ে তিনি উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সে জন্যই চরিত্রগুলির আবেগ, উচ্ছ্বাস, নড়াচড়ায় কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব আছে। এই অসহজ ভঙ্গির কারণ কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি, চরিত্রগুলির কথায় ও চিন্তায় অসাধারণ সচেতনতা এবং চরিত্রগুলি যে 'বাঁকাপথ' চলেছে সে কারণেও। এ উপন্যাসের চরিত্রাবলীর কাজের জগৎ রূঢ় কঠিন, কিন্তু কথার ভুবন অতিশয় প্রসাধনমণ্ডিত। এলা অতীন কথা বলে না, যেন আবৃত্তি করে কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যে সমাজকে চিনতেন তা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্রমশ বুর্জোয়া গুণসম্পন্ন হয়ে উঠছিল এবং সে সমাজে প্রবল ঘটনা বা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব দুয়েরই অভাব ঘটছিল। ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের অভাবকে তিনি ভাষার কাব্যময়তা দিয়ে দূর করতে চেয়েছেন। এ সময়কার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চার অধ্যায়'-এর সাহিত্যিক মূল্য উন্নততর।

বিভীষিকা পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। ·· ···বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এ মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তাঁর আসা।" —গ্রন্থ পরিচয়, র. র. ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৫৪১-৪২।

"আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্য বিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকিরিত হচ্ছে। এই জন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। ···নদী আপন নির্ঝর প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে। কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমি প্রকৃতি থেকে। ভালো-

রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে দূর থেকে দেখেছেন এবং একটা আকর্ষণ বোধ করেছেন। সন্ত্রাসবাদের পেছনে তিনি ব্যক্তির ব্যর্থতাবোধকে দেখেছেন, কিন্তু সমাজের ক্ষোভ ও রাজনীতির ব্যর্থতাকে দেখেননি। সাংবিধানিক রাজনৈতিক ব্যর্থতাই যে সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা এ সত্যকে তিনি উপেক্ষা করেছেন বলে 'চার অধ্যায়' খণ্ডিত উপন্যাস হয়েছে। অন্যায় অসহিষ্ণু এলা সংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে ইন্দ্রনাথের সন্ত্রাসের দলে ছেলে টেনে আনবার কাজে লাগল। অসামান্য সুন্দরী এলা দলে টেনে তুলল অতীনকে। এলাকে ভালোবেসেই এবং তাকে পাবার জন্য উপায় নেই জেনেই সে এসেছিল সন্ত্রাস-বাদীদের সঙ্গে। অতীন ও এলা 'জীবনের নৌকাডুবি'র মুহূর্তে জীবনের দিকে বার বার অতৃপ্ত দৃষ্টি ফেলেছে। অন্তিম সময়ে একদা নীড়-প্রত্যাশী অতীনকে এলা জীবনের কেন্দ্রে টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে —কারণ এলাই একদিন অতীনকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর অভিমুখে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পকুশলতা 'চার অধ্যায়'-এর কাহিনীকে অনায়াসে আঁটিয়ে নিতে পারতো ছোট গল্পের আয়তনে। তাতে করে পরিবেশের অযৌক্তিকতা পীড়াদায়ক হত না। কিন্তু স্বল্প আয়তনে বলতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ বক্তব্য। প্রেম কাহিনীর মধ্যে রাজনীতির প্রবেশকে লেখক দেখাতে চেয়েছেন বাইরের সংঘাতময় শক্তি হিসেবে। যদি রাজনীতি না-ও আসত তবে প্রেমের 'সংবাধ' এলার নিস্পৃহ সচেতন, হিসেবী চরিত্রের মধ্যেই পাওয়া যেত। পেতে পারতাম অতীনের মধ্যেও। এলা এ সম্পর্কে বলেছে, "তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু। আমার আদরের ছোট খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ

বাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংবাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে। সেই সঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।

"বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্র প্রচেষ্টার নানা সংঘটনে তৈরী, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা। চার অধ্যায়ের রচনায় কোন বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক। ...এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালি নায়ক নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। ...তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ" —গ্রন্থ পরিচয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩-৪৫।

আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবী তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণ মনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সঙ্কোচে দুঃখ পাবে না" (২৯৭-৯৮)।

মনোবিশ্লেষণে পারদর্শী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন চিত্র উত্থাপনে কোনো অসুবিধাই হত না। শুধুমাত্র তাঁর মতের বাহন হয়েছে বলেই চরিত্রগুলি প্রায় প্রাণহীন হয়ে পড়েছে —কেবল সংলাপগুলি উপাদান হয়েছে কাব্যের আর সংবাদগুলি তথ্যসন্ধানীর।

ইন্দ্রনাথ ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষহীন অপ্রমত্ত চিত্ত নিয়ে ইংরেজ শাসনের পাথরটাকে সরাতে চেয়েছিল, কেন না সেটা 'ওদের রাজত্ব', বিদেশী রাজত্ব, "সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে —এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানব স্বভাবকে আমি স্বীকার করি" (২৮৬)। ইন্দ্রনাথ দেখেছেন ইংরেজের ও 'স্বভাব' 'বিদেশের বোঝা' ঘাড়ে নিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে (২৮৫)। কিন্তু 'নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না' বলে ইন্দ্রনাথ তার দলে টেনে হত্যা করেছে শত শত তরুণের স্বভাবকে। অতীন ক্ষোভে ফেটে বলছে, "হাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মত পঙ্গু। —আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে একেই বলে শক্তির নাচ" (২৯৯)।

অতীনের মনস্তাপ এই যে, সে এলার সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছিল। প্রচলিত পথের প্রতিবন্ধকতায় এই সুড়ঙ্গপথে সে নেমে এসেছে 'পতনের শেষ সীমায়'। সবাই যাকে বলে 'দেশের প্রয়োজন' তাকে অতীন জেনেছে 'আত্মধর্মনাশের প্রয়োজন' (৩২৭) রূপে। "স্বভাবকে হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ"— অতীন এ কথা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করছে। সে হয়তো এ রাস্তায় না এলে নিজের মতোন করে স্বাধীনভাবে অহিতকে ধ্বংস করবার কথা বলতে পারত, কিন্তু এই ঘোরালো পথের পরিণতি হচ্ছে, "কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে" (৩২৩)।

"আমি যা দিন-রাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না আজ আমি তাই হয়েছি" (গোরা ৫৭০) —গোরার মতো অমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মবিশ্বাস অতীনের নেই। নিখিলেশের পথটা সে নিজেই বলেছে আর সরল ছিল না।

অতীন নিজের স্বভাবকে হত্যা করতে চায়নি কিন্তু তার 'বেরোবার দরজা বন্ধ' (২৯৮)। রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি নায়ক-চরিত্রই মুক্তি পিয়াসী। কোনো না কোনো অবস্থা থেকে তারা সবাই মুক্ত হতে চাচ্ছে।

গোরা নিজে মুক্ত হবার আগেই মুক্ত আনন্দময়ী ও সুচরিতা এবং পরেশ-বাবুকে দেখেছে এবং তার জন্মান্তরেও রইল মা, প্রিয়া এবং গুরু। কিন্তু নিখিলেশ একা (চন্দ্রনাথ মাস্টারকে নিখিলেশের সহপথিক ভাবা যায় না)। বিমলাকে নিখিলেশ মুক্তি দিয়েছিল। বিমলাও মুক্তি চেয়েছিল ঘরের বন্দীত্ব থেকে। 'ঘরে-বাইরে'র একেবারে শেষের দিকে সেও নিখিলেশকে আকুল হয়ে বলেছে, "কোনো জিনিস নেবার দরকার নেই, কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার" (ঘ. বা. ২৬৯)। অতীন এলাকেও ফিরিয়ে গৃহাভিমুখী করতে পারল না, নিজেকেও না। স্বভাব হত্যাকারী অতীন চীৎকার করে বলেছে 'বেরোবার দরজা বন্ধ'। এ অবরোধটা কিসের? এ অবরোধটা যে সাম্রাজ্যবাদের এবং এরা যে সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্দী সে সত্য উদ্ঘাটিত হয়নি। যেমন হয়নি সন্দীপ, ইন্দ্রনাথরা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সে সত্যটাও। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করতে চাচ্ছেন না।

বরঞ্চ তিনি দেখেছেন সন্দীপ রিপুর, আসক্তির এবং মোহের কারাগারে বন্দী যেমন করে তিনি ইম্পেরিয়ালিজমকে রিপুর হাতে বন্দী বলে দেখতে পেয়েছিলেন। অতীনের দল বন্দী ইন্দ্রনাথের হাতে। দেশ যখন স্বাধিকারের দাবিতে অথবা স্বাধীনতার জন্য পথ খুঁজছে তখন তাঁর ঐ চরিত্রগুলি মানস মুক্তি চাচ্ছে। লাবণ্য যে রকম মানস-মুক্তির মধ্যে সমন্বয়ের পথে কল্যাণময়ী হয়ে উঠেছিল তেমন একটা সমন্বয়ের পথ তিনি ঐ চরিত্রগুলিকে দিতে পারেননি —দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। লাবণ্য সমন্বয়পন্থী, তার মধ্যে বিদ্রোহ নেই। এলার মধ্যে বিদ্রোহ আছে এবং তার পরিণতিও করুণ। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস এবং 'তিন সঙ্গীর' নারীচরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় তাঁর বিশেষ পক্ষপাত কল্যাণময়ী সমন্বয়পন্থার নারীর প্রতি, যে নারীর মধ্যে মা রয়েছে। বলাবাহুল্য এ দৃষ্টিভঙ্গিটাও তাঁর সমাজেরই দৃষ্টিভঙ্গি। লাবণ্য ও অমিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। রাজনীতির বাইরে অমিত ও লাবণ্য নেই। এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর কাছে পরাভব স্বীকার করে নেয়, সমন্বয়ের পথে যায়। এটা নিম্নমধ্যবিত্তের উচ্চবিত্তের কাছে পরাভব। রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত রয়েছে এমন পরাভবের প্রতি। যেহেতু সন্ত্রাসবাদীরা সাম্রাজ্যবাদকে স্বীকার করে না সেজন্য সেখানে যত গোলযোগ। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্য-বাদ উৎখাতের প্রতি পক্ষপাত দেখাননি। এর মধ্যে আবার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষভাবে বিরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একে-বারে শেষের দিকের লেখাতেও চরমপন্থার বিরুদ্ধে বলেছেন। চরমপন্থা সম্পর্কে

'শেষ কথা' গল্পের নায়ক একদা চরমপন্থী নবীনমাধবের অভিজ্ঞতা এমন হয়েছিল "···আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজতক্তে।"[৩২] এই নবীনমাধব প্রতিজ্ঞা করে-ছিল যে, সে স্বদেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করবে। আর সে জন্য তাকে হতে হবে যন্ত্রকুশলী। প্রায় দীর্ঘ এক যুগ আমেরিকা, সোভিয়েত ও ইউরোপে ঘুরে ডাক্তার নবীনমাধব কিন্তু সরকারি চাকরি পেল না। সে সরকারী চাকরির জন্য চেষ্টাই করল না কারণ তাকে যে অমন উচ্চপদস্থ চাকরি দেওয়া হবে না এটা তার জানা। চাকরি নিল সে এক সামন্ত রাজার স্টেটে। ইচ্ছা তার এমন যে, কোনো খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করে সে দেশের মঙ্গল করবে।

নিজের দেশে থেকে নবীনমাধব তার অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারল না। দুটো সত্য এখানে যেন উন্মোচনের অপেক্ষায় রয়ে যায়, যে সত্যের উদ্ঘাটন রবীন্দ্রনাথ করবেন না, কেন না রাজনীতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহের অভাব। সেই সত্য দুটি হচ্ছে যে পরানধী দেশে বিদ্যাও পরাধীন। সে বিদ্যা দেশকে স্বাধীন করতে পারে না। দেশের কাজেও লাগে না। এখানে শিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়।[৩৩]

বাইরের জগতে রাজনীতির ধারণা ও ধারায় বিবর্তন ঘটেছে। তার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি উপন্যাসে লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারণাগুলোও আছে। অন্ধকার থেকে ব্যক্তির মুক্তির উপায় স্বরূপ তিনি শিক্ষার কথা নবলেছে। অথচ তাঁর উপন্যাসে শিক্ষিত মূর্খের সংখ্যা কম নয়, 'গোরা'র হারানবাবু, 'ঘরে-বাইরে'র এম. এ. সায়ান্স ক্লাসের এবং মেডিকাল কলেজের ছাত্ররা এবং 'চার-অধ্যায়'-এর ইন্দ্রনাথ এরা সবাই সেই দলের। অর্থকে রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিকতার আকর হিসেবে দেখিয়েছেন অথচ ব্যক্তির তো অর্থ ভিন্ন উপায় নেই এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব ও তার মুক্তিও নেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি না ভাঙলে।

প্রবল শক্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথ সন্দেহপরায়ণ। ক্রমেই তাঁর সন্দেহ

প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পারেননি আর গোরার মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে। সন্দীপের শক্তি এবং অতীনের দলের অন্ধশক্তির মধ্যে তিনি অশুভকে দেখেছেন। এই অশুভকে তিনি আরও দেখতে পান রিপুর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের দেখায় বিমলা ও এলার বিদ্রোহের ভেতর এক ধরনের অসুস্থতা আছে যা স্বদেশী ও সন্ত্রাসের ভেতরকার ব্যাধির সমান্তরালবর্তী।

রাজনীতি সকলেরই বিশেষ করে পরাধীন জাতির, বিধিলিপি। সে কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন না। রাষ্ট্রক্ষমতা ভিন্ন সমাজ কল্যাণের যে কোনো প্রচেষ্টা অতিশয় তৃষিত মাটিতে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির মতো বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। দাতব্য করে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় এককভাবে কোনো জমিদারের জমিদারী ত্যাগ করে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করা। এমন কি সে জমিদার যদি রবীন্দ্রনাথও হন তবেও না।[৩৪] ববীন্দ্রনাথের সকল চিন্তার কেন্দ্রে এবং রাজনীতির চিন্তার কেন্দ্রেও বটে, আছে আত্মার উৎকর্ষ সাধনাব কথা। কিন্তু যে দেশে শতকরা বিরানব্বই জন মানুষেব আত্মাই নেই আছে শুধু অন্নবস্ত্রের অবিরাম চিন্তা, সে দেশে আত্মার কর্ষণা অসম্ভব কর্ম। এবং এই আত্মার উন্মোচন কখনো ঘটবে না যতদিন না সঠিক বাজনীতিব মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। ব্যর্থ রাজনীতির কথা ববীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আছে কিন্তু সঠিক রাজনীতিব পথ-নির্দেশ সেখানে নেই। যে ববীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ ও কালনিরপেক্ষ সৌন্দর্যেব স্রষ্টা সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা এই পথ-নির্দেশ নিশ্চয়ই আশা কবব না, কিন্তু আরও একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন যিনি দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক, আমাদের প্রত্যাশা এই রবীন্দ্রনাথেব কাছেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাস্তববাদিতাব অসদ্ভাব নেই। কিন্তু দার্শনিক ববীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পরিহার কবে যখন ভাববাদী হয়ে ওঠেন তখন মনে হয় তিনি আবদ্ধ আছেন প্রাচ্যেব ভাববাদিতা ও পশ্চিমের বুর্জোয়া উদারনীতিব নম্র অথচ অনমনীয় এবং পবস্পব-প্রবিষ্ট-বন্ধনে। এটা দুর্ভাগ্যজনক রবীন্দ্রনাথের দেশেব মানুষেব পক্ষে।

৩৪॥ "যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।" (চিঠিপত্র, গ্রন্থপরিচয়, র র., বিংশ খণ্ড, পৃ. ৪৫৩)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রে আসা, উচ্চমধ্যবিত্ত ভুবন থেকে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত চেতনায় প্রবেশ করা। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাগুলো মধ্যবিত্তের কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে যে একটা নির্লিপ্ততা ও দূরত্ববোধ দেখা যায় সেটা বোধকরি তাঁর বিত্তগত আভিজাত্যের জন্য। এ ব্যাপারে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা'য় নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য, "রবীন্দ্রনাথের জন্ম যদিও অভিজাত পরিবারে, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে আভিজাত্য ও সম্পদের আবেষ্টনের মধ্যে, তাহা হইলেও তাঁহার মনন-কল্পনা আশ্রয় করিয়াছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে" (পৃ ৩৬৮)। রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতাসমূহ কেমন ছিল সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় আরও বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এই অভিজাত পরিবার ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, লালিতপালিত হইয়াও তাঁহার নিজের মন রস আহরণ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সমাজ-মানস হইতে। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার সকল বন্ধু সুহৃৎ সহকর্মী সকলই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। ...এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু মোটা দ্বন্দ্ব, কলহ ও আনন্দ-কোলাহল আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বিষাদ, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য" (পৃ. ৩৯৪)।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক ছিলেন, শরৎচন্দ্র ছিলেন শুধুই ঔপন্যাসিক[১] —বাংলার প্রথম পেশাদার সাহিত্যিক। মানসিকতায় শরৎচন্দ্র তাঁর যুগ ও শ্রেণীর সমীপবর্তী, সেই মানসিকতা তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক সময় মনে হয় তিনি বাহন হয়েছেন, প্রকাশের মাধ্যম রূপে কাজ করেছেন তাঁর কাল ও সমাজের, যেন তিনি মার্কস বর্ণিত ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র।

১॥ এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মনস্তাপ ছিল। তিনি লিখেছেন, "টাকার অভাবে কত ভাল ভাব কল্পনা কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল —একটা উচ্চাশা ছিল যে "দ্বাদশ মূল্য" নাম দিয়ে আমি একটা volume তৈরি করব। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে 'নারীর মূল্য' লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে 'যমুনা'

শরৎচন্দ্র দার্শনিক ছিলেন না বটে, সমাজ গঠন সম্পর্কে ততটা লেখেননি যতটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি পীড়িত ছিলেন সমাজের দুঃখ দেখে, তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর পক্ষে দূরবর্তী থাকা সম্ভব ছিল না একেবারেই। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীর চৈতন্যোদয়ে তিনিও উদ্দীপিত হয়ে রচনা করেন অভয়-মন্ত্র মূলক স্বদেশীগান। স্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক কার্যক্রম রূপে জনসংযোগ, শিক্ষাবিস্তার এবং আত্মশক্তি অর্জনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বদেশী আন্দোলন যখন তাঁর মতে শুধুই মঙ্গলময় বোধোদয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না তখনই তিনি সরে দাঁড়ালেন আন্দোলন থেকে। সমালোচনা করলেন ঐ আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতার। লিখলেন 'ঘরে-বাইরে'। 'ঘরে-বাইরে' বা 'চার-অধ্যায়'-এর সঙ্গে 'পথের দাবী'র দূরত্ব সময়ের দিক থেকে অনেকটা নয়, চেতনার দিক থেকে বিস্তর পরিমাণে। 'ঘরে-বাইরে'র যখন নানা রূপ সমালোচনা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ সনের অগ্রহায়ণের 'সবুজপত্র'-এ যে টীকাটিপ্পনি দিয়েছিলেন তাব অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য, "যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়ো, তবে সে কথা পাঠক সম্বন্ধেও খাটে লেখক সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে, এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন, তাঁর গল্পটি ঠিকমত হওয়া চাই, তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়" ('ঘরে-বাইরে', গ্রন্থপরিচয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪)। দেশের সঙ্গে, কালের সঙ্গে তাঁর যে 'প্রবল পার্থক্য' আছে তিনি যে 'একলা পথের পথিক' সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন, সে কারণে 'পথের দাবী' পড়ে তাঁকে অপ্রসন্ন হতে দেখি। 'পথের দাবী' বিষয়ে তাঁর চিঠিতে তাঁদের 'পার্থক্য' সবচেয়ে স্পষ্ট, "তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্পক্ষণস্থায়ী হত —কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখিবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই —অপবিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই 'দ্বাদশ মূল্য' আর শেষ করতে পারিনি, তার কারণ অভাব। আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই। তখন এমন কি দু-বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না। প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন ও সব চলবে না। তুমি যা তা ক'রে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও —তবু হাজার খানেক কাটবে। 'বাংলা বইয়ের দুঃখ', 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত (১৩৬৩), পৃ. ৩৪২।

বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা।" এখানে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে দেখছেন, হৃদয় দিয়ে দেখছেন না —যেমন শরৎচন্দ্র দেখতেন, দেখতে ভালোবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন সন্ত্রাস-বিরোধী কথাসাহিত্য 'চার-অধ্যায় লিখলেন তখন এর 'আভাস' অংশ এবং উপন্যাসের তীব্র সমালোচনায় যে প্রত্যুত্তর তিনি প্রকাশ করেন তাতে কিন্তু তিনি নিজেও ঐ 'গল্পচ্ছলে' বলার যুক্তিটা এড়াতে পারেননি। "গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লব চেষ্টা সংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাকত তাহলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক।"[২]

"তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ"[৩] রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও 'চার-অধ্যায়' সদুপদেশ কাহিনী।

শরৎচন্দ্র রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২১ সালে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তখন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশে নেতৃত্বে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে অসহযোগ আন্দোলন প্রচার ও হাওড়া জেলাতে কংগ্রেস সংগঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ঐ জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। তিনি বি. পি. সি. সি.-র সহ সভাপতি এবং পরে এ. আই. সি. সি.-র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কংগ্রেসকর্মী রূপে যাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচিতি ছিল তিনি কেন 'পথের দাবী'-র মতো সন্ত্রাসবাদী (যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'বিপ্লববাদ' বলে) উপন্যাস লিখতে গেলেন? তখনকার রাজনীতি বাইরের দিক থেকে চাপে পড়ে শান্ত ছিল কিন্তু ভেতরে ছিল উগ্র। তেমনি শরৎচন্দ্র বাইরের পরিচয়ে ছিলেন কংগ্রেসী কিন্তু তিনি যখন রাজনৈতিক উপন্যাস লিখতে গেলেন তখন ভেতরে যে উত্তাপ ছিল সেটা বেরিয়ে এল। সমাজ সচেতন শরৎচন্দ্র পরাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যুবচিত্তের উগ্রতাকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, "উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সে ও যে শাস্তি দেয়"[৪] শরৎচন্দ্রের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত হলেও এই-ই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস।

২॥ 'চার-অধ্যায়', গ্রন্থপরিচয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫।

৩॥ ঐ, পৃ. ৫৪৫।

৪॥ 'পত্র সংকলন', শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩৬৭।

শরৎচন্দ্র যে সময় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন তখনকার রাজনৈতিক ভারতবর্ষের অবস্থা জটিল ছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন হয়ে উঠেছে সর্বভারতীয় সংঘ। বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মতো জনগণ উদ্‌বেলিত সংগ্রামী-বোধে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ব্যাপক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের, অপেক্ষা করেছিল গান্ধীর নির্দেশের জন্য ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় জনতার জিঘাংসু মনোবৃত্তি দেখে গান্ধীর আক্ষেপের সীমা রইল না। বন্ধ হয়ে গেল অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন, আন্দোলনের চেয়ে যার বড় নীতি ছিল অহিংসা। কংগ্রেস কর্মীদের ওপর নির্দেশ এল চরকা কাটা, শিক্ষাবিস্তার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ করার। জনগণ হতাশ হল। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হলেও যে কাজ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন সে কাজে অন্যদের ফাঁকি ও অবহেলা তাঁব সহ্য হল না। বিশেষ করে গান্ধীর কারাবাসে কর্মীদের নির্দয় নিশ্চুপতা এবং গান্ধীবাদী একদল স্বদেশকর্মীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সামাজিক লাঞ্ছনায় তিনি বিচলিত হলেন। শবৎচন্দ্র রূঢ় ভাষায় এব প্রতিবাদ করেন, শুধু প্রতিবাদ করেই শান্ত হননি, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগ করেন। অবশ্য চিত্তরঞ্জন দাস ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে পুনরায় তাঁকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত কবেন।

গান্ধীব কারাবাসেব পর 'নাবায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (বৈশাখ) প্রকাশিত 'মহাত্মাজী'[৫] নামক প্রবন্ধটির সঙ্গে ১৯২২ সালেব জুলাই মাসে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগ কালে পঠিত অভিভাষণ যার আংশিক বক্তব্য বিষয় ছিল গান্ধীর কারাবরোধ প্রসঙ্গ সময়ের দিক থেকে এবং বক্তব্যেব দিক থেকে প্রায় এক হয়েও ভিন্ন স্তরের। সেই কঠিন বিদেশী শাসনের রাজত্বে প্রকাশিত ও পঠিত বক্তব্যের উচ্চস্বর ও নিম্নস্বর লেখকেব মানস-জগতের পরিচয় দান করে। ভারতবাসীর নীরবতায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন—

"নীচাশয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনেব মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা-কাটাকাটি কবিবাব প্রবৃত্তি পর্যন্ত কাহারও নাই। মনে হয়, যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।"[৬]

উপরোক্ত ঐ লেখার স্বরগ্রাম নীচের পঠিত অভিভাষণ অংশে চড়া সুরে বাঁধা—

"মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁব কারাবাসের প্রথম দিনে মারামারি কাটাকাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে

৫॥ শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩৩১।
৬॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

সগর্ব্বে বললে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল। Anglo-Indian কাগজ-ওয়ালারা হেসে জবাব দিলে, এ শুধু নিছক indifference। আমার কিন্তু এ বিবাদে কোনো পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয়, যদি হয়েও থাকে ত দেশের লোকের এতে গর্ব্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ violence (?) সে তো কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্রব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছাও নয়, অথচ এ কথাও ত কেউ জোর করে বলতে পারিনে আমাদের বাড়ি ফেরবার পথটুকুর মাঝেই, হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে না দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও তো অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই এবং আমিও একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চাইনে, কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নাই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে' সান্ত্বনা লাভ করতে যাওয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা। আর indifference এ কথায় যদি কেউ এই ইঙ্গিত করে' থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি, তো তার বড় মিছে কথা আর হ'তেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হ'য়েই বেজেছে, কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসেনা।"[৭] বাইরে অহিংস থাকলেও তাঁর মনে যে একটা সুপ্ত ক্ষোভ ছিল তা এই অভিভাষণে স্পষ্ট হয়েছে। এই ক্ষোভই আরও সুসংগঠিত ও তীব্র হয়ে 'পথের দাবী'তে প্রকাশ পেয়েছে।

যে উগ্যমী নেতা তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন তিনি চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন 'বৈধ গণতান্ত্রিক রাজনীতির রাজা।' অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সময় তিনি জেলে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এ সময়ের কথা লিখেছেন, "I was with the Deshbandhu at the time and I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling." (*The Indian Struggle*, part II, p. 198)। কারামুক্ত হয়েই স্বরাজ্য পার্টি গঠনের জন্য চিত্তরঞ্জন অত্যুৎসাহী হয়ে পড়লেন। দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস স্বরাজ্য দল গঠিত হল। বহু বিপ্লবী কর্মী এ দলে যোগ দেন।[৮] চিত্তরঞ্জন সচেতনভাবে

৭॥ 'আমার কথা' শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩০৩-৪।

৮॥ পুলিশের গোপন নথিপত্রে এর উল্লেখ আছে, "Early in 1925 a prominent member of the Congress party admitted during an interview with a high government official that he knew personally of the existence in

এদের বৈধপথে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একাধারে এদের প্রশ্রয়দাতা এবং সমালোচক। এ সম্বন্ধে 'স্মৃতিকথা'য় শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর মতামত বর্ণনা করেছেন, "আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা, এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি? ...তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই এ্যাকটিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্তত পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সংগে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।' কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে।" (শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ২৯৭-৯৮)।

চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের সুহৃদ এবং সহায়ক ছিলেন। দেশবন্ধুর বাড়িতে শরৎচন্দ্র বহু বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন।[৯] পন্থায় তিনি এদের পন্থী না হলেও এদের সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। চিত্তরঞ্জন চাচ্ছিলেন বাংলাদেশে গুপ্তসমিতির অশুভ ধ্বংসাত্মক কাজ স্থগিত থাকুক। এই মর্মে তিনি শরৎচন্দ্রকে গুপ্তসমিতিকে উদ্দেশ্য করে একটা আবেদন লিখে দিতে বলেছিলেন। শরৎচন্দ্র লিখলেন, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেও না পারো তো অন্তত ৫/৭ বৎসরের জন্যেও তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থচিত্তে কাজ করিতে দাও।"[১০] চিত্তরঞ্জন "যদি" কথাটা বাদ দেবার জন্য অনেক অনুরোধ জানান। কারণ তিনি গুপ্তসমিতির অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র জানতেন দেশবন্ধুর এমন ধরনের স্বীকারোক্তির ফল 'দেশের উপরে' নিতান্ত ক্ষতিকর হবে। দেশবন্ধু যদিও বলেছিলেন যে, "সত্যকথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না," কিন্তু শরৎচন্দ্র রাজি হননি এবং সে আবেদনও প্রকাশ হতে পারেনি।[১১] নিজের মনের ধারা শরৎচন্দ্র 'স্মৃতিকথা'য় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তাঁর সমাজ সচেতনতা থেকেই রাজনৈতিক সচেতনতার উদ্ভব।

শরৎচন্দ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অসঙ্গতি দেখে প্রতিকারের কথা ভেবেছেন। কিন্তু তাঁর সমস্যার প্রতিকারের ভাবনার মধ্যে যথার্থ কোনো গঠন-মূলক কার্যসূচী নেই, মূলত সংস্কারের কথা রয়েছে এবং তা স্বাভাবিকভাবেই

Bengal of a terrorist movement, the members of which were hand in glove with the Swarajists.'

৯॥ দ্রষ্টব্য: শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন', (১৮৮০ শকাব্দ), পৃ. ৫০-৫২।

১০॥ স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

১১॥ ঐ, পৃ. ২১৯।

সমন্বয়ের পথে। এই মানসিকতা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, "রাজশক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বলক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই —একটা ভালর জন্য অনেক ভাল তাহাতে যেমন বিপর্যাস্ত, লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, সমাজশক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোনো মতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। কারণ ইহা অনেকবার অনেকপ্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসনদণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসনদণ্ড প্রবর্তিত করিলেও কোনো ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।"[১২] সে জন্য তাঁর কাছে "সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ।"[১৩] এই সংস্কারপ্রিয় কথাশিল্পী বিপ্লব-প্রিয়দের বিপ্লব সম্বন্ধে সতর্ক করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশেই govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরই পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না।"[১৪] উক্ত অংশটুকু ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে লেখা একটা চিঠি থেকে নেওয়া। একই সময়ে আর একটি অভিভাষণে তিনি বলেছেন, "ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায় —বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। ··বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধ'রে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। · স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য্য পন্থা নয়।"[১৫] 'পথের দাবী' লেখার পরে যখন সব্যসাচীর স্রষ্টা এমন কথা বলেন তখন তাঁর বিপ্লবী সব্যসাচীর কর্মসূচীর সার্থকতা সম্বন্ধে একটা সংশয় দেখা দেয়। কারণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে তিনি বলেছেন যে, "পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি· সংস্কার জিনিসটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিস অনেক দিন চ'লে ধড়ধড়ে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে —সেটা মেরামত ক'রে আবার

১২ ॥ 'সমাজধর্মের মূল্য', শ. সা. স., সপ্তম সম্ভার, পৃ. ৩৫৪।

১৩ ॥ ঐ, পৃ. ৩৫৫।

১৪ ॥ উদ্ধৃত: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (১৩৫২), পৃ. ১০৮।

১৫ ॥ 'তরুণের বিদ্রোহ', শ. সা. স., ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৫২।

দাঁড় করান। যেমন গভর্ণমেণ্টের শাসন-সংস্কার —Reforms। আর একদল যারা Revolution চাইছে —Revolution মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান Reforms অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয় —মেরামত ক'রে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা neglect দ্বারা হয়ত আপনি ধ্বংস হয়ে যেত —সেটা মজবুত ক'রে আবার খাড়া করা হয়।"[১৬] 'পথের দাবী'তে জোরালো সন্ত্রাসবাদী প্রচারের পর উপরোক্ত লেখাগুলি পড়লে বোঝা যায় শরৎচন্দ্র দ্বিধাযুক্ত ছিলেন। কারণ 'পথের দাবী'র সব্যসাচী চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 'বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে' —তাঁর এই পরবর্তীকালের ধারণা সব্যসাচীর ধারণার মধ্যেই নিহিত ছিল।

শরৎচন্দ্র যে সময়ে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি লিখেছেন তখন দুটো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লব। এদের অনিবার্য প্রভাব নবীন বাঙালী সাহিত্যিকদের রচনায় দেখা যাচ্ছিল। শরৎচন্দ্রের কোনো রচনায় এই দুটো বড় ঘটনার প্রভাব দেখা যায় না। তাঁর 'পথের দাবী' বাদ দিয়ে অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে রাজনীতি সরাসরি আসেনি কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মতামত অরাজনৈতিক উপন্যাসেও পাওয়া যায় যেমনটা দেখি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে। এ ছাড়া তাঁর সমাজ-সচেতনতা যেটা তাঁর উপন্যাসের বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক আবেদন বলে গণ্য করা হয় সে সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, আসলে সেগুলিকে ঠিক দ্বিযুদ্ধান্তবর্তী সমস্যা রূপে গণ্য করা চলে না। 'বিপ্রদাস'-এর (১৩৪১) শুরুতে জমিদার-বিরোধী আন্দোলন দেখা যায়। কিন্তু এর নেতৃত্ব অন্য কেউ দিচ্ছে না দিচ্ছে জমিদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এ যেন একটা খেলা এবং স্বভাবতই এই খেলা অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না। এ উপন্যাসের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া ব্যারিস্টারের সঙ্গে জমিদারের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শরৎচন্দ্র জমিদার না হয়েও জমিদারদেরই পক্ষে। ব্যারিস্টার মিস্টার চ্যাটার্জি যে এ দ্বন্দ্বে যথার্থ রূপে অবতীর্ণ হবে এমন শক্তি বা সাহস কোনোটারই সে অধিকারী নয়। এই ব্যারিস্টারেরা নানাপ্রকার বড় বড় কথা বলে কিন্তু যখন যথার্থ পরীক্ষার সময় আসে যেমন রেলওয়ে স্টেশনে মাতাল সাহেবের আচরণে একবার এসেছিল, তখন রীতিমতো পলায়ন করে। বরং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসে জমিদার বিপ্রদাস। যে কম কথা বলে এবং চেতনার দিক থেকে যে আচার পরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ। ব্যারিস্টার সমাজের মেয়ে বন্দনা নিজেই এ সমাজের পক্ষে একটি অন্তর্ঘাতী শক্তি। সে বলে যে,

১৬॥ 'চন্দননগরের আলাপ সভায়', শ. সা. স., ষষ্ঠ সম্ভার, পৃ. ৩৮০।

'এরা কিছু বিশ্বাস করে না কেবলই তর্ক করে।' অনেকটা যেন বিশ্বাসের খোঁজেই বন্দনা যেন তার সমাজ ছেড়ে জমিদার বাড়িতে গৃহিণী রূপে আশ্রয় খুঁজে নেয়। বুর্জোয়া বনাম সামন্তে দ্বন্দ্ব বেধে ওঠার আগেই বুর্জোয়ার এই যে পরাজয় এর মূল কারণ সামন্তবাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য সমর্থন। ফলে বুর্জোয়া পরিবার আত্মসমর্পণ করে জমিদারদের কাছে।

বুর্জোয়াদের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিতৃষ্ণা অন্যত্রও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। 'চরিত্রহীন'-এ (১৯১৭) আমরা আধা-ইংরেজদের অকিঞ্চিৎকরতা দেখি। সতীশ যদিও মদ খায় এবং মেয়েমানুষের আঁচল ধরে টানাটানি করে তবু তার এ আচরণের ক্ষমা আছে কিন্তু যে বাবা নিজে বিলাত গেছে এবং ছেলেকে বিলাত পাঠিয়েছে এবং নিজের বাড়িতে বিলাতি খাওয়া-দাওয়া প্রথার চালু করেছে সে ভদ্রলোকের কোনো ক্ষমা নেই। 'দেনাপাওনা'র (১৯২৩) ব্যারিস্টার নির্মলও দুর্বল চরিত্রের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের অমিট রে বাক্‌সর্বস্ব হতে পারে, কিন্তু সে নায়ক বটে, প্রতিনায়ক নয়, দুর্বৃত্ত তো নয়ই। ব্যারিস্টারদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো বিরূপতা নেই। শরৎচন্দ্রের আছে। 'দেনাপাওনা'র জমিদার জীবনানন্দের বিরুদ্ধে যে কৃষক অসন্তোষ গড়ে উঠেছে তার নেতৃত্ব দিয়েছে তার পরিত্যক্ত স্ত্রী ষোড়শী। কিন্তু উপন্যাস শেষ হল স্বামী-স্ত্রীর আপাত অসম্ভব মিলনে। যদিও ষোড়শী বলেছে যে, তারা কৃষকদের কাছে জমে থাকা জমিদারদের দেনা পুরুষানুক্রমে শোধ করবে; কিন্তু কথাটায় ভাবাবেগ যতটা আছে বাস্তবতা ততটা নেই। সে জন্য শোধবোধের প্রশ্নে একটা অনির্দিষ্ট কাল বেছে নেওয়া হয়েছে যেন কোনো তাড়া নেই, দেনা শোধ আপাততঃ না করলেও চলবে।

শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত রচনা 'জাগরণ'-এ[১৭] অসহযোগ আন্দোলন আছে এবং সেখানেও যে জমিদার তিনিও বুর্জোয়া চেতনাসম্পন্ন। এ ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র তাঁর রীতি অনুযায়ী বুর্জোয়া চেতনার পরাভব দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসে অসহযোগ আন্দোলনের নায়ক ব্রাহ্মণ অমরনাথ উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী। সে টোলের অধ্যাপক এবং এই জাতীয়তাবাদী নায়ক সামন্তবাদ বিরোধী নয়। কারণ সে পুরনো জীবনধারায় ফিরে যেতে চায়। যে জন্য সে জমিদার কন্যার আচরণ দেখে স্বয়ং জমিদারের কাছে অনুযোগ করেছে, "ওদের শিক্ষা ও সংস্কার যে আমাদের ধারণার সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারে না, এই তো স্বাভাবিক।"[১৮] সে ওই জমিদার বাড়িতে যাতায়াত করে কারণ বুর্জোয়া

১৭॥ সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ, ১৩৩০—১৩৩২ বঙ্গাব্দের 'মাসিক বসুমতী'তে।

১৮॥ 'জাগরণ', শ. সা. স., তৃতীয় সম্ভার, পৃ. ৩৭৫।

চেতনা থেকে জমিদার 'রে-সাহেব'-কে সে সামন্তবাদী চেতনা সম্পন্ন 'রায় মশায়'-এ পরিবর্তিত হতে দেখেছে। আর এই পরিবর্তন যে লেখকের অভিপ্রেত সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

'দেনাপাওনা'র ষোড়শীর পরিণতিতে 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রভাব দেখা যায়। যদিও 'দেনাপাওনা' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র মধ্যে সময়ের ব্যবধানের কারণে হুবহু এক নয় কিন্তু প্রত্যাবর্তনের মূল উপাদান একই। জীবানন্দ সে জন্য যখন 'দেবী চৌধুরাণী'র কথা উল্লেখ করে তা আপতিক নয় বরং বিষয়বস্তুর সঙ্গে তা মিলে যায়। প্রফুল্ল যেমন স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্যতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল ষোড়শীও তেমনি। কিন্তু 'দেবীচৌধুরাণী'তে দ্বন্দ্বটা ছিল সমাজ-বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ শাসকের, 'দেনাপাওনা'য় প্রজা ও জমিদারের। দ্বন্দ্বটা প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ হয়েছে কালের পরিবর্তনে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে শরৎচন্দ্র এগিয়ে নেননি বরং অতি নাটকীয়ভাবে সমাপ্তি ঘটিয়ে দিলেন সম-ঝোতায়। অসন্তুষ্ট প্রজাদের নেতৃত্বটা জমিদার গৃহিণীর হাতে রইল উভয় উপন্যাসেই এবং যেন পারিবারিক দ্বন্দ্বই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠল। তার ফলে এই দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্পষ্ট পশ্চাদ্‌ভূমিতে অপসারিত হল ও অবিকাশিত রয়ে গেল।

'দেনাপাওনা'য় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। পরোক্ষে আছে। জীবানন্দের কোনো কাজ ও দায়িত্ব নেই। এ দেশে জীবানন্দের মতো জমিদাররা কর্মহীন আলস্যে জীবন অতিবাহিত করে। তারা ইউরোপীয় জমিদারের মতো নয়। ইউরোপীয় জমিদারদের নানা প্রকার জীবন-জিজ্ঞাসা, কর্ম ও উৎপাদনের সঙ্গে যোগ রয়েছে। জীবানন্দরা অলস শ্রেণীর লোক, উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই শুধু দীনদরিদ্র প্রজাদের উৎপাদন ভোগ করা ছাড়া। কাজেই ইংরেজ শাসকের সঙ্গে তার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। জমিদারের এই কর্মহীনতা ও দায়িত্বহীনতা প্রমাণ করবে এই জমিদার পরাধীন দেশের। আবার দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়াভাবাপন্ন শ্রেণীরও ইংরেজের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই যেমন, 'বিপ্রদাস' ও 'জাগরণ' উপন্যাসে। বরং তারা ইংরেজের অনুকারক, একপ্রকার অনুকম্পার জীব। কাজেই এই উপন্যাসগুলিতে পরোক্ষ-ভাবে সাম্রাজ্যবাদ উপস্থিত রয়েছে যদিও শরৎচন্দ্র সেই উপস্থিতির সম্পূর্ণ তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের সজাগ করছেন না।

তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা যেমন উচ্চবিত্তের এবং বেশ কিছু পরিমাণে বুর্জোয়াভাবাপন্নও। আসলে তিনি শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক প্রাগ্রসর। শরৎচন্দ্র যে সময়ে ও কালে বিচার করছেন বিধবা রমার ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী কে —সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সুখী, সধবা, স্বামীপ্রেমে সৌভাগ্যবতী বিমলার প্রেমকে স্থাপন করছেন ব্যক্তিত্বের প্রসারে। যুগের আলোকে বিচার

করলে দু'জনেই অসম্পূর্ণ। সমাজ সত্তার অস্তিত্ববাহী অথচ বিদ্রোহবিলাসী প্রেমে এক ধরনের নাটকীয় মহত্ত্ব ছিল এবং প্রেমের ব্যর্থতায় বেদনা ছিল বলে প্রায় সব বাঙালী পাঠকের সম্বর্ধনা ও ভালোবাসা শরৎচন্দ্র পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অবশ্য সামন্তবাদের প্রতি একটা অনুরাগ আছে। কিন্তু তবু তিনি বুর্জোয়া উদারনীতির প্রতি যে পরিমাণে পক্ষপাত সম্পন্ন, শরৎচন্দ্র ততটা আদৌ নন। বুর্জোয়া উদারনীতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয় বটে, কিন্তু সামন্তবাদের তুলনায় অগ্রসর নিশ্চয়ই।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মত উল্লেখযোগ্য, "আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। 'পল্লীসমাজ' বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে, আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা চলে না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', 'স্বদেশ ও সাহিত্য', ১৯৩৮, পৃ. ৮৯)। 'সাহিত্য সভার অভিভাষণ'-এও তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, "সমস্ত গল্পটাই ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তাই অনেকে বলেন— কিছু constructive কল্লেন না, কোনো সমস্যার পূরণ কল্লেন না। আমি বলি ও আমার কাজ নয়। আমি দেখালুম গ্রামে নায়কের মত একটা মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাঁদের উৎপীড়ন করলে। সমাজের কি gain হলো? এই দুটি জীবনের যদি মিলন হতে পারতো, এ জিনিসটা যদি সমাজ নিতে পারতো, তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হতো। আমরা তাদের repress করলাম, দুটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম, সেই জন্য conclusion-ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।" ('শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫)।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' আর শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) প্রায় সমসাময়িক। নিখিলেশ এবং 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ উভয়েই শ্রেণীতে জমিদার। তবে রমেশ গ্রামের বাইরে থেকে এসেছে। তারা উভয়েই পল্লীবাসীর শুভার্থী। দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। রমেশ যে পল্লীসমাজের সংস্কারেচ্ছু সে সমাজ কাহিনীর বেশ আগের সময়কার —যে সময় দেশপ্রীতির ভিত্তি ছিল শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা। নিখিলেশের চেতনার সঙ্গে রমেশের দেশসেবা বোধের কালগত ব্যবধানটাই একটু পৃথক। সবচেয়ে বড় ব্যবধান যা তা রাজনীতি প্রভাবিত। 'ঘরে-বাইরে'র পল্লীসমাজ স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বেলিত। নিখিলেশ

ব্যতিক্রমধর্মী। সে জন্য সাধারণ লোকের ভাবনার সঙ্গে তার অমিল। অন্য সকলের কর্মের সঙ্গে তার যোগসাজস কম। কারণ তার মতে সকলে স্বদেশী আন্দোলনের ভুল স্রোতে গা মেলে দিয়েছে। তেমন স্রোতের শ্যাওলা হতে পারেনি নিখিলেশ। সে চেষ্টা করেছে নিজের আদর্শায়িত তটভূমি আঁকড়ে থাকতে। অথচ সে জানে ঐ পঙ্কিল স্রোতের বন্যায় ভেসে গেছে তার গ্রাম, এমন কি ভাসিয়ে নিতে চাচ্ছে তার ঘরকেও। ভিন্নযুগের হয়েও মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত রমেশ স্বগ্রামের উপচিকীর্ষু। সে সময়কার শিক্ষিত বাঙালীর মনে পল্লীকেন্দ্রিক যে একটা চিন্তাভাবনা দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সেই পল্লীচেতনাকে রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তো তৎকালীন রাজনীতির ধারাকে পল্লী-অভিমুখী করবার জন্য অনেক লিখেছেন ও বলেছেন। তিনি নিজের চেষ্টায় গ্রাম উন্নয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ উভয় উপন্যাসেই কোনো বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়। কারণ 'ঘরে-বাইরে'র মতো 'পল্লীসমাজ'ও প্রায় পারিবারিক কাহিনী। 'পল্লীসমাজ'-এর ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন গলদটা হচ্ছে অসৎ জমিদার কর্তৃক সমাজ পরিচালনা।

শরৎচন্দ্র দুর্নীতিকে চিনেছেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর সজল মানবিক বোধ দ্বারা সমাজের ত্রুটি নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐ সব দুরপনেয় সমস্যায় বিচলিত হয়েও সমাজের যথার্থ পরিবর্তনের কথা বলেননি। কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে দ্বিধা। এ দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে বুর্জোয়া চেতনার সঙ্গে সামন্তবাদী চেতনার দ্বন্দ্ব থেকে। এমন পরস্পর বিরোধী চেতনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মাত্রেরই ছিল। বুর্জোয়া চেতনার প্রভাবে তিনি সামাজিক কদাচারকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। ঐ সব কদাচারের সামাজিক রূপ ও অশুভ শক্তিকে শরৎচন্দ্র নির্দয় অত্যাচার হিসাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সামাজিক কদাচারের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক সমস্যা সে দিকে দৃষ্টি ফেরাননি। তাঁর পক্ষপাত ছিল সামন্তবাদের প্রতি। পাঠক অসন্তুষ্ট হবে এমন সমালোচনা তাঁর জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই নষ্ট করত। তদুপরি তাঁর জনপ্রিয়তা নষ্ট হবার ভয়ে, সমাজের সেই মূল ত্রুটি নির্দেশ ও সমালোচনা করতে হয়তো পেশাগত কারণেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। এই কুণ্ঠা অস্বাভাবিক ছিল না। কেন না একজন পেশাগত লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল। তিনি সামাজিক অসঙ্গতির কারণকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তির ভালো বা মন্দ চরিত্রের আলোকে। শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চান জমিদার বা ঐ শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংস্কার করে। ব্যক্তির একক উদ্যমে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একক ব্যক্তি নেতৃত্বে এই আস্থা সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনারই সাহিত্যিক প্রকাশ। 'স্বরাজ-সাধনায় নারী' অভিভাষণে শরৎচন্দ্রের এমন বিশ্বাস প্রতিফলিত, "পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না। একাকীই

দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে 'বহুর কল্যাণকর হয়।" —(শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩২৫)।

পল্লীসেবক রমেশ 'পথের দাবী'র অপূর্বর পূর্বপুরুষ। নিখিলেশ যা পারেনি রমেশ তা পেরেছে। নিখিলেশ স্বদেশী রাজনীতির আবিলতায় নামেনি। অথচ রমেশ গ্রাম্য দলাদলির পঙ্কিল স্রোতটাকেই বদলে দিয়েছে। রমেশের মহানুভবতা তেজস্বিতার সলিলে অবগাহন করেছে গ্রাম্যসমাজ। সে বহিরাগত হয়েও ঐ দুষ্প্রবেশ্য গ্রাম্যসমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল জনহিতৈষী বলে। তার নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে হিন্দু-মুসলমান আপন আপন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে একত্র হচ্ছে। অথচ 'মহেশ'-এর গফুরের নিজের কোনো সমাজ নেই কিন্তু হিন্দু সমাজের চাপ রয়েছে তার ওপরে। কারণ গফুর হিন্দু জমিদারের অত্যন্ত গরীব অসহায় প্রজা এবং সে একা। গফুরের রমেশের মতো কোনো মহৎচেতা প্রভু জোটেনি। রমেশের সহৃদয়তায় ও নেতৃত্বে গ্রামের দরিদ্র প্রজারা একটা শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। দেখা যাচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তিদের ভালো থাকা মন্দ থাকটা নির্ভর করছে ভালো প্রভু বা মন্দ প্রভুর ওপরে। অবশ্য সমাজের কর্তৃত্বটা থাকছে ব্রাহ্মণ জমিদারের হাতে।

'পল্লীসমাজ'-এ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা নেই। কারণ এর সমাজচিত্রটা রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্বের। অথচ 'পল্লীসমাজ' রচনার সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন যথেষ্ট প্রবল ছিল। আপাত দৃষ্টিতে রমেশ রাজনীতি নিরপেক্ষ, এ জন্যই যে সে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত নয়। কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বের যে রাজনীতি সেটা ঐ অরাজনৈতিক গ্রামেও প্রকট তা শিল্পী শরৎচন্দ্র ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই দেখি চাষীর সঙ্গে জমিদারদের বিরোধ বেধেছে বাঁধ নিয়ে। বাঁধ থাকলে জমিদারদের সুবিধা, না থাকলে কৃষকের। এই দ্বন্দ্ব আসলে একটি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। কারণ এর মূলে আছে জমিদারদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। এই দ্বন্দ্বের নেতৃত্ব আবার কৃষকরা নিতে পারছে না, নেতৃত্ব ভালো জমিদার রমেশকে দিতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কৃষকের নেতৃত্বদানে যে অপারগতা ও পরিণতিতে পরাজয় তার অন্তর্নিহিত অর্থ-নৈতিক করুণ বাস্তবতাকে শরৎচন্দ্র ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন জমিদার রমেশের দুর্ভোগকে। পরে রমেশ যখন কারাগারে গেছে তখন এই রাজনৈতিক সত্যই প্রকটিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ শুধু যে সামন্তবাদের মিত্র তা নয় সে সামন্ত-বাদের সংরক্ষকও। রমেশের কারাগারে যাওয়া সে জন্য একটা রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু শরৎচন্দ্র একে রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে না দেখে মানবিক ঘটনা হিসাবে দেখেছেন —অনেকটা গোরার কারাগারে যাওয়াকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছিলেন। সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলন

যদি একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীল আন্দোনে পরিণত না হয় তবে নেতৃত্বের দুর্বলতায় এবং প্রহরায় সে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। 'পল্লীসমাজ'-এর আন্দোলন তাই ব্যর্থ। হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাসী সংস্কার সাধনে উৎসাহী রমেশ যেন গান্ধীবাদের পূর্বাভাষ। তার সংস্কার-সাধনা ব্যর্থ কারণ জমিদারী প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কখনও জমিদারী প্রথার কুফল দূর করা সম্ভব নয়। সমাজ থেকে সামন্তবাদ স্বষ্ট দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কার যদি দূর করতে হয় তাহলে ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত করে তা সম্ভব হয় না। সম্ভব হতে পারে এই রোগের উৎস যে সামন্তবাদ তাকে বিলোপ করে, সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে লালিত ও পুষ্ট সামন্তবাদকে উৎখাত করে। রমেশরা সার্থক হতে পারে না কারণ একদিকে তার শ্রেণী আর একদিকে তার শিক্ষা। জমিদাররা এ দেশে রাজনীতি করেছে বটে, কারাগারেও গিয়েছে এবং লোকের কাছে সম্মানও পেয়েছে, কিন্তু কখনও শ্রেণীচ্যুত হয়নি; এবং নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নিজের শ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছে।

রমেশদের মতো তরুণ যুবশক্তিই যে দেশের কাজের জন্য যোগ্যতম সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র আস্থা রেখেছেন। সে জন্য যুবকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি মনে করেছেন 'স্বাধিকার চর্চা' বলে। রাজনীতি পরিচালনার ভার উন্নত দেশের বৃদ্ধদের দায়িত্ব, কিন্তু এটা যে ভারতবর্ষের নবীনদের দায় তা তিনি স্বীকার করেছেন। কারণ, "দেশ শাসন করা আর স্বাধীন করা এক বস্তু নয়।"[১৯] পরাধীনতা দূর করতে হলে "পদে পদে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে চলতে হয়। এত তার পেশা নয়, এ তার ধর্ম্ম। তাই, এই পরম ত্যাগের ব্রত শুধু যৌবনই গ্রহণ করতে পারে।"[২০] অমন কথা বিশ্বাস করেন বলেই তিনি আশা রেখেছেন যে অধীনতা দূর হবেই। কারণ ছাত্রসমাজ রাজনীতিকে ছাত্রজীবনের পরিপন্থী বলে মনে করে না। যে যৌবনশক্তি পথ চলবার পথ খুঁজছে, শরৎচন্দ্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে শক্তিকে বারংবার উদ্দীপক বাণী শুনিয়েছেন।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপ্তির দিক দিয়ে যেমন প্রসারিত ছিল, তেমনি ছিল এর ওপরে শিক্ষিত বাঙালীর সংশয়হীন প্রত্যয়। আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে এমন অত্যধিক বিশ্বাসের কারণের পেছনে রয়েছে দ্বিযুদ্ধান্তবর্তী বাংলাদেশের আবহাওয়া। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত ঘোষণা করা হল। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে গেল কলকাতা থেকে দিল্লীতে। রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, সন্ত্রাসবাদী কাজের ফলে

১৯॥ 'সত্যাশ্রয়ী', শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩৪২।
২০॥ ঐ, পৃ. ৩৪২।

শাসকবর্গ বাংলাদেশে নিরাপদ বোধ করছিল না। এর আগে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল তা সার্থক হল না। কারণ এ আন্দোলনে গঠনমূলক কোনো বাস্তবমুখী কর্মসূচী ছিল না। এ আন্দোলনের একটা দিক ছিল স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলা। কিন্তু সে শিল্প প্রচেষ্টার প্রাথমিক উদ্যমসমূহ ব্যর্থ হল। নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুরু হল তুমুল মতভেদ। চারদিকে তখন একটা হতাশা! এ সময়ে একমাত্র অদম্য শক্তির প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় সন্ত্রাসবাদী তরুণদের মধ্যে। স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে শিক্ষিতের হার যে পরিমাণে বেড়ে যেতে লাগল সে অনুপাতে চাকরির সংখ্যাও কমে যেতে থাকল। ভদ্র বাঙালীর জমির সঙ্গে এতকাল যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে পল্লীবাসী ভদ্রলোকের ভিড় এসে জমতে থাকে কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠে। শিক্ষিত বাঙালীর জীবিকার্জন ছাড়াও পল্লীবাসের অসুবিধা এবং শহরের জীবনের আকর্ষণীয় উপাদান বাঙালীর গ্রাম-ভিত্তিক মানসে একটা বড় পরিবর্তন এনে দিল। চাকরি নেই, অর্থনৈতিক অবস্থার অবক্ষয় ঘটছে অথচ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের অন্যান্য চাহিদা গেছে বেড়ে —এমতাবস্থায় শিক্ষাভিমানী মধ্যশ্রেণী উপায়হীন অবস্থার মধ্যে পড়ল।

শিক্ষার বিস্তার ও আধুনিকতা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিত্ববিকাশে প্রধান দুটি বাধা ছিল --রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সে পরাধীন এবং সামাজিক বিধিকেও একান্তভাবে লঙ্ঘন করতে অপারগ[২১] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক অবনতি এবং অনিশ্চয়তা। এমন সঙ্কটের মধ্যে গান্ধীর অসহযোগের ডাকে এই কর্মহীন বেকার শিক্ষিতরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর সঙ্গে যোগ দিল বর্জন-নীতিতে সাড়া দিতে স্বেচ্ছায় চাকরি বর্জনকারী, চাকরি ত্যাগীর দল, স্কুল-কলেজ বয়কট করা শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত শ্রেণী। এ আন্দোলনে তারাই ছিল অগ্রগামী। জাতীয়তা-বোধের ধারণাটা এ সময় ইহলৌকিক চেতনায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। গণতন্ত্র এবং ইহলৌকিকতা বোধ, জাতীয়তাবাদে এই দুটি নতুন উপাদান যুক্ত হল। ফলে ভদ্রলোকদের জাতীয়তাবোধের চেতনা ও প্রচার জনসাধারণকেও আকর্ষণ করতে শুরু করল। জনসাধারণের শক্তি একতাবদ্ধ আকারে একটা বিশাল রূপ পরিগ্রহ করল। জাতীয়তার ধারণা প্রসারিত হয়ে গেল সমস্ত ভারতবর্ষে। তবে এই যে উদ্দীপনা ও অত্যুৎসাহ মানুষের মনে দেখা দিল তার কোনো জীবননিষ্ঠ কার্যসূচী ছিল না! অর্থাৎ কোনো বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক ভিত্তি বা কর্মসূচী অসহযোগে ছিল অনুপস্থিত। উপাধি, স্কুল, কলেজ, বিলাতি দ্রব্য ইত্যাদি অকল্যাণকে বর্জন করে তার বদলে নতুন কিছু কল্যাণকর গঠনমূলক সৃষ্টি

২১॥ গোপাল হালদার, 'বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি', (১৩৬৩), পৃ. ১০১।

করবার নীতি বা কার্যসূচী এ আন্দোলনে নেওয়া হয়নি। তবু ঐ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন দেশবাসীর সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু গান্ধী সে আন্দোলনকে থামিয়ে দিলেন। দেশবাসী তীব্রতর হতাশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল। হতাশ হল শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজও। কারণ তারা আন্দোলনের সুনিশ্চিত সফলতা সম্বন্ধে আস্থাবান ছিল। আন্দোলন ব্যর্থ হলে তরণ সমাজের একাংশ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিল। আর তরুণ সাহিত্যিকরা রাজনীতির পথ ছেড়ে একটা রোম্যান্টিক জগতের আশ্রয় নিল। এই রাজনীতি বিমুখ বুর্জোয়া প্রভাবান্বিত তরুণ সাহিত্যিকরা 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের মতো সাহিত্যের মধ্যে পুরনো সামন্তবাদী সংস্কারকে উপড়ে ফেলতে শুরু করল। কিন্তু নতুন সাহিত্যিকদের নতুন আমদানীকৃত ভাবধারা বিশ্বাসযোগ্য জমি পেল না। সে সব ভাবময়তার ভিত্তি ছিল মানসিক, বাস্তব নয়। অর্থাৎ সামন্তনীতিকে বিসর্জন দিলেও তার জায়গায় গডতে পারল না কোনো বুর্জোয়ানীতি অথবা কোনো সৃষ্টিময় আশার পথ। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এই সময়কার রচনা।

শরৎচন্দ্র বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতার দুটো সত্তাকে একই সঙ্গে সক্রিয় হতে দেখেছেন। যে গ্রামীণ জীবনকে ছেড়ে আসতে হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের তার প্রতি একটা সহজ পিছুটান ছিল —ঐ জীবনের একান্নবর্তিতা, ঐক্য, পরিবারের মানুষদের মহিমা এবং দুর্বলতা মেশানো স্মৃতি অর্থাৎ সামন্তবাদী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ। অন্যদিকে দেখা গেল, সামন্তযুগের কুসংস্কারকে অস্বীকার করবার প্রবণতা। আসলে ঐ অবসাদগ্রস্ত নিশ্চেষ্ট হতাশায় শিক্ষিত বাঙালীর মন বহির্জগতের ও পারিপার্শ্বিক দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সমতালে চলতে পারছিল না। পুরনো পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা বাইরের অর্থনৈতিক চাপে এবং দেশের সুবিন্যস্ত অর্থনৈতিক কার্যসূচীর অভাবে দ্রুত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। চালচলনও বদলে যাচ্ছে জীবনযাত্রার অথচ মহৎ বা নতুন কোনো বিকল্প শুভ সম্ভাবনা তার স্থলে ছিল না। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর তেমন কোনো মানসিক ঔদার্য ও অর্থনৈতিক সুনিশ্চিত পুঁজি ছিল না যার সাহায্যে সে তার ব্যক্তিত্বের জোরে যুগের বিপক্ষে লড়বে বা যুগকে অতিক্রম করে যাবে অথবা কোনো প্রস্তাব ফেলতে সক্ষম হবে। শুধু রবীন্দ্রনাথই পেরেছিলেন তাঁর আভিজাত্য ও নির্লিপ্ততা দিয়ে কতকটা বুর্জোয়া-প্রভাবান্বিত ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরতে। কিন্তু আমরা দেখেছি 'শেষের কবিতা'র অমিত 'নিজের বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী কর্মের অভাবে' হয়ে পড়েছে একজন সিনিক। 'অমিত বিযুদ্ধান্তবর্তী পর্বের সামাজিক তাপমান।'[২২] অমিতের সমাজ উচ্চমধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে অমিতরা সম্ভব নয়।

২২॥ প্রথমনাথ বিশী, 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', (১৩৬০), পৃ. ১০৫

সমাজ সচেতনতা শরৎ সাহিত্যের প্রধান কথা। আর এই সচেতনতার পেছনে রয়েছে তাঁর উদার অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গড়ে তুলবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবার জন্য তাঁর মতে স্বদেশী সমাজশক্তিই যোগ্য প্রত্যুত্তর। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো আদর্শায়িত স্বদেশী সমাজ গড়ে তুলবার কল্পনা করেননি। তিনি দেখিয়েছেন সমাজের দোষত্রুটি। দোষগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে বিধি নিষেধের প্রাচীর রূপে।

শরৎচন্দ্রের বেশীরভাগ পুরুষ চরিত্র এই সময়কার নিম্নবিত্ত বাঙালীর মতো কোনো স্থির লক্ষ্যের অভাবে মন্থর, অলস, কর্মহীন। অনেকটা নিখিলেশের মতো, শিক্ষিত, দেশ সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু মনের মতো কর্মের অভাবে নিষ্ক্রিয়। নিখিলেশের মূল সমস্যা দেশ নয়, স্ত্রীর প্রেম। তার স্ত্রী অনুশীলিত ব্যক্তিত্বময়ী, যুগের আবহাওয়া ও শিক্ষার সঙ্গে যে আপনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে বিমলার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রকাশহীন। অহেতুক রাজনৈতিক উদ্দীপনাকে নিখিলেশ মনে করে শক্তির অপব্যবহার বলে। কারণ নিখিলেশের স্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপনার স্থায়ী গঠনমূলক কোনো হেতু দেখতে পাননি। অথচ নিরুত্তাপ নিখিলেশের 'ফিঁকে স্বদেশী-আনায়' কোনো স্থায়ী গঠনমূলক কার্যসূচী পরিলক্ষিত হয়নি। নিখিলেশের স্থাপিত বিদ্যালয়ের বা তাঁতের স্কুলে কোনো সুদূর বিস্তারী উপযোগিতা দেখা যায় না।

অথচ সন্দীপের সচলতা, সক্রিয়তা তার মনোজাত নয়। তার সচলতা তার আন্দোলন থেকেই এসেছে। স্বদেশী দলের পাণ্ডা সন্দীপ আন্দোলনের সচলতা সত্ত্বেও কোনো স্থায়ী গঠনমূলক কাজ না পেয়ে বিবাহিতা মহিলার মন আকর্ষণ করবার কাজে লিপ্ত হয়। নিখিলেশ মনের মতো কাজ না পেয়ে অলস জীবন যাপন করে। সন্দীপের ও তার কাজের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এক জায়গায়— উভয় কাজই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত। কর্মহীন বিমলাও কাজ চায়, সে গৃহের বাইরে পা ফেলতে চাচ্ছে কিছু করবার আশায়। ব্যর্থ শুধু সন্দীপ নয়, ব্যর্থ নিখিলেশ এবং বিমলাও। রাজনীতির উত্তেজনা অন্তর থেকে প্রেরণা যোগাচ্ছে না, এটা বহিরাশ্রয়ী। সেই আন্তর প্রেরণাহীন বাহ্যিক উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে ঘরের শান্তিতে মন চায় আশ্রয় পেতে। কিন্তু সেখানেও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কাজের অভাবে বন্ধ্যা রাজনীতিই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ের মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসিকতার ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত রূপকার। রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই অর্থেই উচ্চমধ্যবিত্তের এবং চূড়ান্ত পর্যালোচনায় তাঁর নিজেরই মুখপাত্র। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে বাস্তব চিত্র যত আছে তার চেয়ে বেশী আছে তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর কঠিন সমালোচনা।

স্বদেশী আন্দোলনে নেতিবাচক কার্যক্রমের বিচ্যুতি তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল, অথচ তাঁর নির্বাচিত ইতিবাচক গঠনমূলক কাজের প্রয়োগ সম্ভাবনাও ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। এমন অবস্থায় তাঁর মানসিকতা লক্ষণীয়, "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"[২৩] ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২তে লেখা এ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এ সময়কার 'খেয়া'-র কবিতাগুলিতে এই মানসিক অবসাদের ছাপ রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন-পরবর্তী দেশের সেই মানসিক জাড্য তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকেও স্পর্শ করেছিল। যুগোত্তীর্ণ হবার শক্তি তাঁর ছিল। সমগ্র দেশের সঙ্গে তাঁর দূরত্বের মধ্যেও তাই তিনি নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভার অনুরূপ কর্মক্ষেত্র এবং সৃষ্টিময় সাহিত্য জগতে আত্যন্তিক রূপে মনোনিবেশ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের এক সন্ধিক্ষণের ঔপন্যাসিক। সে সময়কার মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে সামন্তবাদী ধারণাগুলি নিজেদের শক্তি হারিয়ে ফেলছিল এবং বুর্জোয়া ধারণাগুলি প্রবেশের পথ খুঁজছিল। উভয় ধারণার মধ্যে তিনি সমন্বয় করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু উপায় পাচ্ছেন না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখেছেন যে, "অতি আধুনিক যুগের দুই একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, বোধহয় শরৎচন্দ্রই শেষ লেখক যাঁর রচনায় যৌথ পরিবারের চিত্র অঙ্কিত ও সমাজ নীতির শাশ্বত মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। সমাজের সংস্কার করতে যেয়ে যাতে সমাজের সংহার না করি সে দিকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি ছিল।" ('সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে', ১৩৬৯, পৃ. ৩২২) —এই দৃষ্টিভঙ্গি শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শরৎচন্দ্র সংস্কারাচ্ছন্ন যে সমাজের অনুদার ও যুক্তিহীন নিয়মানুবর্তিতা থেকে ব্যক্তির জীবনকে মুক্ত করতে চেয়েছেন সে সামাজিকতা তখন বর্তমান ছিল না। মনে হয় তিনি যদি পুরনো সমাজের নীতি-দুর্নীতির পরীক্ষা-ক্ষেত্র রূপে প্রেমের রোম্যাণ্টিক জগৎকে উপজীব্য না করে স্বচ্ছ দৃষ্টি ফেরাতে পারতেন নিপীড়নের মূল উৎসের দিকে তাহলে হয়তো তিনিই হতেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অর্থাৎ সমাজ-পরিবর্তনে বিশ্বাসী প্রগতিশীল ধারার স্রষ্টা। কিন্তু তিনি সংস্কারের কথা বলেছেন। সামাজিক কুপ্রথা সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। যথার্থ পরিবর্তন আসতে পারে উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উৎপাদন সম্পর্কের রদবদল করে।

এ প্রসঙ্গে 'মহেশ' নামে ছোটগল্পটি উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

২৩॥ উদ্ধৃত: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' (১৩৬৮), পৃ. ১৪৪

নিঃস্বার্থ পশুপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়েছে এই কাহিনীতে। গফুর একজন জোলা; ইংরেজ সরকারের অধীনে এ দেশীয় তন্তুবায়দের চরম আর্থিক দুর্গতি তার কপালেও জুটেছে। তাঁতী থেকে সে হয়েছে ভাগচাষী, ভাগচাষী থেকে শ্রমজীবী সম্বলহীন জনমজুর। দুর্ভাগ্য আর অজন্মা তাদের পিছু ছাড়ে না। তার চেয়েও নাছোড়বান্দা গাঁয়ের জমিদার ও তার অনুগৃহীতরা। মুসলমান হয়েও যে চাষী গফুর বর্ণহিন্দুদের তুলনায় গরুর প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল এবং অধিক মমত্ববোধসম্পন্ন তা শরৎচন্দ্র 'মহেশ'-এ তুলে ধরতে পেরেছেন। কারণ গফুর হচ্ছে চাষী, গরু তার মূল্যবান সম্বল, সম্পদ, বিলাসী খাদ্য নয়। স্বল্প রেখায় তিনি দেখিয়েছেন জীবিকা নির্বাহের ছকগুলো এতদিন যেমন বাঁধা ধরা ছিল এবং ঐ অর্থনৈতিক ছকটা হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে অভিন্ন ছিল সেটা কিভাবে ভেঙে যাচ্ছে। এক জীবিকা থেকে অন্য জীবিকায় দরিদ্র মানুষ ছুটে যাচ্ছে'। গফুরের তেজী মনোভাব তিনি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। তবে বলে নিয়েছেন, অতটা তেজ দেখাবার আগে 'আত্মবিস্মৃত'[২৪] হয়েই সে অমন করতে সাহস পায়।

গফুরকে মহেশের দৌরাত্ম্যের দরুণ কাছারিতে অনেক লাঞ্ছনা ও প্রহার সহ্য করতে হয়। এমনি এক দুর্ঘটনা ঘটানোতে মহেশকে গফুর 'দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য' হয়ে মেরে ফেললো। মহেশকে সে আঘাত করেছিল যে লাঙ্গলের মাথাটা মেরামতের অপেক্ষায় ছিল সেটি দিয়ে। ঐ সঙ্গে শেষ হয়ে গেল কৃষকের শেষ স্বপ্ন। চটকলের ভাবীশ্রমিক গফুরের আর্তনাদ ও ফরিয়াদ শোনে 'নক্ষত্রখচিত সীমাহীন সহানুভূতিপূর্ণ আকাশ'। অথর্ব, অকেজো বাতিল প্রাণীটির প্রতি আবেগের বাষ্প কমিয়ে বাস্তব দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে আসলে খুঁটিতে রজ্জুবদ্ধ জীর্ণ শরীরের, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অসহায় গফুরকে। তার সমাজ নেই। হিন্দু সমাজের কাছ থেকে সে বিন্দুমাত্র সাহায্য পায় না কিন্তু অনুশাসন তার ওপরে নেমে আসছে ঐ সমাজের কর্তৃত্বের কাছ থেকে। এমন অসহায় লোকেরও ক্রোধ রয়েছে। ক্রুদ্ধ হলে জোটে কর্তাদের কাছে লাঞ্ছনা। কর্তারা শাসন করতে শিখেছে, বিবেচনা করতে নয়। প্রতিকারে অসমর্থ গফুর প্রতিবাদী হয়ে প্রিয় গরুটিকে মেরে ফেলে। অনুরূপ ক্রোধের কারণে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের বড় ভাইটি নিজের স্ত্রীকেই খুন করে বসেছিল। হতে পারে গফুর তার ক্রোধকে লালন করবে এবং লাঙ্গলের ফলায় অত্যাচারীকে আঘাত করবার ইচ্ছা তার শ্রমিকজীবনে সে গোপনে পুষে যাবে এবং 'কসুর' 'মাপ' করতে পারবে না জীবনভর। কিন্তু তেমন কোনো ইঙ্গিত 'মহেশ' গল্পে নেই।

কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবিকার প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে জীবনের

২৪॥ 'মহেশ', শ সা. স., ত্রয়োদশ সম্ভার, পৃ. ৩১৪।

পুরনো ধরনও ধোপে টিঁকতে পারছে না, টিঁকতে পারছিল না গফুররা এই দ্রুত আর্থিক অবক্ষয়ের ঝাপটায়। গ্রামের সমাজে সম্ভ্রম, ইজ্জতবোধ তার জন্য হাস্যকর মিথ্যামোহ হলেও এই মোহ থেকে তার মন মুক্ত হতে চায় না। দীন-দরিদ্র, অতিবঞ্চিত, অত্যাচারিত কৃষকের সুনিশ্চিত অনাহারী জীবনের চেয়ে যে শ্রমিকের অচেনা জীবন অন্তত তুলনায় শ্রেয় হতে পারে সেটা শরৎচন্দ্র দেখাতে ইচ্ছুক নন। ভূমিহীন কৃষকের সেই সামন্তবাদী মোহ রয়ে গেল যা ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্তের ভূমিকেন্দ্রিক জীবনের পিছুটানে, অথচ যাকে ছক ভেঙে এগিয়ে যেতে হচ্ছে নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার টানে।

'মহেশ' গল্পটির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উঠেছিল যে, এ হচ্ছে প্রজা উত্তেজক কাহিনী।[২৫] শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রজার জাগরণ চান। কিন্তু প্রজাদের বিদ্রোহে তাঁদের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। গফুরের নিষ্পেষণ অবশ্যই রাজনৈতিক। কারণ জমিদারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। জমিদার সাম্রাজ্যবাদীদের আজ্ঞাবহ দাস। সামন্তবাদে সাম্রাজ্যবাদে যে গভীর আঁতাত বর্তমান তারই নির্মম শিকার গফুর, মহেশের সঙ্গে যার বলতে গেলে কোনো পার্থক্যই নেই। শরৎচন্দ্র এই সত্যকে উপেক্ষা করেছেন। রাজনীতিকে আনছেন না। গফুরদের বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হয় না, হলেও জয়ী হওয়া যায় না। অথচ শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী দেখা যাবে কৃষককে বাদ দিয়েই লড়ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ এবং সামন্তবাদ বিরোধী যুদ্ধ একই যুদ্ধ। সামন্তবাদকে বাদ দিয়ে, অক্ষুণ্ণ রেখে সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করা সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রের ভ্রান্তি ও সব্যসাচীর ভ্রান্তি—এক এবং অভিন্ন। অত্যাচারিতের নিষ্ফল আক্রোশ তাই যেয়ে পড়ে নিরীহ ষাঁড় অথবা স্ত্রীর ওপর। অর্থাৎ অত্যাচারিত নিজেও অলক্ষ্যে ভূমিকা নেয় অত্যাচারীর। কৃষক-বিদ্রোহে সমর্থন থাকলে চিত্রিত হত অন্য রূপ। গল্পটিতে হিন্দু জমিদার-সমালোচনা যে তীব্র সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। তবে এ জমিদার খারাপ জমিদার। তাঁর আদর্শ জমিদার হচ্ছে বিপ্রদাস, যাকে দেখলে মনে হয় না যে জমিদারী প্রথার মধ্যে কোনো অন্যায় রয়েছে। শরৎচন্দ্র খারাপ জমিদারের বিরোধী, জমিদারীপ্রথার বিরোধী নন। এখানে তিনি প্রজা ক্ষেপাননি। পীড়নের চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রতিকারের ভাবনা ভাবতে বসেননি। ভবিষ্যদ্বাণী করা শরৎচন্দ্রের চিত্ত-বিরোধী। তিনি সেই রকম অসম্পূর্ণবিদ্য হস্তরেখা বিশারদ যিনি রেখার অতীত কার্যকারণ সূত্র ধরে বর্তমানে আসেন এবং সেখানেই থেমে থাকেন, আর এগোন না। ভবিষ্যৎ গোণা তাঁর করায়ত্ত নয়। নিজেই তিনি যাত্রী। দিগ্‌নির্ণয়ের ভার

২৫॥ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', শ সা স., ষষ্ঠ সম্ভার, পৃ. ৩৫৮

তিনি নেবেন কেমন করে? তাঁর বক্তব্যেও সে কথার ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, "পেশা আমার সাহিত্য, রাজনীতি চর্চ্চা হয়ত আমার অনধিকার চর্চ্চা। আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোনো দিন কোনো ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তি বিশেষের জীবন-সমস্যার আমি শুধু বেদনার বিবরণ দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতায় পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি —এইখানেই আমার সাহিত্যরচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেইজন্য লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই, প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়।"[২৬]

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'কে উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, কর্মী সব্যসাচী দেশের পরাধীনতা দূর করতে যে সব পরিকল্পনা করছে সে পরিকল্পনা কল্পনাশ্রয়ী অর্থাৎ সাহিত্যিকসুলভ। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে শিক্ষিতের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে যে দুটি বাধা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক, 'পথের দাবী'তে সেটা দেখতে পাওয়া যায় সব্যসাচী ও অপূর্বর মাধ্যমে। সব্যসাচী আবদ্ধ রাষ্ট্রীয় বন্ধনে, আর অপূর্ব বন্দী সামাজিক বেষ্টনে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র উপন্যাস রচনায় সামাজিক কদাচারের সমালোচনা করার ফলে উক্ত সামাজিক বন্দী সত্তাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আবার অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় আকুল হয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমেই উপলব্ধি করেছেন, "সত্যবাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন।"[২৭] কারণ, "আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই —তাহা সিডিশন।"[২৮] তাঁর আক্ষেপ, "দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, সামাজিক আচার ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত বাঁধা, পা গুটানো আর থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্য সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।"[২৯]

২৬ ॥ 'তরুণের বিদ্রোহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।

২৭ ॥ 'সত্য ও মিথ্যা', শ. সা. স, নবম সম্ভার, পৃ. ৩৭৭।

২৮ ॥ ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬।

২৯ ॥ 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য', (১৯৩৮), পৃ. ৬৮

কংগ্রেস আন্দোলন সৃষ্টিধর্মী ছিল না। সমাজের মূল প্রবাহের সঙ্গে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আন্দোলন চলেনি। কারণ গান্ধীবাদী কংগ্রেসী আন্দোলন মূলত পরিচালিত হয়েছিল দেশীয় স্বার্থবাদী বণিকশ্রেণীর দ্বারা। গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র উপরোক্ত কারণে গান্ধীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, "তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলি-জমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্ব্বলতা অস্বীকার করা চলে না।" ('বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', শ. সা. স., চতুর্থ সম্ভার, পৃ. ৩৯৮)।[৩০] নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে তারা কখনো জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়েছে। আবার কখনো জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে এগোতে চাইলে তাদের ছলে-বলে-কৌশলে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের চরিত্র বদলের সাধনা ছিল গান্ধীর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বড় কথা ছিল না।—স্বাধীনতাযোগ্য মানুষ তৈরি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। হিতবুদ্ধি-জাগ্রত অহিংস ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য সফল করাব উপায়। কিন্তু অচেতন জনগণ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। চৌরি-চৌরায় জনগণের তথাকথিত হিংস্র, অস্থির মূঢ়তা দেখে তিনি সতর্ক হলেন। ভারতবর্ষেব পববর্তী আন্দোলনগুলিতেও ঐ একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও জনসাধারণের বৃহৎ শক্তি ও একতার আধাব রূপে আন্দো-লনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং "ভারতেব জনগণের সংগ্রামী প্রকৃতি, শক্তি, মনোবল, সবই ছিল সন্দেহাতীত রূপে সুপরিণত, শুধু সংগঠিত বিপ্লবী নেতৃত্বের

৩০॥ পরবর্তী কালে মার্কসবাদী আলোচকরা কংগ্রেসেব শ্রেণীচরিত্র আরও স্পষ্টভাবে উদঘাটিত করেছেন। যেমন, "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া-ছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম চালানো অসম্ভব বুঝিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী সে সময় উহার নিজস্ব সংগঠনে যোগদান করিবার জন্য অন্যান্য শ্রেণীকেও আহ্বান করিতে বাধ্য হয়। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায় জাতীয় সংগ্রামের অংশ হিসাবেই নিজ নিজ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তাহা স্বভাবতই বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব তাহাতে ভীত হইয়া কয়েকবার সংগ্রাম বন্ধ করে এবং সাম্রাজ্য-বাদের সহিত আপসরফা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।" —সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, (১৯৭০), পৃ. ৯।

অভাবে সেই বৈপ্লবিক গণশক্তির অভ্যুত্থান বিপ্লব-বিরোধী গান্ধী-কংগ্রেসের সমর্থনে একটা বিরাট অন্ধ গণবিক্ষোভ মাত্রে পর্যবসিত হল এবং বৃটিশ সরকারের অবাধ, বেপরোয়া নির্যাতনে ব্যর্থ হল।'[৩১] সুভাষচন্দ্র বসুও কংগ্রেসের চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্দোলনগুলির স্বরূপ ও ব্যর্থতার কথা বলেছেন।[৩২]

শরৎচন্দ্রের মতেও কংগ্রেস ছিল একটি বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এর চরকাপ্রীতি তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল না। গান্ধী শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, "But why don't you belive that the attainment of Swaraj will be helped by spinning?" উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "I think attainment of Swaraj can only be helped by spiders." তবে 'বয়কটে' তাঁর আস্থা ছিল। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল তরুণদের শক্তির ওপর।[৩৩] সাধারণভাবে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার উগ্রতার বিরোধী; কাজেই 'বয়কট' তাঁর পছন্দ নয়। তিনি স্বরাজ বলতে মানুষের মনের মুক্তি বোঝেন এবং কাপড় পোড়ানোর সঙ্গে স্বরাজের কোনো সম্পর্ক দেখতে পাননি। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই 'বয়কটে' রাজনীতি দেখতে পাচ্ছেন এবং সমর্থন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে পছন্দ করতেন না। শরৎচন্দ্রের অবিচল প্রত্যয় ছিল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের প্রতি, "এই ভারতবর্ষের এত দেশ এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এতবড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ করা জীবন আর কই?" বাংলাদেশের সংবাদপত্রে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে নানা রকম তীব্র সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন,

৩১॥ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিপ্লবের সন্ধানে', (১৯৬৭), পৃ. ৩৩৩।

৩২॥ সুভাষচন্দ্র বসু, 'মুক্তির সংগ্রাম ১৯৩৫—১৯৪২', অনুবাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (১৯৫৩), পৃ ৭।

৩৩॥ "নানা অসম্মানে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস বৃটিশ পণ্য বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, সঙ্কল্প তাদের সিদ্ধ হোক। বাঙলার তরুণের দল, এই সংঘর্ষে তোমরা তাদের সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। কিন্তু অন্ধের মত নয়, মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়, কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করে বেড়ালেও নয়। ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশী ক্রোর টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না, গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না। বিশেষত সম্প্রতি এটা অর্থ নৈতিক বিবাদ নয়, রাজনৈতিক বিবাদ। ...এ ব্রত উদযাপন করাই চাই। বাঙলাদেশে এই ব্রত অজানা নয়।" —'তরুণের বিদ্রোহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

"এই সাধারণ মানুষটি তাঁহার জীবদ্দশায় কতখানি দেশোদ্ধার করিয়া যাইবেন, তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু যে অসাধারণ চরিত্রখানি তিনি দেশবাসীর অনাগত বংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহা তার চেয়েও সহস্রগুণে বড়।"[৩৪] ঠিক এমনি একটি অসাধারণ চরিত্র করে তিনি সব্যসাচীকে এঁকেছেন।

শরৎচন্দ্র নিজে জনগণের শক্তিতে আস্থা রাখেননি।[৩৫] অসহযোগ সফল হবে এমন একটা ধারণা শরৎচন্দ্র আন্দোলনের প্রথম দিকে রেখেছিলেন। কিন্তু অসহযোগ ব্যর্থতার দিকে এগোলে একটা হতাশার বোধ থেকে তিনি যে শক্তির সম্ভাবনাকে মনে মনে স্বীকার করলেন তা হচ্ছে সন্ত্রাসপন্থা। এর একটি কারণ সন্ত্রাসবাদী নেতারা এবং কর্মীরা সকলেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আর দেশকে যে এরা প্রাণাধিক ভালোবাসতেন সে প্রমাণ তাঁরা অনেকেই প্রাণের বিনিময়ে দিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী হয়েও তরুণ শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মনের আবেগকে চিনতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের যে গর্বোদ্ধত ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তা সঞ্চারিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদে।[৩৬] হতাশাগ্রস্ত, জনগণের বৈপ্লবিক শক্তিতে অবিশ্বাসী, প্রায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন এই সন্ত্রাসবাদ।[৩৭] সন্ত্রাসবাদ

৩৪ 'দিন কয়েকের ভ্রমণকাহিনী', শ. সা. স, দশম সম্ভার, পৃ. ৩৫৭।

৩৫ "…অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা ত গণসাধারণ, অর্থাৎ mass-এর জন্য? কিন্তু এই পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু করে' ফেলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ দিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সে বার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে ফিরেও এসেছিল; যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কেউ কোনদিন যদি দেশ স্বাধীন করতে পারে, ত শুধু এরাই পারবে।" --'স্মৃতিকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

৩৬। এ বিষয়ে একজন সাম্যবাদীর অভিযোগ, "এই আন্দোলনের ফিলসফি হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' এবং অন্যান্য লেখা। তাই এই বিপ্লব আন্দোলন হলো হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলন।" —মুজাফফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (১৯২০—১৯২৯), , পৃ. ৪৩২।

৩৭ "কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ও আপসের মনোভাবের ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহারা নিজস্ব পন্থায় এক বিশেষ প্রকারের সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে। মধ্যশ্রেণী-

ছিল অনেকটা রোমান্টিকধর্মী।[৩৮] তরুণ প্রাণ এমনিতেই রোমান্টিক এবং আদর্শবাদী। তার ওপর সে প্রাণে প্রভাব পড়েছিল রাজনৈতিক হতাশা আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার। সব রোমান্টিক সাহিত্যের মতো এ আন্দোলনের যে প্রধান দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল তা হচ্ছে ব্যক্তির মন এর উৎস, জনসমষ্টি নয়। তবে সন্ত্রাসবাদী তরুণেরা তাদের সমর্থক হিসাবে তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'জন সাহিত্যিক বন্ধুকে পেয়েছিল — একজন হলেন 'ধূমকেতু'র নজরুল ইসলাম[৩৯] এবং অন্যজন শরৎচন্দ্র।[৪০]

সুলভ ভূম্যধিকারীর মনোবৃত্তির ফলে তাহারা শ্রমিক কৃষককে বৈপ্লবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলেই তাহারা তাহাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হিসাবে সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।" —সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৩৮ "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রোমাঞ্চ ছিল, দেশের জন্যে একটা প্লাটোনিক প্রেমও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভিতরে বেড়ে উঠেছিল।" মুজাফফর আহ্‌মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।

৩৯ "অসহযোগ আন্দোলনের চাপে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, নজরুল তাকেই আবার পূর্ণ-জ্যোতিতে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন। নজরুলের বরাবরই সন্ত্রাসবাদের প্রতি আন্তরিক টান ছিল। যুগান্তর ও অনুশীলনী দলের সন্ত্রাসবাদীরা 'ধূমকেতু'কে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।" —সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল চরিত মানস', (১৩৬৭), পৃ. ৬৫।

৪০ চারুবিকাশ দত্ত ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-দের অন্যতম। তিনি লিখেছেন, "শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'··· আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন চট্টগ্রামের বিদ্রোহী নেতা সূর্য সেন ও আমি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের গ্রেপ্তার এড়াইয়া পলাতক জীবন যাপন করিতেছি। সেই সময় আমি, সূর্যবাবু, নগেন সেন, হরিনারায়ণ চন্দ শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানায়। চট্টগ্রামের দুইটি যুবক কর্মী বিনয় সেন ও প্রমোদ চৌধুরী (পরবর্তীকালে আলিপুর জেলে গোয়েন্দা হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত) আমাদের সঙ্গে আছে। 'পথের দাবী'-র সব্যসাচীর চরিত্র ও জীবন আমাদের সেদিনের পলাতক জীবনের উপরে গভীর রেখাপাত করে।" তিনি আরও লিখেছেন, "পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমরা যখন ইহার গুণাগুণ লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত হইতাম তখনও সূর্যবাবুর ধ্যান ভাঙিত না। সব্যসাচীর বিপ্লবী চরিত্রের এই অনুধ্যান করিতে সূর্য সেনকে সেদিন

"দেশের যৌবনশক্তি পথের খোঁজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই।"[৪১] শরৎচন্দ্রের এমন ঘোষণার সাহিত্যিক সূচীপত্র হল 'পথের দাবী'। রবীন্দ্রনাথ 'পথের দাবী'-র তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সরকার কর্তৃক উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে তাঁর যুক্তি ছিল, "তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত…"। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল 'গল্পচ্ছলে' দীর্ঘ প্রভাবক্ষম রাজবিরুদ্ধ কথা লেখাতে। তিনি ঐ চিঠিতে 'পথের দাবী' উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবে আদপেই বিচার করেননি, সে পথ দিয়েই যাননি, একে নিয়েছেন উত্তেজক রাজ-সমালোচনা রূপে। এ থেকে বইখানির তৎকালীন পটভূমিতে যে বিপুল আবেদন ও প্রতিক্রিয়া তা বুঝতে পারা যায়।

শরৎচন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় তাঁর দুই পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো সবল ছিলেন না। গল্পের বাইরে তাঁর জোরালো কোনো বক্তব্য নেই। তবু শরৎচন্দ্র বলেন, "বঙ্কিমের ন্যায় অত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথাসাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে' আবার 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী, 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন প্রয়োজন তার হয়েছিল? কারণ, এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বকায় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না।"[৪২] এই উক্তির মধ্যে যে বক্রার্থ আছে তা কথাসাহিত্যে তত্ত্বের উপস্থিতির সমর্থক। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা কোনো গভীর বক্তব্য পাই না। অন্যদিকে যে রবীন্দ্রনাথ 'গল্পচ্ছলে' তত্ত্বপ্রচার অপছন্দ বলে জানিয়েছেন তাঁর গল্পে বরং আমরা শরৎচন্দ্রের তুলনায় বক্তব্য-বাহুল্যই লক্ষ্য করি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এই সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যে সেই সমস্ত তত্ত্বের উপস্থিতি অপছন্দ করেছেন যে সমস্ত তত্ত্বের তিনি বিরোধী। তিনি সন্ত্রাসবাদ অপছন্দ করেন বলে সন্ত্রাসবাদী কথাসাহিত্যকেও অপছন্দ করেন। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্র যদিও সাধারণভাবে বক্তব্যপ্রধান গল্প বলতে অনভ্যস্ত তথাপি তিনি যেহেতু সন্ত্রাসবাদের সমর্থক তাই এই বিশেষ ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যে তত্ত্বকথার উপস্থাপনারও পক্ষপাতী। প্রয়োজনই মত ও অমত, সমর্থন ও অসমর্থনের জন্মদাতা।

দেখিয়াছি।" উদ্ধৃত. হরপ্রসাদ মিত্র, 'তারাশঙ্কর', (১৩৬৮), পৃ. ৭৬-৭৭।

৪১॥ 'সত্যাশ্রয়ী', শ. সা স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩৪৩।

৪২॥ 'স্বদেশ ও সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

সমাজ-অননুমোদিত তথাকথিত নিষিদ্ধ প্রেমে শরৎচন্দ্রের সমর্থন অকুণ্ঠ। প্রেমের ক্ষেত্রে দৈহিক শুচিতার প্রশ্নের চেয়ে মানসিক নিষ্ঠার মূল্য ছিল তাঁর কাছে অধিক। যে প্রেম কল্যাণকামী এবং উপায়হীন তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে শরৎচন্দ্রের মানসে একটা বিদ্রোহী প্রবণতা এনে দেয়। দেশপ্রেমের প্রতিও তাঁর অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দেশপ্রেমও নিষিদ্ধ প্রেমের মতোই অবৈধ, বেআইনী এবং তাই বিদ্রোহাত্মক, উত্তেজক ও সমর্থনীয়। বলা বাহুল্য এ দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে পরিণত-বয়স্ক-মনস্কতার কিছুটা অসদ্ভাব আছে। তিনি দেখেছেন নিষিদ্ধ প্রেমের পাত্রপাত্রী সমাজের হাতে লাঞ্ছিত আর দেশপ্রেমিকরা লাঞ্ছিত সরকারের হাতে. উভয়েরই পথে বাধা দুস্তর। "যার যা' দাবী তাকে তা পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক"[৪৩] —শরৎচন্দ্রের এই উচ্চকিত ঘোষণা তাঁর মতে সর্বত্র প্রযোজ্য —যেমন ব্যক্তিপ্রেমিক অপূর্ব-ভারতীর ক্ষেত্রে, তেমনি দেশপ্রেমিক সব্যসাচীর ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের একমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত পুরুষ চরিত্র। ঐ সমুন্নত বিশালতা এবং দৃপ্ত বলিষ্ঠতার রহস্য সম্ভবত তার বিদেশী রক্তে। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী পৌরুষ দীপ্তিতে গোরার নিকটতম সহচর। এই ধরনের চরিত্র যে নিতান্ত অবাঙালী তা প্রমাণিত হয় এই সত্য দ্বারা যে, গোরার পিতামাতাকে রবীন্দ্রনাথ আয়ারল্যাণ্ড থেকে খুঁজে এনেছেন এবং শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর পিতামাতাকে খুঁজেই পাননি। সব্যসাচীর স্বয়ম্ভু চরিত্রটি শিল্পবিচারে অনেক দুর্বলতার পরিচয়বহ, কিন্তু প্রেরণাবাহী। ধর্ম মতের বিবর্তনই গোরার মতবাদের পালাবদলের রহস্য। উনবিংশ শতকের বিদেশী শিক্ষার শ্রেষ্ঠদানের ফলে বাংলাদেশে সমাজাশ্রয়ী চেতনায় যে সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলি চলছিল তার গণ্ডীবদ্ধতা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঐভাবে গোরাকে ধর্মমুক্ত করেছেন। চিত্তের প্রসারতা সত্ত্বেও চাই ধর্মের সংস্কারমুক্তি এবং সংস্কারমুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। না হলে বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষকে শুধু অন্তর দিয়ে ভালোবাসলে এর অংশত সেবা করা যায়, পরিপূর্ণ রূপে নয়। সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের দাস্যতাই ছিল গোরার মুক্তির পথে প্রধান বাধা। কিন্তু সব্যসাচীর বাধা ধর্মমতের নয়। গোরা মুক্তি চাচ্ছিল সংস্কারের কারাপ্রাচীর থেকে, সব্যসাচী স্বাধীনতা চাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী অধীনতা থেকে। গোরা অন্বেষণ করছিল সঠিক পথ, সব্যসাচীর অন্বেষা নেই, অভীপ্সা আছে। পথ তার বেছে নেওয়া হয়ে গেছে। তার মতে ঐ একটি মাত্র পথ খোলা আছে তার আদর্শ পূরণের জন্য, সে পথ সশস্ত্র সন্ত্রাসের। গোরার আদর্শের বিবর্তন আছে, সব্যসাচীতে বিবর্তন নেই, আছে স্থির প্রত্যয়।

চরমপন্থী সব্যসাচীর স্বর প্রথম থেকে শেষ অবধি উঁচু সুরে বাঁধা। অনমনীয়

৪৩॥ 'স্বরাজ সাধনায় নারী', শ. সা. স., দশম সম্ভার, পৃ. ৩২৭

তেজস্বী সঙ্কল্প, অহমিকাহীন কোমল-কঠোর ব্যক্তিত্ব, উৎসর্গীকৃত জীবনের অনাবিল শুভ্রতার সঙ্গে লেখকের সহানুভূতির সমন্বয়ে সব্যসাচী এমন একটি ভাবাবেশ সৃষ্টি করে যা অনুভূতিস্পর্শী। তার মতে ও পথে ভ্রান্তি আছে কিনা সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা তার মধ্যে দেখা যায় না। সংশয়হীন সব্যসাচী নিজস্ব মতবাদকে কর্মে রূপ দিতে সক্রিয়। তার আদর্শ এবং কর্মে কোনো বিবাদ নেই, —তারা একাত্ম।

উপন্যাসটি সব দিক দিয়েই প্রায় নির্দ্বন্দ্ব। ভারতীর প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, বাধা যা আছে তা অপূর্বের কুসংস্কারজাত। ভারতী এবং সব্যসাচীর মতভেদে তর্ক আছে, সংঘাত নেই। মতানুবর্তিতায় স্বাধীন চরিত্রের ওপরে কেউ কারুর মতবাদের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে না। সব্যসাচীর কাছে বড় কথা, দেশের চেয়েও দেশের স্বাধীনতা। গোরার পাথেয় হল উদার চিত্তের স্বরাজ্য। সব্যসাচী গোরার মতো নিরাকার চিত্তশক্তিটুকু সম্বল করে চলতে পারে না, তার দেশকাল জটিল, সে নিজে ধর্মের ঊর্ধ্বে হলেও দেশকে নিজের মতো করে চাওয়া পাওয়ার ভেতর দেখতে পায় দুস্তর বিঘ্ন। গোরার ভারতবর্ষ ধর্মীয় বিভেদে বিভক্ত। গোরা ঐ ভেদসমন্বিত ভারতবর্ষকে একটা বিশাল ঐক্যে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছে তার ভারতবর্ষের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে। সব্যসাচী তার যুগে দেশের মধ্যে একটা ঐক্য দেখতে পেয়েছে খুব স্পষ্টভাবেই — সে ঐক্য শৃঙ্খলের, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা ভারতবাসীকে হৃদয়ে ধারণ করেই সে বলছে, "আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, —পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটি মাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ, —এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই।"[৪৪]

সব্যসাচীর বোঝাপড়া অন্তরের সঙ্গে নয়, বহিঃশক্তির সঙ্গে। সে শক্তি অপরাজিত রাজশক্তি।[৪৫] যেমন শক্তি তেমনি হতে হবে প্রতিবন্ধের উদ্‌যোগ। দেশবিদেশে গুপ্ত সমিতি সৃষ্টি করা এবং সিপাহীদের দলে টানা তার গোপন কার্যসূচীর প্রধান অংশ। সব্যসাচীর কর্মময় জীবন যতই আবছা হোক না কেন কখনোই তা উদ্যম এবং উদ্দেশ্যহীন নয়। কোথাও কোনো ক্লান্তি বা সংশয়

৪৪॥ 'পথের দাবী', শ সা. স., ত্রয়োদশ সম্ভার, পৃ. ২৩৩।

৪৫॥ ভারতী প্রশ্ন করছে, "এতবড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো এ কি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর দাদা? দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাকলে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্ব্বেই ভেঙে যেত" (২৩৯-৪০)।

ছায়ামাত্র ফেলতে পারেনি —কারণ সে মৃত্যুভয়হীন সন্ত্রাসবাদী, নির্দিষ্ট তার লক্ষ্য। বিপ্লবপন্থার কথা বলতে যেয়ে সব্যসাচী বলছে, "আপনাকে ভোলাবার অনেক রাস্তা আছে ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌঁছবার আর দ্বিতীয় পথ নেই" (১৯৩)। ভারতের স্বাধীনতাকে বৃহৎ করে দেখাব মধ্যেও সব্যসাচীর মহত্ত্ব আছে। শবৎচন্দ্র হৃদয়-প্রধান লেখক। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় ব্যক্তি স্বাধীনতার ও অর্থনৈতিক বিঘ্নকে তিনি দেখেছেন মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনার কারণ রূপে। সব্যসাচীব কথায়, "আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এত বড পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন। যদি পারো দেশের নরনারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও" (১৭৪)। শ্রমজীবী আন্দোলন পরিচালনার এবং শ্রমিকসেবা-সংঘ রূপে 'পথের দাবী' নামক প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু। শেষ পর্যন্ত এ সমিতিতে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের দেখা গেলেও, "মানুষেব মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকাব দাবী অঙ্গীকাব কবে—সকল বাধা ভেঙে চুরে" চলাই ছিল এর আদর্শ।

আংশিকতা দোষে দুষ্ট সব্যসাচীর শিল্প রূপ। সব্যসাচীকে শবৎচন্দ্র একটা স্পষ্ট ও পূর্ণ মূর্তি দেননি, যেমন দেননি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মহাপুরুষকে। সব্যসাচী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কিন্তু সামন্তবাদ-বিরোধী নয়। অথচ আমরা দেখেছি শত্রু শুধু সাম্রাজ্যবাদ নয়, সামন্তবাদও। সামন্তবাদকে অক্ষুণ্ণ রেখে সাম্রাজ্যবাদকে হটিযে দেওয়া সম্ভব নয়, কেন না সামন্তবাদ দেশের অধিকাংশ মানুষকে, অর্থাৎ কৃষককে পঙ্গু ও দুর্বল করে রাখে। এবং সামন্তবাদী মূল্যবোধ মানসিকভাবে বন্দী করে রাখে এমন কি শিক্ষিত মধ্য বিত্তকেও। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা এইখানে যে, তা সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী ছিল কিন্তু সামন্তবাদ বিরোধী ছিল না। সব্যসাচীব ফ্যাসিষ্টসুলভ আচরণও সামন্ত-চেতনারই পরিচয় বহন করে।

বরঞ্চ অপূর্বকে 'পথের দাবী'-র নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলে কাহিনী ও চবিত্র-চিত্রণ দুই-ই উপন্যাসযোগ্য হত। পবাধীনতার জ্বালায় অপূর্বর মর্মমূল পর্যন্ত আলোড়িত হয় বিশেষ করে যখন তাকে অধীন জাতি হিসাবে অহেতুক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কিন্তু অপূর্ব ভদ্র, ভীরু বাঙালী যুবক। বাংলার বাইরে প্রবাসী এই যুবক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মায়ের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের বিশ্বাস দিয়ে যেন একটা বর্মের আড়ালে নিজেকে রেখেছে। পরাধীনতার বেদনায় জ্বলতেও তার দেরী হয় না, অক্ষমতার জন্যে সে জ্বলে-ওঠা প্রেরণা থামিয়ে দিতেও বিলম্ব হয় না। প্রেমিক হিসাবে অপূর্ব মানানসই কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হিসাবে একেবারেই বেমানান। পরে সংস্কারমুক্ত হয়ে অপূর্ব দেশসেবার যে পথটি

খুঁজে নিল সেটি তার স্বভাবযোগ্য। পরনির্ভর, ভীরু, সচ্চরিত্র এই চরিত্রটির বরং একটি বিশ্বাসযোগ্য বিবর্তন দেখানো হয়েছে। শেষ পযন্ত তার মতামতের, তা যতই ক্ষীণস্বরের হোক না, একটা ধারাবাহিক পারম্পর্যরক্ষাকারী বিবর্তন চিত্র দেওয়া হয়েছে।

অপূর্বের সঙ্গে চেতনগত মিল রয়েছে 'শ্রীকান্ত'-এর ব্রজানন্দের। ব্রজানন্দ সন্ন্যাসী এবং ডাক্তারী পাশ করা চিকিৎসক। সর্বোপরি সে সচেতন দেশ-প্রেমিক। কেবলমাত্র শোষণের জন্যই যে, "...তেত্রিশ কোটী নরনারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীব শাসন-তন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে" (শ. সা স, তৃতীয় সম্ভার, পৃ. ১০০) —এ সত্যটা সে জানে এবং প্রচারও করে। ধন সম্পদের মোহ ত্যাগ করে এই বর্ণহিন্দু উচ্চবিত্ত ব্যক্তি জনসেবায় নিয়োজিত হয়েছে। নিম্নবিত্তের পক্ষে অমন ত্যাগধর্ম সম্ভব নয়। 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশের মতো ব্রজানন্দও বহিরাগত। কিন্তু প্রভেদ হচ্ছে এই যে, ব্রজানন্দ যে-রীতিতে গ্রামের মঙ্গল সাধন করছে সেই রীতির সঙ্গে গ্রামের কারুর বিরোধ হবার কথা নয়। এব মূল কারণ ব্রজানন্দের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। তার ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তিও নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা না-থাকা যে মানুষের মত ও পথকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার তাত্ত্বিক চিন্তা শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোথাও দেখি না। যদিও থাকা না-থাকার বাস্তব প্রতিক্রিয়া এখানে এবং সব্যসাচীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীনতার মধ্যেও নীরবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। মানুষের শ্রেণীচ্যুতিতে ও ব্যক্তি সম্পত্তির অবসানে শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু দেখছি যে, তাঁর লেখায় সম্পত্তিবানরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অক্ষুন্ন রেখে রাজনীতি করছে না। ব্রজানন্দও রাজনীতি বিবর্জিত হয়ে যেত যদি সে ধন সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করে না আসতে পারত। এমন ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে —তাত্ত্বিক শরৎচন্দ্রকে ফাঁকি দিয়ে শিল্পী শরৎচন্দ্রের অবচেতন মন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অক্ষুন্ন রেখে যে রাজনীতি করা যায় না —এই সত্য শরৎচন্দ্র প্রচার করতে চেয়েছেন। ব্রজানন্দকে সব্যসাচীর পূর্বপুরুষ ভাবতে পারা যেত যদি তার মধ্যে থাকত সন্ত্রাসবাদী চেতনা। ববং ব্রজানন্দের সঙ্গে অপূর্বর চেতনাগত মিল রয়েছে। এরা উভয়েই সেবা ধর্মে নিয়োজিত। ব্রজানন্দ যেন এই সত্যটাই তুলে ধরতে চেয়েছে যে, ব্রজানন্দের স্রষ্টা সামাজিক বিপ্লবে বিশ্বাস করেন না। শ্রীকান্তরা ডাক্তার চায়, সমাজ বিপ্লবী নয়।

'পথের দাবী'-র অপূর্বই হতে পারত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তা হল না কারণ অপূর্বর অসমর্থ সৌখিন দেশসেবার পশ্চাদ্‌ভূমিতে শরৎচন্দ্র স্থাপন করেছেন কঠিন সব্যসাচীকে। দু'জনেই মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী। অথচ দু'জনের পার্থক্য দুস্তর। অপূর্ব সাধারণ বাঙালী চরিত্র, দেশপ্রেম সত্ত্বেও যারা থাকে খাঁটি স্বার্থপর গৃহস্থ। শরৎচন্দ্র অপূর্বদের পারিবারিক জীবনের

আচার-বিচার ছুৎমার্গের উন্নাসিকতা নিয়ে রচনা করতে পারতেন নিটোল বাঙালী গার্হস্থ্য উপন্যাস, কারণ এ রকম আচার-অনাচারের সংঘর্ষে ধূমায়িত, নিভৃতচারী গার্হস্থ্য জীবনে তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী। কিন্তু তাহলে দেখাতে পারতেন না সব্যসাচীকে। তিনি শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন সব্যসাচীর অদম্য বাসনার প্রতি, যে দুর্দম আকাঙ্ক্ষা সর্ববিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সব্যসাচী সংরক্ষণ করে চলেছে তার প্রতি। অপূর্বর পাশে সব্যসাচী সত্যিই অতিমানব, যেমন অন্ধকারের পটভূমিতে আলো, যেমন মহিমের পাশে গোরা। সব্যসাচী ইস্পাতের তলোয়ার, ভেঙ্গে যাবে কিন্তু মরচে ধরবে না তার গায়ে। বাংলার বুকে কেমন করে এমন কাঠিন্য সম্ভব হল তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি শরৎচন্দ্র। এ জন্য বাংলার বাইরে সব্যসাচীকে নিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি ভারতীকে দিয়েই যেন সব্যসাচীর খণ্ডিত চরিত্র-চিত্রণের কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, "যে নির্মম, একান্ত দৃঢ় চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধানতার অনির্বাণ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহমন অহর্নিশি শিখার মত জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে ?"(২৮৪)। সব্যসাচী গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত বাঙালীর কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিহিংসার ইচ্ছা, ব্যর্থতাবোধ এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রবলতা দিয়ে।

'পথের দাবী'তে দরিদ্রদের জন্য স্কুল, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে দরিদ্র-সেবা এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করে তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া তুলে ধরে শ্রমিক আন্দোলন করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এ দিকটার ভার নিয়েছে সুমিত্রা ও ভারতী। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই সেবা-সংগঠনের উৎস। সব্যসাচী শ্রমিক-দের মজুরী-বৃদ্ধির ধর্মঘটে আস্থাশীল নয়। তার মতে এগুলো এক রকম অসফল অসহযোগই। প্রবল ধনী মালিকের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে কাজ না করলে নিঃসহায় শ্রমিকের ক্রোধের দাবী মেনে নেয় না মালিকরা। দারিদ্র্যের জ্বালায় অনন্যো-পায় হয়ে পুনরায় তাদের পদানত হতে হয় প্রবলের শক্তির কাছে। তাহলে সব্যসাচীর মজদুর প্রীতির কারণ কি? সব্যসাচীর প্রেরণা আর মজুরদের প্রেরণার উৎপত্তি স্থল একই। সে বলেছে, "এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দারিদ্র্যের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ...একটা কিছু অবলম্বন তার চাই —চাই সেই ত আমার অবলম্বন" (২৩২)। ভারতী উপলব্ধি করল, "এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সৎপথে আনিবার উদ্যম, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে নৈশবিদ্যালয় —ইহার সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে সব্যসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই। পরাধীন দেশের

মুক্তিযাত্রার আবার পথের বাচ-বিচার কি ?"(২৬৯-৭০)। সব্যসাচী এ কথা জানে যে, ব্যক্তিগত সেবা দিয়ে কুলিমজুরদের ভালো করা যায় না, "এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, এই তার বর, এই তার অভিশাপ" (২৪৯)। সব্যসাচী অবশ্য বিপ্লব বলতে সন্ত্রাসবাদী কাযকলাপকেই বুঝিয়েছে, অন্য কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে শশীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায়। শশী একজন ভব-ঘুরে, ছন্নছাড়া বেহালাবাদক। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে কবি এবং সব্যসাচীর একনিষ্ঠ ভক্ত। সব্যসাচী শশীপদ ভৌমিককে অনুরোধ জানিয়েছে সামাজিক বিপ্লবের জয়গান করতে।[৪৬] সে শশীকে জানিয়েছে যে, এই বিপ্লবগাথা রচিত হবে শুধু 'শিক্ষিত ভদ্রজাতের জন্যেই' (২৫৮)। শরৎচন্দ্র অশিক্ষিতদের জন্য 'অন্নসত্রের' ব্যবস্থা দিয়েছেন, অশিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য নয় বলে সব্যসাচীকে দিয়ে তিনি রায় দিয়েছেন, "অশিক্ষিতদের জন্য অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ তাদের ক্ষুধাবোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেষণ করা যাবে না" (২৫৭)। তাঁর মতে দরিদ্রদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা তুলে ধরলেই তাদের সাহিত্য হয় না। লাঙ্গলধারী নিজেই গাইবে লাঙ্গলধারীর গান।[৪৭] তাহলে কি গাইবে শশীপদ ? সামাজিক বিপ্লবের যে ব্যাখ্যা শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তা হচ্ছে, যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত ভেঙ্গে চূর্ণ ধ্বংস হয়ে

৪৬॥ সব্যসাচীর কথায়, "ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানব জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথায়" (২৩৬-৩৭)।

৪৭॥ মুজাফ্ফর আহ্মদ তাঁর কাজী নজরুল প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা'য় এ বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "শরৎচন্দ্র তো কয়েকটি শব্দের সন্নিবেশ মাত্র করেছিলেন, কিন্তু একটি সময়ের শিক্ষিতদের চিন্তা-সূত্রের পরিচয় তাতে পাওয়া যায়" (১৩৬৬), পৃ. ১২৮। অনেক বুদ্ধিজীবীর ধারণা হয়েছিল যে, শশীর প্রতি সব্যসাচীর নির্দেশ আসলে কবি নজরুলের প্রতি আদেশ। এ নিয়ে অনেক লেখালিখিও হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে কোনো কৈফিয়ৎ দেননি যে এটা সত্যিই নজরুলের প্রতি তাঁর নির্দেশ কিনা।

যাক —আর কিছু না পারো শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে দাও —এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই —তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার মাথায়" (২৫৮)। অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। অথচ ইতিবাচক ও নেতিবাচকের সমন্বয়ে ধ্বংস ও গঠন একই না করলে কোনো বিপ্লব সার্থক হতে পারে না।

সব্যসাচী বর্ণাশ্রম প্রথাকে ঘৃণা করে কিন্তু 'শিক্ষিত অশিক্ষিতের জাতিভেদ' না মেনে পারে না। তার মতে "এই ত সত্যকার জাতি, —এই ত ভগবানের হাতে গড়া সৃষ্টি" (২৫৮)। শিক্ষিতের অনাবিল মানস কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে, ধর্মবিভেদ সেখানে কার্যকরী হয় না, তাই কি সব্যসাচী স্বশ্রেণীর পক্ষে কথা বলছে? ভারতী খ্রীষ্টান হয়েও যে জন্য খ্রীষ্টান সভ্যতা-বিরোধী সব্যসাচীর সবচেয়ে আপনজন। অথচ সব্যসাচী শিক্ষিত অপূর্বকে দেখেছে, সে তার শ্রেণীরই লোক। বিদেশী-শিক্ষাপ্রাপ্ত সব্যসাচী দেশীয় শিক্ষায় বিন্দুমাত্র আস্থা রাখে না (২৪৪) অথচ মজুরদের শিক্ষা দেবার উদ্যমও তার আছে।[৪৮] কিন্তু কি যে সেই শিক্ষাবিধি তা জানা যায় না। জানা যায় না পথের দাবী সমিতির শেষ পরিণতি কি হল? কথা হচ্ছে এই যে, পাঠকেরও সে সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে না! সেই কঠিন পথ ঠিক করবার ভার যার ওপরে, অসাধারণ সে চরিত্রটির অন্তর্ধানের সঙ্গে অন্য চরিত্রগুলিও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তাই সন্ত্রাসের হিংস্রতা ও কূটকৌশলের ফাঁকে যে আবেদনময় প্রেমকাহিনী গড়ে উঠেছিল, যার প্রতি আমাদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে সে কাহিনীরও একটা পরিণতি দেখানো হয়েছে সব্যসাচীর বিদায়-দৃশ্যের আগেই।

সব্যসাচী 'পথের দাবী'র বহিঃশক্তি। সে শক্তি প্রচণ্ড ঝড়ের মতো তীব্র, যতক্ষণ বয় ততক্ষণ তার উপস্থিতি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকে না। অথচ সে কাউকে দলে জোর করে টেনে নেয় না। সন্ত্রাসবাদী দলের একটা প্রধান কাজ হওয়া উচিত নতুন সদস্য সংগ্রহ করা। সেই কাজ দেখানো হচ্ছে না। অপূর্ব অন্য ধাতুতে তৈরী, তার পেছনে সময় নষ্ট হচ্ছে। এ পথে যে আসে সে

৪৮॥ তুলনীয়: "যে-শিক্ষা সভ্যজগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষা বিস্তার গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না। করতে মানা আমি করিনে, কিন্তু এখানে একটা **night school** আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর"। 'তরুণের বিদ্রোহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬। দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্যমে শিক্ষা দেবার নিষ্ফল প্রয়াস সম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন কিন্তু 'পথের দাবী'তে ব্যক্তিগত উদ্যমে শিক্ষা বিস্তারের চিত্র আছে।

স্বপ্রণোদিত হয়েই আসে। দেশ সম্বন্ধে দেশের লোকের প্রবুদ্ধ মনেই সব্যসাচীর কাজ। আরও বলা যায় সব্যসাচী হিন্দু বাঙালী জাতীয়তাবাদী চরিত্রের প্রতীক —কর্মক্ষেত্র বর্মা। হিন্দু সহকর্মী ভারতবর্ষের নানা স্তরের নানা জায়গার। কাম্য ভারতের স্বাধীনতা, কিন্তু এই সর্বভারতীয় সব্যসাচী মনেপ্রাণে বাঙালী হিন্দু, বাঙালী জাতীয়তাবাদী। সমস্ত পৃথিবী ঘুরেও সে বাংলা ভাষার মতো মধুর ভাষা শোনেনি। সব্যসাচী বলেছে, "শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খৃষ্টানের নয়, শুধু আমার বাঙলা দেশের কবি। সহস্র নদ-নদী প্রবাহিত আমার বাঙলা দেশ, আমার সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা মাঠের পরে মাঠে ভরা বাঙলা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের দুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্বহীনতার লাঞ্ছনা নেই, তুমি হবে শশী, তারই চারণ কবি" (২৬৪) —এ উক্তি মনে প্রাণে বাঙালী সব্যসাচীর।

সাম্প্রদায়িকতা এতদঞ্চলের রাজনীতির একটি প্রধান ও নিয়ামক শক্তি। সব্যসাচীর মনে মুসলমানদের নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। সে যে বাংলাদেশের মুক্তির চিন্তায় বিভোর সেই বাংলার বেশী অর্ধেক অধিবাসী মুসলমান। "মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কিনা। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পাবে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে"[৪৯] —এ বক্তব্য শরৎচন্দ্রের নিজের। লিখেছিলেন যখন তার কিছু আগেই তিনি সৃষ্টি করেছেন সব্যসাচীকে। অথচ বাঙালী মুসলমান শরৎচন্দ্রকে তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক বলে মনে করেছে। হিন্দুরাও তাঁকে জানত মুসলমান-বন্ধু রূপে। শরৎচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "দেশবন্ধু বলিলেন, 'আপনাব মুসলমান-প্রীতি অতি প্রসিদ্ধ।' ভাবিলাম, মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার যো নাই, খ্যাতি এতবড কানে আসিয়াও পৌছিয়াছে।" ('স্মৃতিকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬) 'পল্লীসমাজ'এ বর্ণিত মুসলমান সমাজচিত্র 'গোরা'র পল্লীগ্রামের মুসলমান সমাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দূর থেকে মুসলমানদেব সম্পর্কে তাদের দু'একটি গুণের প্রশংসা করেই তিনি অমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু মুসলমান যখন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তখন শরৎচন্দ্র নিম্ন মধ্যবিত্তের মতোই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে সব্যসাচীর মতো ঔদাসীন্য

৪৯॥ 'বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা', শ. সা. স., অষ্টম সম্ভার, পৃ. ৩৭২।

দিয়ে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এই ঔদাসীন্য বা অসন্তোষ তাঁর ব্যক্তিগত নয়, এ হচ্ছে মধ্যবিত্ত হিন্দুর মানসিকতা-উদ্ভূত। প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে মুসলমানদের প্রতি শরৎচন্দ্রের বক্তব্যে তাঁর ক্রোধের কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "প্রত্যেক হিন্দুই মনে প্রাণে ন্যাশনালিষ্ট। ধর্মবিশ্বাসেও তারা কারও হতে ছোট নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষৎ, বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। তপস্যার মানেই হলো চিন্তা। বহুজনের বহুতর চিন্তার ফলে যে ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে, আইনসভার গুটিকয়েক আসন কম হবার আশঙ্কায়, তাকে সর্ব্বনাশের ভয় দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি ছিল না।"[৫০] সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নির্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি শরৎচন্দ্রের মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুর মানসিকতা আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, "· এতবড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হ'ল, এ তাঁরা জেনেও নীরব রইলেন —এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল —একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই, তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে এও কি তাঁরা ভাবেন না ?"[৫১]

সব্যসাচী সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ—সে নিজে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী। অপূর্বর বিচার দৃশ্যে সে নিজেকে চরম স্বেচ্ছাচারী হিসাবে প্রমাণ করেছে। সব্যসাচীর কাছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দেশকে ভালোবাসার একটা বড় শর্ত। অপূর্ব তার দলে এসেছিল অনেকটা নিজের দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলতার মধ্য দিয়ে। এই অপূর্বকে বাঁচানোর চেষ্টা করাতে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে গোটা দলই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ অপূর্বর অপরাধ গুরুতর। সব্যসাচীর স্বধর্ম-বিরোধিতার কারণ স্বরূপ তিনটি দিক দেখানো হয়েছে তা হচ্ছে (ক) সব্যসাচী অধিনায়ক, তার বিরুদ্ধে এবং তার অগোচরে কোনো কাজ হতে পারে না, (খ) অযোগ্য লোকের মৃত্যুতে সমিতির লাভ হবে

না। উপরন্তু 'ডিসিপ্লিন' নষ্ট হবে এবং (গ) সব্যসাচীর বিরোধী সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী ব্রজেন্দ্র নিজেই একজন সন্দেহজনক চরিত্র।

সম্ভবত সব্যসাচীর এই একনায়কত্ব মেনে নেওয়ার মানসিকতার পিছনে শরৎচন্দ্রের মনে দেশবন্ধুর প্রভাব সক্রিয় ছিল। "অনেকদিন পূর্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাঙ্গালাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রায় তুল্য কথা। কথাটা যে কতবড় সত্য, এই সভার একান্তে বসিয়া আমার বহুবারই তাহা মনে পড়িয়াছে। অথচ, এই বাঙ্গালাদেশের কাগজে কাগজে যে তাঁহাকে ছোট বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, পরের চক্ষে হীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার অবিশ্রাম চেষ্টা চলিয়াছে, এতবড় ক্ষোভের বিষয় কি আর আছে? তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালাদেশটাই যে অপরের চক্ষে ক্ষুদ্র হইয়া আসিবে, এমন সহজ কথাটাও যাহারা অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া দেশের কোন শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে? একের সঙ্গে অপরের মত ষোল আনা মিলিতে না পারে, হয়ত মিলেও না, কিন্তু মতামতের চাইতেও এই মানুষটি যে কত বড় একথা লোকে এত সহজে ভুলিয়া যায় কি করিয়া?"[৫২]

দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর কারণ তাঁর কাছে, "মনে হয়, পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয় শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে।"[৫৩] দলাদলি এবং ঐক্যহীনতা দেশের যে কত ক্ষতি করে সে সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। কিন্তু শরৎচন্দ্র শ্রেণীদ্বন্দ্বকে ভয় পান এবং দলাদলির কারণ খুঁজে দেখতে চান না।

অন্তর্গত চেতনায় 'আনন্দমঠ' আর 'পথের দাবী' নিকটবর্তী। জাতিবিদ্বেষ উভয় উপন্যাসের প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্বেষ শাসক মুসলমানের বিরুদ্ধে, শরৎচন্দ্র ইংরেজের বিরোধী। বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা বঙ্কিমী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতেন।[৫৪] 'পথের দাবী'ও সন্ত্রাসবাদীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। দুটি উপন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৫২॥ 'দিনকয়েকের ভ্রমণ কাহিনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।

৫৩॥ 'স্মৃতিকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

৫৪॥ "...সূর্য সেন তাঁর নিজের ছাত্রদের সমুচিত উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলবার জন্য সেই 'আনন্দমঠ'-এর ওপরেই নির্ভর করেছিলেন। চট্টগ্রাম কর্ণফুলী তীরে তাঁর প্রিয় ছাত্র রাখাল দে (পরে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিতদের একজন), সুকুমার এবং দলিল রহমানের সঙ্গে কথাসূত্রে 'আনন্দমঠ'-এর জীবনদান এবং ভক্তিসাধনা সম্পর্কিত

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ সন্তানদের দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন —দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত। যাকে সহজ করে বলা যায় শিক্ষিত আর অশিক্ষিত, "সন্তান দ্বিবিধ দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্তা।"[৫৫] আর শরৎচন্দ্র তো অত্যন্ত স্পষ্ট করেই 'পথের দাবী'তে শিক্ষিত অশিক্ষিতের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। সব যুগেই সাধারণের মানসিকতায় অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ থাকে। সাধারণ চায় অলৌকিক উপায়ে দ্রুত তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। শরৎচন্দ্র শ্রমিকদের মানস বিশ্লেষণে শ্রমিকদের সেই অবাস্তব কামনা তুলে ধরেছেন।[৫৬] উভয় ঔপন্যাসিকই অপ্রবুদ্ধ মনকে দেশের বৃহৎ কাজে নিয়োগ করতে অনিচ্ছুক এবং দেশের সাধনায় অকাল উদ্বোধনের কুফলের ব্যাপারে তাঁরা সচেতন। 'আনন্দমঠ'-এ, "বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল" অপরদিকে 'পথের দাবী'তে দেখা যাচ্ছে "দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায় বিদেশের আয়োজনে" সেই বীরকে দুঃসহ বায়ু ও মুসলধার বৃষ্টির দুর্যোগ মাথায় করেও নির্ভয়ে চলে যেতে হয়।

আলোচনা স্মৃতি এবং স্বাদেশিকতাব্রতের উল্লেখ আছে…"। —হরপ্রসাদ মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন, "বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'ই ছিল আমাদের সফলতার প্রেরণার উৎস, তারই মধ্যে ছিল আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ। সত্য-সত্যই আমরা আনন্দমঠের প্রধান সব চরিত্র-গুলি আমাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলাম। তারা সবাই সন্ন্যাসী ছিল। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার সংকল্প ছিল আমাদের। তখন আমরা সব ভাবতাম, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপরাংশের কোন এক স্থানে আনন্দমঠ গড়ে সেখানকার মানুষকে আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অজেয় এক মুক্তি ফৌজের পুরোভাগে থেকে দেশের অভ্যন্তরে অভিযান শুরু করব।" (*Memiors*, p. 98), অনূদিত ও উদ্ধৃত : স্বদেশরঞ্জন দাস, 'মানবেন্দ্রনাথ জীবন ও দর্শন', (১৯৭০), পৃ. ১০৯।

৫৫ ॥ 'আনন্দমঠ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫০।

৫৬ ॥ "…সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া অবশেষে বর্ম্মায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ তেমনি শক্তি। তাঁহাকে বাধা দেয় কার সাধ্য। কেমন করিয়া তিনি সাহেবদের কান ধরিয়া মজুরদের সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধা

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশপ্রেমের আদর্শে আদর্শায়িত চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠকের মনে সে আদর্শ সঞ্চার করবার দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র দেশপ্রেমের সৃষ্টভূমিতে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবহমান অনুকূল পরিবেশে দেশের মুক্তির কথা বলতে পেরেছেন। কারণ বঙ্কিমের সময়ে রাজনৈতিক চেতনা সবেমাত্র দানা বেঁধে উঠছিল। কাজেই বঙ্কিম হিন্দু বাঙালী জাতীয়তাবাদের আশ্রয়ে অনুশীলন, সশস্ত্র দল গঠন প্রভৃতির কথা প্রচার করলে' তিনি বা তাঁর শ্রেণী সে যুগে ইংরেজ বিতাড়নের পক্ষে ভাবনা চিন্তা করেননি। শরৎচন্দ্রের কালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী রূপে চিহ্নিত হচ্ছিল। কে শত্রু এই বিষয়ে সত্য আবিষ্কার করবার যে দ্বিধা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ছিল শরৎচন্দ্রের কালে সে দ্বিধা কেটে গেছে। বঙ্কিমের সময়ে ইংরেজ ছিল অনেকটা অভিভাবকের মতো, শরৎচন্দ্রের সময়ে অভিভাবকত্বের সে ভূমিকার অবসান হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'-এ সন্ত্রাসবাদী তরুণ-তরুণীদের অকালবোধনের কুফল ও ধ্বংসচিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের যে সব চরিত্র সন্ত্রাসের পথে এসেছে, তারা জীবনে অন্য কোনো কাজে সুবিধা না করতে পেরেই অধ্যবসায়ের এই অস্থির কর্মক্ষেত্রে ভিড় জমিয়েছে। শুধু অতীন এসেছে এলার প্রেমে পড়ে। স্বার্থযুক্ত দেশপ্রেম তাদের কাছে প্রেরণাদায়ক নয়, তারা নির্বিকার নিরাসক্ত মনে 'স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ-এর দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে এসেছে। তাদের মন্ত্রদাতা ও দলপতি হচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথের সমালোচনা 'চার অধ্যায়'-এর অন্যতম উপজীব্য। ইংরেজ তাড়ানোই ইন্দ্রনাথদের ব্রত। অথচ সেই ইন্দ্রনাথই যখন বলে, "আমি ইংরেজ-কেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সবচেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না — লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সবচেয়ে ভয়, ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরকেও ভোলায়" (২৭৫), তখন মনে পড়ে যে, ছোট ও বড় ইংরেজের ব্যবধানে ইন্দ্রনাথের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস রাখেন এবং রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু এ মত পোষণ করে গেছেন।[৫৭] কোনো মহৎ ও

আদায় করিয়া লইবেন এবং তাহাদের মজুরির হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন নিজের মুখেই সে সকল কথা তিনি প্রকাশ্যে বিবৃত করিয়াছেন।

চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপর বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি।" 'পথের দাবী', পৃ. ১৪৪।

৫৭॥ ইরাক ভ্রমণের সময় এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন যে,

নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের অভাবে ইন্দ্রনাথ দুর্জনে পরিণত হয়েছে। অথচ অন্যদিকে অপূর্বর বিচার দৃশ্যে সব্যসাচী ইন্দ্রনাথের মতো একক প্রভুত্ব দেখানো সত্ত্বেও মহৎ প্রেরণা ও অমল বিবেকের জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বীরে পরিণত হয়েছে। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালেও উত্তেজিত ইংরেজ-বিরোধিতা পছন্দ করতে পারছেন না এবং তীব্র সমালোচনা করছেন সশস্ত্রপন্থার। মধ্যবিত্তের হাতে তিনি নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন না, আবার বিকল্প কোনো সফল নেতৃত্বের সুস্পষ্ট সন্ধান দিতেও পারছেন না। আত্মশক্তির দ্বারা জয়লাভে তখনও তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী। শরৎচন্দ্র ১৯২৬ সালেই সর্বাত্মক ইংরেজ-বিরোধিতা প্রচার করেছেন, যদিও নেতৃত্ব রেখে দিয়েছেন মধ্যবিত্তের হাতে এবং মুক্তি চেয়েছেন মূলত শিক্ষিতশ্রেণীর।

শরৎচন্দ্র ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে কোনো মোহই 'পথের দাবী'তে দেখাননি। তিক্ত ইংরেজ বিদ্বেষ এতে প্রচারিত। সব্যসাচীর পন্থার নাম তিনি দিয়েছেন 'বিপ্লব'। অবশ্য সব্যসাচীর তথাকথিত বিপ্লব যে তার শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্ষমতা দখলে তাদেরই শ্রেণী যে সুবিধা পাবে সে কথা এ গ্রন্থে অস্পষ্ট থাকেনি। শ্রেণী-স্বার্থ আদায়ে যে সব্যসাচীর তথাকথিত বিপ্লবী চেতনার উদ্দীপন সেটা দেখতে পাওয়া যায় শশীর প্রতি তার নির্দেশ দানে, "তুমি আমার বিপ্লবের গান কোরো। যেখানে জন্মেচ, যেখানে মানুষ হয়েচ, শুধু তাদেরই —সেই শিক্ষিত ভদ্রজাতের জন্যেই" (২৫৮)। অথবা সব্যসাচীর বিরুদ্ধে ভারতীর অনুযোগে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, "হৃদয় বলে যদি কোন বালাই

··'ইংরেজ জাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার'। আমি বললেম, 'তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best'। তিনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর যারা next best'? চুপ করে রইলুম। উত্তর দিতে হলে অসংযত ভাষার আশঙ্কা ছিল। এশিয়ার অধিকাংশ কারবার এই next best-এর সঙ্গেই।" 'পারস্যে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃ. ৪৪৪। 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৩৪৮) যা তাঁর মৃত্যুর সামান্য কিছু আগে রচিত তাতে তিনি যদিও বলেছেন যে, বড়ো ইংরেজের ওপর তাঁর এতদিনকার রাখা বিশ্বাস 'দেউলিয়া' হয়ে গেল তবুও তাঁর বিশ্বাস, "···ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন।" —রবীন্দ্র-রচনাবলী ষড়বিংশ খণ্ড, পৃ. ৬৩৯।

তোমার থাকে, সে শুধু ছেপে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ভদ্রজাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনজন" (২৯২)। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের পন্থাকে বলেছেন 'বিভীষিকা'। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথকে দিয়েও যখন 'বড়ো ইংরেজে'র পক্ষ সমর্থন করিয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হয়, এর কারণ অন্যত্র। তিনি যে আমৃত্যু 'বড়ো ইংরেজে'র প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখতে পেরেছেন তার কারণ এই যে, তিনি তাদের ঐ বুর্জোয়া সভ্যতার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। যে জন্য তিনি বলেছিলেন যে, "সম্ভ্রান্ত সমাজ যত্নভরে, অনেক ক্ষেত্রে বৈষয়িক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েও আত্মসম্মানের চর্চা করে, সংস্কৃতির সুউচ্চমানকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।"[৫৮] অথচ এটা সহজ সত্য যে, 'সংস্কৃতির সুউচ্চমান' শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং সে কারণে জনস্বার্থবিরোধী ও কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের বৈপরীত্য সত্ত্বেও এটা দেখা যাচ্ছে যে, উভয়েই শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্বাসী ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার একমাত্র উপায় সন্ত্রাসবাদ ছিল কিনা সে বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বুদ্ধি নির্ধারণ করবে।[৫৯] শরৎচন্দ্র পরাধীনতা দূর করবার মানসে যে পৌরুষ বাঙালী চরিত্রে আরোপ করেছেন, তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্র তাঁর পরম সহানুভূতি পেয়েও বাস্তব হয়নি। সেইজন্য সব্যসাচী যদিও মহৎ, কিন্তু স্বাভাবিক হচ্ছে অপূর্ব। কংগ্রেস সেবক শরৎচন্দ্রকে ধরা পাওয়া যেতে পারে দুর্বলচেতা অপূর্বর কল্যাণকামী সেবাধর্মের সদিচ্ছায়। যখন সে উপন্যাসের শেষে গ্রামে ফিরে যেতে চাচ্ছে সেবা করবার জন্য, সেই ইচ্ছার মধ্যে। সব্যসাচীর মধ্যে গোরার মতো আত্মানুসন্ধান নেই, থাকতেও পারে না। কারণ সে নিজে মুক্তি-পিপাসু বাঙলাদেশের প্রতীক। যে দেশে উন্নতির সব পথ বন্ধ —খোলা শুধু স্বাধীনতার দুর্গম দুয়ারের পথটি, সেই সিংহদ্বারের লক্ষ্যই ছিল পরাধীন

৫৮ উদ্ধৃত স্টিফেন হে, 'রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা', 'দেশ', রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা (১৩৬৮), পৃ ৮৩।

৫৯ গোলটেবিল বৈঠকে অহিংস সমঝোতার পক্ষে দাবি তুলে শেষপর্যন্ত গান্ধীকেও ইংরেজ শাসকদের কাছে অনুযোগ করবার সময় ভারতবাসী সন্ত্রাসবাদীদের শক্তিশালী সম্ভাবনা ও অনিবার্যতা পরোক্ষে স্বীকার করতে দেখা যায়। সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ লাভকে তিনি 'ইতিহাসের ধারা' বলে অভিহিত করে বলেছিলেন, "ভবিষ্যৎ কি তোমরা সত্যিই দেখতে পাও না? আমার এই দাবী উপেক্ষিত হলে ইতিহাস লিখিত হবে সন্ত্রাসবাদীদের রক্তমাখা লেখনীতে।" (ড. পট্টভি, 'কংগ্রেসের ইতিহাস', পৃ. ৪৯৮), উদ্ধৃত: শৈলেশ দে, 'আমি সুভাষ বলছি', পৃ. ৪১৯।

সব্যসাচীর। গোরার মতো তার সংগ্রাম দেশীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে নয়, কারণ গোরার মধ্যে আমরা পাই বুর্জোয়া-উত্তরণের প্রক্রিয়া। সব্যসাচীর সংগ্রাম বিদেশী সরকারের সঙ্গে। যে উদ্দেশ্যের প্রভায় সব্যসাচী উজ্জীবিত, তা হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একাগ্র প্রয়াস। এ সংগ্রাম আপামর জনসাধারণের জীবন সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়নি, অনেকটাই আদর্শায়িত ভাবলোকের, দৈনন্দিন বাঁচা-মরার টানা-পোড়েনের সঙ্গে এর যোগ নেই। তবুও স্বাধীনভাবে বাঁচবার কথা ভেবেছে সব্যসাচী। বিদেশী শাসনের বিজাতীয় শৃঙ্খলভার মুক্ত করাই তার লক্ষ্য। গোরার সন্ধান সমাজে সর্বধর্মের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার পথটি। গোরা আত্মিক ও সামাজিক ভাবনা ভেবেছে। স্বাধীনভাবে বাঁচতে একান্ত আগ্রহী সব্যসাচী, যেমন স্বাধীনভাবে বাঁচবার কথা ভেবেছে 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন'-এর দাসরা।

শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী সার্থক বিপ্লবের পথের সন্ধান দিতে পারেনি। যেমন পারেননি ভারতের সন্ত্রাসবাদীরাও। কারণ এঁরা ছিলেন চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদীরা যথার্থ অর্থে বিপ্লবী নয়। তবু ইংরেজের নিষ্ঠুর শাসনের বেড়াজালে আটকে থেকে ভয়ঙ্কর স্পষ্টভাষণে ইংরেজ-বিতাড়নের লিখিত প্রয়াস শরৎচন্দ্রের দুঃসাহসের পরিচয় দান করে। সন্ত্রাসবাদ সে সময়কার সবচেয়ে চরমপন্থা ছিল বলে এবং সেই রীতিনীতির সমর্থন জানানোতে বলা চলে তিনি কতকাংশে বিদ্রোহী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। সব্যসাচী সে যুগের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সচেতন বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিবিম্ব।

ঔচিত্যবোধের তাড়নায় লিখিত উপন্যাসদ্বয়—'চার অধ্যায়' ও 'পথের দাবী'—উভয়ে খণ্ডিত সৃষ্টি। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস হিসাবে খণ্ডিত, 'পথের দাবী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র আশংকিতা দোষে দুষ্ট। মানসিকতায় অনেক এগিয়ে গিয়েও শরৎচন্দ্র বিহ্বল, একটা চেতনা আছে, কিন্তু সে চেতনা, প্রতিষ্ঠা করতে জমি পাচ্ছেন না। বিদ্রোহ আছে হাতিয়ার নেই, সাহস আছে সম্বল নেই, সুপ্ত শক্তি আছে, জাগাবার মতো নেতা নেই। এ রকম শূন্যতায় বীরের সৃষ্টি কল্পনাশ্রয়ী হতে বাধ্য। সব্যসাচীর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি হয়তো আছে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র পরবর্তী ঘটনা, পূর্ববর্তী নয়।

সব্যসাচী বীর, অন্যের বরেণ্য আদর্শ। তার চারপাশে সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যে সে পরাধীনতার বেদনায় ব্যথিত হয়ে একটি অচঞ্চল শিখা জ্বালাতে চেষ্টা করেছে। শরৎচন্দ্র এ উপন্যাস লিখে গেছেন চিত্রশিল্পীর বর্তমানকেন্দ্রিক ও জীবননিষ্ঠ ছবি আঁকার মতো করে। যুদ্ধে, বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, প্রলয়ে—দেশের দুর্ভাগ্যে আঁকা চিত্রের মতোই এ ছবি বর্তমান-ভিত্তিক। সব্যসাচী হতাশ হয়নি শেষপর্যন্ত, তবু সর্বাচ্ছন্ন ধ্বংসের পটভূমিতে এবং তার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগহীনতা ও অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির চেষ্টার মধ্যে ক্লান্ত শ্রান্ত

শরৎচন্দ্রের মানস প্রতিফলিত হয়েছে।[৬০] তিনি যে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না তার একটি নিদর্শন 'শেষপ্রশ্ন'-এর রাজেন চরিত্রটি।

রাজেন একাধারে বিপ্লবী, নাস্তিক এবং সেইসঙ্গে আর্তসেবক। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তার প্রধান পরিচয় দাঁড়ায় সে বিপ্লবীও নয়, নাস্তিকও নয়, তার পরিচয় সে গোঁড়া ধার্মিক। বিপ্লব করবার চাইতে হিন্দু ধর্ম রক্ষা করা যার কাছে বড় কর্তব্য। রাজেন একজন যুবক অথচ সে অকালে প্রাণ হারালো প্রজ্বলিত ঠাকুরবাড়ি থেকে বিগ্রহমূর্তি উদ্ধার করতে গিয়ে। 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমলের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র হিন্দু সমাজের সংস্কারকে আঘাত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কমল নিজেই হাস্যকরভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন। তার অনেক অসঙ্গতির মধ্যে একটি হচ্ছে রাজেনের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে উপন্যাসের শেষাংশে তার উক্তি ও মানসিকতা।[৬১]

শরৎচন্দ্র সংস্কারকে আঘাত করতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি নিজেই আবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে, তাঁর মানসিকতা নিম্ন মধ্যবিত্তের। যে মানসিকতা সংস্কারকে সমালোচনা করে কিন্তু তাকে ছাড়তেও পারে না, পারে না কারণ এগুলি তার আজন্মসাথী। আরও পারে না এই জন্য যে, এদের পরিত্যাগ করলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে সে শূন্যতা তার সহ্যাতীত। রাজেন কিছু করতে চায়। সব সময়েই তাকে আমরা কাজের মধ্যে দেখি। কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান সে পায়নি। কারণ তেমন পথ শরৎচন্দ্রেরও জানা ছিল না। তাই রাজেন, যার পরিচয় ছিল যে সে একজন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী, শেষপযন্ত প্রাণ দিল রাজনীতির জন্য

৬০ চন্দননগরে আলাপসভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে, "এই যে দেশটা ত্যাগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমার মনে হয় ঠিক এরই মধ্যে কোথায় একটা গলদ ঢুকে আছে—সেটা খুঁজেও পাচ্ছি না।·· কোন উপায় চোখের উপর দেখতেও পাই না। নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস নেই—এটাই যদি বড় জিনিস হয়, কি আশা আছে? ···কোনখানটায় গলদ আছে—যার জন্য এত বড় শাস্তি ভোগ করছি। আমিও মনে করেছি politics-এ আর থাকব না। আমি এই line-ই নেব—ধ্বংস করার কাজ নেব। সমস্ত জিনিস ছোট ক'রে দেখব। খুব বড় ছিলাম অথচ result nil!" —'চন্দননগরে আলাপ সভায়', শ. সা. স., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।

৬১॥ কমল রাজেনের অকালমৃত্যুতে শোকাহত হয়েও নিজেকে সংযত করে বলেছিল, "সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।"—শ. সা. স., নবম সম্ভার, পৃ. ২৫৮।

নয়, ধর্মের জন্য। 'শেষপ্রশ্ন'-এর আশুবাবু পরলোকগত রাজেন সম্বন্ধে বলেছে, "দেশ ছাড়া কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকাব করেনি। শুধু দেশ —এই ভারতবর্ষটা। তবু, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো।" আশুবাবুর বেনামে শরৎচন্দ্র দেশ এবং ধর্মকে এক করে দেখেছেন। আশুবাবু যেন শরৎচন্দ্রেরই মুখপাত্র। চিন্তা ও চেতনায় শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ রূপে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রতিনিধি। যে নিম্ন মধ্যবিত্তের আর একটি পরিচয়—সে সংস্কারবাদী। যে যুক্ত হাত মাথায় তুলে আশুবাবু রাজেনের আত্মাহুতিতে শ্রদ্ধা জানালো সে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শরৎচন্দ্রেব নিজেরও।

নিরানন্দ নিরাশ বাংলার নব-আনন্দমঠের স্রষ্টা নিজে কর্মী ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। কিন্তু শরৎচন্দ্র অসহযোগের প্রচার 'পথের দাবী'তে করেননি। অগভীর বটে, তবু সন্ত্রাসবাদ একটি চরমপন্থা। বাঙালী মধ্যবিত্ত হৃদয়ে সন্ত্রাস-বাদীরা শ্রদ্ধাসীন ছিলেন। তারই স্বীকৃতি দিয়েছেন শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী'তে। বাংলাদেশের তরুণদেব উদ্যমী, সাহসী মানসিকতা তাঁকে উদ্বেলিত করেছিল। যার জন্য তিনি 'কথাসাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে' অমন একটি উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহ সোচ্চার। সামাজিক ও রাজনৈতিক নিপীড়িতের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা স্বরূপে যতটা বিশুদ্ধ মানবিক ততটা রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি এই রকম মন্তব্য করেছিলেন যে, "প্রত্যেক দেশেই, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গঠনের সহায়তায় দেশের সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতীদের ভার বড কম নয়। ভারতবর্ষে বিদেশী শাসন একটি অতিবিক্ত উত্তেজনার কারণ, এবং তার ফলে স্বাধীনতার জন্যে কাজ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য হয়ে পড়ে।[৬২] নানা প্রকার অসঙ্গতি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র সমস্যা-পলাতক ছিলেন না। যদিও সমস্যার সঠিক প্রকৃতি ও সমাধান তাঁব অজানা ছিল।

৬২॥ উদ্ধৃত: হুমায়ুন কবির, 'শরৎসাহিত্যের মূলতত্ত্ব', অনুবাদ বিশু মুখোপাধ্যায়, (১৩৬৪), পৃ. ২।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতির সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের থেকে ভিন্ন ধরনের। কেন না তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করবার আগেই কিছুদিন রাজনীতির চর্চা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এঁরা কেউই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শরৎচন্দ্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে। কিন্তু ফলিত রাজনীতির অংশগ্রহণে তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা তারাশঙ্করের মনোরঞ্জক হয়নি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে লিখেছেন, "যৌবনের কিছু আগেই জীবনের সব কামনা একত্রীভূত হয়ে পরাধীনতার অবসান করে দেশকে স্বাধীন করবার যে জীবনযজ্ঞ তাতেই আহুতি দিয়েছিলাম। ১৯১৭ সনে অন্তরীণ হওয়া থেকে ১৯৩৩ সনে জেলে যাওয়া অবধি বিভিন্ন সময়ে ও ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতাকামী আত্মত্যাগী সৈনিকের মধ্যে দলগত বিরোধের যে মর্মান্তিক সংঘাত দেখেছিলাম, তাতে বেদনা হয়েছিল যেমন মর্মান্তিক রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বিতৃষ্ণাও হয়েছিল তেমনি বা ততোধিক মর্মান্তিক।"[১] তাই তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে, "এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এ পথে নয়—আমি সাহিত্যের পথে যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।"[২]

তারাশঙ্কর যে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন তা কংগ্রেসের অসহযোগের আন্দোলন। হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালীর নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয় সত্ত্বেও আন্দোলন সফল হয়নি। কারণ আন্দোলনটি ছিল নেতিবাচক। আন্দোলনের অসফলতার সঙ্গে বিরাজ করছিল চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকার সমস্যা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী হতাশ হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে বাঙালীর চিন্তা ও চেতনায় সামন্তবাদের প্রতি পক্ষপাত সব সময়েই বিদ্যমান ছিল। তারাশঙ্কর অসামান্য জনপ্রিয় লেখক। জনপ্রিয়তার ভিত্তি শুধু তাঁর শৈল্পিক দক্ষতায় নয় তার ভিত্তি তাঁর পাঠকসমাজের ঐ মানসিক প্রবণতার মধ্যেও নিহিত রয়েছে। শহুরে জীবিকানির্বাহী বাঙালী পাঠকের সুপ্ত আকর্ষণ থেকে যায় ছেড়ে-আসা গ্রামীণ জীবনের জন্য। বিদ্রোহ-বিলাসী উপযুক্ত সমাজবোধহীন 'কল্লোল', 'কালি-কলম' গোষ্ঠী এ ধরনের পাঠকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। যদিও কল্লোল-সৃষ্ট ভূমিতে তারাশঙ্করের অবতীর্ণ

১॥ 'আমার কথা', 'শনিবারের চিঠি', (আষাঢ়, ১৩৭১), পৃ. ২০৯।

২॥ ঐ, পৃ. ২০৯।

হওয়া সহজ হয়েছিল। তবু সাহিত্যসৃষ্টির উদ্যোগপর্বে 'কল্লোল' দলের হয়েও চারিত্রধর্মে তিনি 'কল্লোলগোত্রীয়' হতে পারেননি। তিনি অরাজনৈতিক, নাগরিক এবং সচেতনভাবে দুঃসাহসিক[৩] কল্লোলীয়দের প্রতিবেশী ছিলেন, সুহৃদ ছিলেন না।

কারণ ঐ যুগের 'কল্লোল', 'কালি-কলম' যেভাবে তথাকথিত আধুনিকতার চর্চা করেছে পাঠক তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট পাঠক নিজেদের জীবনে নাটকীয়তা নেই বলে সাহিত্যে নাটকীয়তা চেয়েছে। আবেগ উত্তেজক ও অনুভূতি-প্রবণ ভাষাও পাঠক চেয়েছে। তাদের এমন সব প্রত্যাশা শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্কর যতটা পূর্ণ করতে পেরেছেন আর কেউ ততটা পারেননি। অন্যদিকে সমাজের পুরনো সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে আঘাত করে, নৈরাজ্যবাদী একটা রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে কল্লোলীয়রা পাঠকদের বিশ্বাস আকর্ষণ করতে পারলেন না। তাদের অস্থির অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র অমিতের বলা কথা সম্বন্ধে লিলি গাঙ্গুলির যে ধারণা জন্মেছিল তার তুলনা করা চলে।[৪] পাঠক চাচ্ছিল বিশ্বাসের একটা দৃঢ় ভূমি এবং উজ্জ্বলতর জীবনের সম্ভাবনার কথা। তারাশঙ্কর সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন পাঠকের প্রত্যাশিত গ্রামীণ জীবনের তথা সামন্তবাদী মানসিকতার

৩॥ 'কল্লোল'-বহির্ভূত নবীন সাহিত্যিকদের রচনাতেও এ সময় একটা বিদ্রোহী মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। তারাশঙ্কর নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, "··অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা ও লৌকিক সাধনার যে সমন্বয় চেষ্টা বা পরি-কল্পনার মধ্যে আমরা কিছুদিনের জন্য মহা আশ্বাসে আশ্বাসিত হোয়ে উঠেছিলাম সে আশ্বাস ভঙ্গের ফলে এবং বিগত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ (প্রথম মহাযুদ্ধ) পৃথিবী ব্যাপী, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় আমাদের জীবনও অনুরূপ ক্ষোভে ভরে উঠেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অহিংসাধর্মী আন্দোলনকে উপেক্ষা করে সন্ত্রাস-বাদীর পুনরাবির্ভাব এই ক্ষোভের আর এক নিদর্শন। ···সমন্বয় নয়, বিপ্লবের বাসনা সাহিত্যে সঞ্চারিত হোতে চাওয়াটাই এই সাহিত্যের বড় লক্ষণ। এই অধীর চিত্তের প্রতিফলন দিয়েই এই সাহিত্যের শুরু।" —হরপ্রসাদ মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

৪॥ "সে (লিলি) জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ওই বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদবুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়।" —'শেষের কবিতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

কথাসাহিত্য রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়ে। সেইসঙ্গে ছিল জীবন ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রচুর অভিজ্ঞতা। অস্থির যুগ ও নেতিবাদী কল্লোলের সংশয়চারণার মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত পাঠক স্বভাবতই আশার ব্যঞ্জনা পায়নি। যে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল বিদেশে নয়, স্বদেশে, স্বকালে, আশপাশে এমন কি নিম্ন মধ্যবিত্তের নিজেদের মধ্যেই থাকা সম্ভব তেমন বিশ্বাসের কথাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুললেন তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্কর মনঃসমীক্ষণে আগ্রহ দেখাননি বরং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রবৃত্তি-তাড়িত কার্যকারণে পরিচালিত হয়েছে। তাঁর ছিল বহু অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে আসা কঠিন অভিজ্ঞতা। এইসব অভিজ্ঞ অনুভূতি ও নির্মম বাস্তবের উপাদান এক করে, তিনি কাঁথার কারুকাজের মতো সনাতন অথচ নবরূপা এক সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করলেন। বাস্তবের রূঢ়তাকে দেখেছেন বলেই তাঁর মধ্যে এক ধরনের দুঃখ-চেতনার প্রকাশ দেখি। পরে তাঁর উপন্যাস পর্যালোচনার সময় দেখব এই দুঃখ-চেতনা পুরাতন সামন্তবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক টিঁকিয়ে রাখার জন্যে একটা সূক্ষ্ম প্রচারণায় লিপ্ত।

তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি'।[৫] নবীন সাহিত্যিক-দের প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, "সমন্বয় নয়, বিপ্লবের বাসনা সাহিত্যে সঞ্চারিত হোতে চাওয়াটাই এই সাহিত্যের বড় লক্ষণ"—তেমন লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস হল 'চৈতালী ঘূর্ণি'। যদিও বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের সূচনা এতে আছে কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। জমিদার, মহাজনের শোষণে গোষ্ঠ অতিষ্ঠ। কৃষক গোষ্ঠের অবস্থা তার বাবার আমল পযন্ত ভালো ছিল। এখন গোষ্ঠর পরিচয় সে দেনাদার। গান্ধীর 'স্বরাজসাধনা' তার বুদ্ধিগম্য নয়। তার নিজের বাস্তব জীবনের প্রশ্ন তুলে সে জানতে চায় যে, কবে কখন জমিদার মহাজনী প্রথাটা উঠে যাবে?[৬] লেখক বলেছেন যে, বহু যুগের অন্যায় অত্যাচারে এই কৃষকদের কাছে দেশ, ধর্ম, সমাজ বোধকরি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। তারা জানেও না কে তাদের শোষণকারী, কে তাদের এমন 'কঙ্কাল' করে তুলেছে। তবে এরা সবাই বাঁচতে চায়। গোষ্ঠরা শোষক জমিদারকে হাতের কাছে পায় না। সে জন্য বিপুল ক্রোধে 'মহেশ'-এর গফুরের মতো উন্মাদ হয়ে সে হত্যা করল জমিদারের খোট্টা চাপরাশীকে এবং এর পরই সে স্ত্রীকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করল —যেমন করেছিল গফুর ও তার কন্যা। শহরতলীর এক কারখানার দিনমজুর হল গোষ্ঠ। সেখানে সেই একই ইতিহাস। পশুর চেয়েও হীন জীবন শ্রমজীবীদের। শহরে গ্রামে

৫॥ 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'উপাসনা' পত্রিকায় (কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৬॥ 'চৈতালী ঘূর্ণি'—তারাশঙ্কর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩।

একই চেহারা। তবে গ্রামে দল পাকিয়ে বিদ্রোহ করবার উপায় ছিল না, দাবি জানানোর রাস্তাও ছিল না। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে মহাজন জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের পুরুষ পরম্পরায় চেনার বন্ধন। শহরের কলকারখানায় তুলনা-মূলকভাবে দলবদ্ধ হওয়া সহজতর। দাবি জানানোতে সুবিধা কিছু বেশী। গোষ্ঠর কারখানার মজুররা মজুরীবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করল। বেকার শ্রমিক খাদ্যাভাবে, অনাহারে নিজেদের মধ্যেই দলাদলি শুরু করল। এই কলহের পরিণতি দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, যার ফলে প্রাণ হারাল গোষ্ঠদের দলের অনেকে। লেখক বলতে চেয়েছেন হয়তো এই বিপ্লবী চেতনা ব্যর্থ হবে না, হয়তো তা 'চৈতালীর ক্ষীণঘূর্ণি' কিন্তু 'অগ্রদূত কালবৈশাখী'র (৮২)। কবে সার্থকতা আসবে সে বিষয়ে বলেছেন, যখন পরিবেশ অনুকূলে আসবে "চৈত্রের ঘূর্ণি ক্ষীণ-জীবী, আকাশ-বাতাস ধরণী সব আগুন না হইলে ঝড় পরমায়ু পাইবে কোথা ?" তারাশঙ্কর বলেছেন তিনি বায়ুস্তরে শূন্যতা অনুভব করেছেন। কিন্তু ঝড় কখন আসবে সেটা বলেননি। অবশ্য কুড়ি বছর পরে তাঁর স্মৃতিচারণায় তিনি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র পূর্বাভাষ সত্য হয়েছে বলে মনে করেছেন। 'আমার সাহিত্য-জীবন'-এ তিনি বলেছেন যে, "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। ···উনিশশো ষোল-সতের সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে ·· এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সে দিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই।" মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধাদি পড়ে তিনি দেখেছেন, "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সে শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, সেই প্রবন্ধ মারফত জেনেছিলাম প্রথম —তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করে-ছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ সর্বস্বতাকে মানতে পারিনি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি।" ('আমার সাহিত্যজীবন', প্রথম পর্ব, ১৩৬০, পৃ. ৯০-৯১)।

'চৈতালী-ঘূর্ণি'তে তারাশঙ্কর ক্ষণিকের জন্য হলেও বিপ্লবের ইচ্ছা শ্রমিকের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে। তিনি আপসহীন বিপ্লবকে চিত্রিত করতে পারেননি। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে ব্যর্থ বিপ্লবে। এখানেও সমন্বয়পন্থী তারাশঙ্কর দুর্লক্ষ্য নন। এর পরের রচনাগুলিতে তিনি অন্বেষণ করেছেন এমন একটা পথ যার মধ্যে "আধ্যাত্মিক সাধনা ও লৌকিক সাধনার ···সমন্বয় চেষ্টা"[৭] রয়েছে। অর্থাৎ

৭॥ হরপ্রসাদ মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া চেতনার মধ্যে তিনি একটা আপস করতে চেয়েছেন। এই সমন্বয়পন্থা ভারতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের মধ্যেও ছিল। সে জন্য তারাশঙ্করের পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির নায়কদের কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়া কঠিন হয়নি।

'ধাত্রীদেবতা'য়[৮] শিবনাথ ন্যায়বোধে উদ্দীপ্ত এক আদর্শবাদী তরুণ। মায়ের প্রভাবে ছেলেবেলা থেকেই সে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে এবং সেবাধর্ম পালন করে আর সেবাধর্ম পালন করেই দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছে। দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ শিবনাথ দেশকে যথার্থ রূপে সেবা করতে চায়। এই নবীন সেবকের আর্দ্র চিত্তে 'আনন্দমঠ'-এর প্রগাঢ় প্রভাব পড়ল। ভক্তিমিশ্রিত স্বদেশমুক্তির এই জাতীয়তাবাদী ধারণায় সে আকৃষ্ট হল সন্ত্রাসবাদের প্রতি। তারাশঙ্কর সন্ত্রাসবাদকে সুনজরে দেখেননি। তিনি একে অভিহিত করেছেন 'নিরন্ধ্র অন্ধকার পথ' এবং 'স্বাধীনতা লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত পথ'[৯] বলে। শিবনাথের স্রষ্টা যে পথকে পছন্দ করেননি শিবনাথ স্বভাবতই সে পথে চলতে চাইবে না। সে সন্ত্রাসবাদীদের সংস্রব ত্যাগের জন্য উপায় খুঁজতে লাগল। তার জন্য এ অধ্যায় হয়ে রইল এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। শিবনাথের সন্ত্রাসবাদীদের সংসর্গ পরিত্যাগের প্রেক্ষাপট দেখাতে গিয়ে 'ধাত্রীদেবতা'য় মূলকাহিনীর বাইরে অতিরিক্ত আর একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এক রহস্যময়, সৌম্য আশ্রমবাসী, একদা-সন্ত্রাসবাদী 'মহাপুরুষ' কেন সন্ত্রাসের পথ পরিত্যাগ করে আশ্রমিক হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'মহামানবের' মত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ শুধু ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ, ফলে বিচ্ছিন্ন। তার মত হচ্ছে অনার্যদেরও সঙ্গে নিতে হবে এবং তাদের চৈতন্য ফেরাতে হবে। এই অনন্য-সাধারণ ব্যক্তির ধ্যানধারণা ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত। সে জন্য স্বাধীনতার থেকেও বড় কিছু তার কাম্য— "চরম উন্নতির সঙ্গে চাই পরম উন্নতি। আমার সভ্যতা আমার জাতীয় ভাবধারা অনুমোদিত পন্থায় পরমপ্রাপ্তির অবকাশ, সুযোগ, অধিকার। …বৈদেশিক শাসনের ফলে তাদের জীবনদর্শনের চাপে চরম বস্তু পরমকে ভুলিয়ে দিলে। আমি স্বাধীনতা চাই সেই জন্যে, আর সেই জন্যেই বিদেশীর নির্দিষ্ট অ্যানার্কিজম, কি টেররিজম আমি গ্রহণ করতে পারি না।" (২৩১)। তার মতে গুপ্তহত্যা ও গুপ্তষড়যন্ত্রের পথে আছে 'নিশ্চিন্ত সর্বনাশ'। সন্ত্রাসবাদী দলের নিয়মানুযায়ী ঐ 'মহাপুরুষ'কে শিবনাথের সামনে হত্যা করা হল। সন্ত্রাসবাদ ত্যাগী ঐ 'মহামানব' গান্ধীবাদী কংগ্রেসের মূলনীতি তুলে ধরেছে। বিদেশী বর্জন ছিল কংগ্রেসের আন্দোলনের অঙ্গ। অথচ 'মহাপুরুষের'

৮॥ পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

৯॥ 'ধাত্রীদেবতা', 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩।

আকাঙ্ক্ষার আর সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যে তেমন বিরোধ ছিল না, উভয়েই স্বাধীনতাকামী, পথ শুধু ভিন্ন। স্বাধীনতাকেই সন্ত্রাসবাদীরা পরম লক্ষ্য মনে করে তফাৎটুকু সেখানেই।

শিবনাথের দেশকে স্বাধীন করার উপক্রমণিকায় সন্ত্রাসপন্থা একটি উদ্যম ছিল কিন্তু একমাত্র উদ্যম নয়। 'চার অধ্যায়'-এর অতীন এ পথে এসেছিল, এলার কাছে থাকবার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই বলে। শিবনাথ এসেছিল অনেকটা একই কারণে, কিশোরী স্ত্রীর অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞায় আহত হয়ে এবং কিছু সন্ত্রাসবাদী ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে। অবশ্য 'আনন্দমঠ'-এর প্রভাবও কম ক্রিয়াশীল নয় শিবনাথের ওপর। 'আনন্দমঠ'-এর দেশানুভূতির সঙ্গে তার একাত্মতা উপন্যাসের প্রায় সর্বত্র। এমন কি 'মহাপুরুষ চরিত্রটি 'আনন্দমঠ'-এর মহাপুরুষকে মনে করিয়ে দেয়। 'আনন্দমঠ-এর বঙ্কিমচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেছেন। বলতে পেরেছেন কারণ সন্ত্রাসবাদ তাঁর কাছে দূরবর্তী এবং সে জন্য রোমান্টিক। তারাশঙ্কর তাঁর চারপাশে সন্ত্রাসবাদ দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এর ব্যর্থতাকেও। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ও তারাশঙ্কর একই ধারার লেখক কেন না তাঁরা উভয়েই ভক্তিবাদী। তারাশঙ্করের সাহিত্যিক জীবন এই ভক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত।

শিবনাথের অনুসন্ধেয় রাজনৈতিক আদর্শে সন্ত্রাসবাদ একটি অধ্যায় মাত্র। অতীনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে চার অধ্যায় ব্যাপী উদ্যম নিতে হয়েছে। বিভীষিকা-পন্থার বেড়াজালে অতীন হল ব্যর্থ, তার ও এলার মধ্যে এই দেওয়ালটি ছিল অনড়। কিন্তু শিবনাথ ও তার স্ত্রীর মধ্যে যে প্রাচীর তা হচ্ছে সম্পদের, গুপ্তপন্থার নয়। সন্ত্রাসবাদীদের সংস্পর্শ ত্যাগের পর তার জন্য উন্মোচিত হল নতুন দিগন্ত। চরিত্রদ্বয়ের পরিণতি যাই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথ ও তারা-শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি এক —তাঁরা উভয়েই সমন্বয়ধর্মী।

শিবনাথ অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদার। মায়ের মৃত্যুর পর শোকজনিত বৈরাগ্যে ও তার স্ত্রীর ঐশ্বর্যপ্রীতিতে তার মনে আবার দেশ বড় হয়ে দেখা দিল। কি করে দেশকে স্বাধীন করা যায়? শিবনাথ পথ পায় না। নিজের অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তার প্রতিকার করা যায় কিভাবে সে কথা শিবনাথ চিন্তা করে। সে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসের বইতে সূত্র খোঁজে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ কিছুটা অনুধাবন করে নিজেকে জমিদার ভাবতে তার অপরাধী মনে হয়।[১০] কিন্তু

১০ ॥ জোসেফ প্রুঁধোর বাণী পড়ে শিবনাথ জমিদারী সম্বন্ধে একটা সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে, সেটা হল, "Property is theft, because it enables him, who has not produced, to consume the fruits of other people's toil." (২৮০) এ

নিজেকে অপরাধী জেনেও নিজের জমিদারীর নিলাম বন্ধ করতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ তার প্রজারা তাকে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছে জমিদারী রক্ষা করতে, তাই পিতৃপুরুষের স্মৃতিজড়িত সম্পত্তি সে রক্ষা করেছে। দুর্ভিক্ষ থেকে তার জমিদারী বাঁচল কিনা সেটা তারাশঙ্কর বলেননি, তবে সে জমিদারী নায়েবের হাতে তুলে চরের মধ্যে যেয়ে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত হল। কৃষিকাজ, দুঃস্থের সেবা, নৈশবিদ্যালয় চালানো প্রভৃতি কাজে শিবনাথ দেশের সেবায় তৎপর হয়েও উপলব্ধি করল, "কিন্তু যে মূর্তিতে সে মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল এ মূর্তি সে মূর্তি নয়" (৩০৭)।

এর মধ্যে দেশে ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। চরকা, তাঁতের কাজ শিবনাথ তার এলাকায় প্রচলিত করল। সন্ত্রাসবাদী দলের বন্ধু সুশীল দেশত্যাগের আগে তাদের দলের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে গেল শিবনাথের কাছে। দেশের জনসাধারণ সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেনি, নির্বিকার দূরত্বে অবস্থান করেছে এমন অভিযোগ (৩১১) সুশীল করেছিল। শিবনাথ নিজে জনসাধারণের নিকটবর্তী হয়ে অবশ্য প্রত্যক্ষ করেছে যে, "স্বাধীনতা তাহাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য শব্দ ছাড়া কিছু নয়। সাহায্য তাহারা করিবে কোন প্রেরণায়?" (৩১১) —দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থের কোনো যোগ নেই এবং স্বাধীনতা আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের স্বার্থ-সংরক্ষণের আন্দোলন সে কথা তারাশঙ্কর বলেননি। শিবনাথকে দেখা যায় ঐ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে। 'সবচেয়ে আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসটিতে লেখকের নিজের মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

শিবনাথ যেভাবে দেশের মুক্তির কথা ভেবেছে তাতে তার ভাবনায় বাস্তব-বোধের তুলনায় ভাববাদের প্রাধান্য দেখা যায়। শিবনাথ নিজে কৃষিকাজে অংশ নিয়ে উৎপাদন বাড়ানোতে সাহায্য করেছে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের বদল না করে কৃষির উন্নতি হয় না। সে জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিজেই একটা চরম লক্ষ্য নয়, সে হচ্ছে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির একটা পথ। শিবনাথের সমস্ত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও সে ব্যর্থ হতে বাধ্য কেন না জমিদারী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে কৃষির ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। কাজেই 'স্বাধীনতা'কে অধিক ভাবময় ও আদর্শান্বিত করে লেখক তাকেই চরম লক্ষ্য ভেবেছেন। ইংরেজের জায়গায় কংগ্রেসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকে তিনি পরম লক্ষ্য ভেবেছেন, যেমন ভেবেছিল ভবানী পাঠক।

কথা জেনেও সে নিজের জমিদারী ছাড়তে পারেনি। না ছাড়বার জন্য জবাবদিহি শিবনাথ যা দিয়েছে তার মধ্যে আর যাই থাক কোনো সাম্যবাদী যুক্তি নেই।

'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী পাঠক মুসলমান রাজত্বের পর ইংরেজ রাজত্ব এলে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বা তারাশঙ্কর কেউ ভেবে দেখেননি রাজার অদল-বদলে জনসাধারণের মুক্তি আসবে কিনা, আসা সম্ভব কিনা। আন্দোলনগুলিই বা কাদের জন্য হচ্ছে, কার স্বার্থ এতে সংরক্ষিত হবে সেটা তারাশঙ্কর আন্দোলনের মধ্যে থেকেও দেখেননি। অথচ সাহিত্যিক জীবন শুরু করবার আগেই তিনি আন্দোলন সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রায় সর্বত্র অসহযোগ অহিংস আন্দোলনের প্রশংসা করে গেছেন। শিবনাথের ব্যক্তিগত সেবাপরায়ণ মরমী চরিত্রকে তিনি সজীব করে এঁকেছেন। নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন জমিদারের হাতে। শিবনাথরা না এগোলে যেন কেউ নির্ভয়ে আসতে চায় না। 'পল্লী সমাজ'-এর রমেশ, 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ--এরা যেন শিবনাথের পূর্বপুরুষ। জাতে জমিদার, হৃদয়ের প্রসারতায় উদার এবং আদর্শবাদী দেশসেবক। অবশ্য শিবনাথ শোণিতে জমিদার হলেও মানসিকতায় নিম্ন মধ্যবিত্ত, অথচ আদর্শে উচ্চলোকবাসী। নিখিলেশ অভিজাত। সে যে রাজবাড়ির প্রভু সেখানে সাধারণের অরুচিকর কোলাহল অন্দরে পৌঁছে তাকে বিপন্ন করলেও তার অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে না। শিবনাথের মতো নিখিলেশও প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবেছে। কিন্তু সে জনসাধারণের মধ্যে নেমে আসেনি, দূরবর্তী থেকেছে সাধারণের সংস্পর্শ থেকে। অথচ ট্রাজেডি এই যে, (যে ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করতে চান না।) জনসাধারণের হাতেই নিখিলেশের চরম পরিণতি নেমে এসেছে। জমিদাররা অনেকেই দেশের মঙ্গল করতে চেয়েছে, অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছে, কিন্তু জমিদারী প্রথা অক্ষুণ্ণ রেখে যে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না এ সত্যটা তারা এড়িয়ে গেছে।

নিখিলেশ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দিয়েই দেশের জন্য একটা আত্মিক মুক্তির কথা ভেবেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন নিখিলেশের সমালোচনার বস্তু। উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের অভাবে সে নিষ্ক্রিয়, ভাববাদী, প্রেমিক। দেশের মঙ্গলকামনা তার হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত, কিন্তু স্ত্রী বিমলার মনে একটা মঙ্গলবোধ জাগিয়ে তোলা তার প্রধান প্রয়াস হিসাবে আমরা দেখেছি। জনসাধারণের চেতনা জাগানোর তুলনায় ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটানোতে নিখিলেশ অধিক উৎসাহী। শিবনাথের সমস্যা অবশ্য ব্যক্তিত্বের নয়। তার প্রধান সংঘর্ষ শ্বশুরবাড়ির ধনগর্বের সঙ্গে। অর্থাৎ প্রাচীন সামন্তবাদের সঙ্গে উঠতি পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব, রক্তের সঙ্গে অর্থের বিরোধ। এই বিরোধের মধ্যে রাজনীতি রয়েছে। কারণ বিরোধে জয়ী হয়েছে সামন্তবাদ। লেখক নিজে সামন্তবাদের পক্ষেই। স্ত্রীর সহযোগিতা তথা স্বীকৃতি পেয়েই শিবনাথ সুখী। শিবনাথ নিখিলেশের মতো নিষ্ক্রিয় ভাবুক নয়, সে আদর্শবাদী ভাবুক হলেও কর্মী।

অসহযোগের নিষ্ক্রিয়তা তার রাজনৈতিক আদর্শে কোনো পরিবর্তন আনবে কিনা লেখক তা জানাননি —তার আগেই শিবনাথের সামনে কারাগারের লৌহকপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের আন্দোলনগুলি ইতিমধ্যে ক্রমশ গণমুখী হয়ে উঠেছে এবং রাজনীতিতে জনসাধারণের ভূমিকা শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারাশঙ্করও দৃষ্টি ফেরালেন জমিদার থেকে জনজীবনের দিকে। জনসাধারণের প্রতি তাঁর আগ্রহের প্রকাশ 'গণদেবতা' (১৩৪৯) এবং এর পরিপূরক উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ (১৩৫০) বিধৃত। উপন্যাস দুটি 'ব্যক্তিহীন গণজীবনের শোভাযাত্রা'। জনপদ জীবনের যে চিত্র এখানে প্রত্যক্ষ তা 'পল্লীসমাজ'এর মতো ব্রাহ্মণশাসিত নয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পঞ্চগ্রামের সব মানুষই প্রায় এক স্তরের। এদের জীবনে কিভাবে নবীন বিশ্বাস ও ধারণা পুরাতন মূল্যবোধগুলির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে লেখক সেই প্রক্রিয়ার চিত্র নির্মাতা। মাটি ও মানুষ কেন্দ্রিক এমন আলেখ্য, সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের এমন অপূর্ব চিত্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে কেউ অঙ্কন করেননি। অবশ্য চিত্র তিনি এঁকেছেন তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

চণ্ডীমণ্ডপ ছিল গ্রামীণজীবনের প্রতীক। এই চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত বর্মাচ্ছাদিত সামাজিক অর্থাৎ সামন্তবাদী অনুশাসনের ঐতিহ্য। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম্যসমাজের কর্তারা মজলিসে বসে বিচারে যে রায় দিত তা মানতে বাধ্য হত গ্রামবাসীরা। চণ্ডীমণ্ডপীয় মজলিসের ব্যর্থতা দিয়েই কাহিনীর সূচনা। সমাজশাসনকর্তারা আর আগেকার মতো ক্ষমতাবান নয়। কারণ পুরনো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বন্ধন ত্যাগ করে গ্রামের মানুষ চলে যাচ্ছে শহরে। এই সঙ্গে তাদের পুরনো মূল্যবোধও যাচ্ছে ভেঙে। অনিরুদ্ধ কর্মকার ও গিরীশ সূত্রধর গ্রামের কাজ ছেড়ে শহরে দোকান খুলেছে। এ দু'জন চলে যাওয়াতে গ্রামবাসীদের অসুবিধার অন্ত নেই। তাদের দুজনার বিচার করতেই চণ্ডীমণ্ডপে মজলিসের আয়োজন। এই সামাজিক মজলিসে প্রধান ব্যক্তিরা সামাজিক মানদণ্ডে মান্যে ও গুরুত্বে পরস্পরের প্রায় কাছাকাছি। আসরের মধ্যমণি ছিরুপাল —উত্তর জীবনে নাম পাল্টে যে শ্রীহরি ঘোষ হয়েছিল। চরিত্রহীন শ্রীহরি অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার। আর আছে মজলিসের এককোণে দাঁড়ানো একটু স্বতন্ত্র, পণ্ডিত দেবনাথ ঘোষ, ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। দেবনাথ মজলিসে অংশ নিয়েও নিস্পৃহ, সে জানে অনিরুদ্ধ কেন অন্যায় করতে সাহস পাচ্ছে। কারণ হচ্ছে ঐ শ্রীহরি। মজলিসে ঐ 'ছিরু'র প্রাধান্যই শুধু অনিরুদ্ধর নয় দেবুরও অনাস্থার কারণ। শ্রীহরি সম্পদশালী ব্যক্তি, তাকে এড়ানো অসম্ভব।[১১]

১১॥ শ্রীহরির রূপ ও স্বরূপ প্রায় অভিন্ন। লেখকের বর্ণনানুসারে, "শ্রীহরির

সদ্য শহুরে-ছোপ-লাগা গিরীশ ও অনিরুদ্ধ মজলিসের রায় মানল না। কাজের বদলে ধান এই পুরনো বিনিময় রীতিতে তারা যে পারিশ্রমিক পায় তা দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়। এই অমান্য করবার তেজী মনোভাবকেই যদি তারাশঙ্কর প্রধান বক্তব্য বলে গণ্য করতেন তাহলে অনিরুদ্ধই হত এ উপন্যাসের নায়ক। যদি অনিরুদ্ধর আচরণ তাঁর পছন্দ না হত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। একেবারে নিস্পৃহভাবে তিনি অনিরুদ্ধ-গিরীশের অবাধ্যতা, শ্রীহরির দাপট বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মনের মতো মানুষ পেলে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মনের মানুষ হচ্ছে উপন্যাসের নায়ক দেবু ঘোষ।

নতুন অর্থনীতি পুরাতন সামাজিক আঙ্গিকে যে রূপান্তর আনছে এই উপন্যাসদ্বয়ে তার প্রতিরূপ তুলে ধরা হয়েছে। পল্লীর সামাজিক শাসনের কারাগারে বন্দী অসহায় মানুষ যেন কতকটা মুক্তি পাচ্ছে শহরে গিয়ে, শহর এসে প্রবেশ করছে গ্রামে, গ্রামকে গ্রাস করছে শ্রীহরির 'সর্পিল জিহ্বা'। শ্রীহরি যতই সম্পদশালী হচ্ছে ততই সে ঘৃণিত হচ্ছে সম্পদহীনদের কাছে। পাশাপাশি জেগে উঠছে দেবু ঘোষ। দেবু মেধাবী ছাত্র, কিন্তু সুযোগের অভাবে উচ্চশিক্ষা পায়নি। নিজের নানাপ্রকার শুভবোধ দিয়ে সে গ্রামবাসীর মনে ধীরে ধীরে একটা সম্মানীয় আসন অধিকার করে নিচ্ছে। সমাজে শ্রীহরির প্রতিষ্ঠা ধনে, দেবুর প্রতিষ্ঠা মানুষের হৃদয় উৎসারিত প্রীতিতে। গ্রামসমাজ যে ছকভাঙা জীবনে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই রূপান্তরকে কোনো ছকবাঁধা প্রেমোপাখ্যানে বন্দরূপ দেননি তারাশঙ্কর। প্রেম নয়, ব্যক্তিও নয়, নিভৃতচারীতাও নয়—সামাজিক সত্তা-সংযুক্ত মানুষেরই বর্ণনা এখানে। মনঃসমীক্ষণ নয়, গণজীবন এর

বিশাল দেহ—কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদ শৈথিল্য নাই। বাঁশের মত মোটা হাতপায়ের হাড়—তাহাতে জড়ানো কঠিন মাংসপেশী। ...এতবড় দেহ লইয়া সে কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্রুত চলিতে পারে। পরের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সে রাতারাতি আনিয়া আপনার পুকুরে ফেলিয়া রাখে । খেপলা জাল ফেলিয়া রাত্রে সে পরের পুকুরের পোনামাছ আনিয়া নিজের পুকুরে বোঝাই করে, প্রতি বৎসর তাহার বাড়ির পাঁচিল সে নিজেই বর্ষার সময় কোদাল চালাইয়া ফেলিয়া দেয়, নতুন পাঁচিল দিবার সময় অপরের সীমানা অথবা রাস্তা খানিকটা চাপাইয়া লয়। ...এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই সে দন্তহীন; যৌন ব্যাধির আক্রমণে তাহার দাঁতগুলো প্রায় সবই পড়িয়া গিয়াছে।" —'গণদেবতা', তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

উপজীব্য এবং পটভূমি। দেবুর আদর্শায়িত হৃদয়ে (১৬৮) স্বগ্রামের মাটি ও মানুষের প্রতি আন্তরিক মমতা রয়েছে। শ্রীহরি ও দেবু গ্রামের জীবনযাত্রাকে দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে দেখতে চায়, চায় অবশ্য নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। গ্রামের সনাতন গতিধারার যেটুকু ছন্দপতন ঘটছে তা প্রধানত এদের মতো দু রকমের লোকদের জন্য।

শ্রীহরি উঠতি ধনতন্ত্রের গ্রামীণ প্রতীক —মুদ্রায় যার কৌলীন্য। এ ধরনের চরিত্র তারাশঙ্করের অপছন্দ হবারই কথা। কারণ তিনি মুদ্রার তুলনায় বংশকৌলীন্যকে শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু শ্রীহরির কোনো তীব্র সমালোচনা উপন্যাসে নেই। শ্রীহরির বিপরীতে যদি কোনো অভিজাত জমিদার দাঁড়াত তাহলে শ্রীহরিরা হেরে যেত নিশ্চয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ে জমিদার ও শ্রীহরিকে তিনি প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত করে চিত্রিত করেছেন। তাদের প্রবল কোনো দ্বন্দ্ব নেই বলেই মনে হয়, কারণ জমিদারের সেই আগেকার শক্তি নেই। শ্রীহরি একটা উঠতি শক্তি এবং কৃষিক্ষেত্রে সে এক ধরনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু শ্রীহরির আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে সামন্ততান্ত্রিক। দেবু তার প্রতিপক্ষ। শ্রীহরির মধ্যে যে বর্বরতা আছে দেবু তার প্রতিবাদ। সে আদর্শবাদী এবং সবার কল্যাণকামী। কিন্তু পুরনো জীবনযাত্রাকে পছন্দ করে ও পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায়। কাজেই শ্রীহরির সঙ্গে তার বিরোধের কারণ একটা পুরাতন সমাজ-ব্যববস্থাকে ভেঙে তার জায়গায় উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নয়, বরং শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব। সেই জন্যে সনাতন জীবনধারার গতিতে কিছুটা ছন্দপতন ঘটেছে বটে কিন্তু তার স্থানে নতুন কোনো ছন্দ গড়ে উঠছে না। দেবু গ্রামের প্রিয় ব্যক্তি। অথচ প্রধান ব্যক্তির ক্ষমতা অর্থবলে দখল করেছে শ্রীহরি।

অন্যের দুঃখদুর্দশার প্রতিকারের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে পরচির্কীর্ষু এই ব্যক্তিটি। দেবু ধনীদের পছন্দ করে না। বিশেষ করে জমিদার ও মহাজনদের সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তিক্ততম (১৬৮)। গ্রামের 'যাবতীয় অভাব অভিযোগ ত্রুটি-বিশৃঙ্খলা দেবুর নখদর্পণে'। অতি অবশ্যই দেবুর দৃষ্টিভঙ্গি সামন্ত-বাদী। কারণ ধর্মকর্মে মানুষের অমনোযোগ দেখে তার মনে হয়, 'দেবতাকে, ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে' (১৭২)। দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্কর দেবুর অন্তরে শুভবোধ দিয়েছেন, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা চালিত নয়। প্রথমত, সে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায়, সে ব্যবস্থার আচার-বিচার তার পছন্দসই। দ্বিতীয়ত, সে ধর্ম ও ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে আন্তরিক বিশ্বাস রাখে। কাজেই গ্রাম সম্বন্ধে দেবুর সচেতনতা একটা মঙ্গলবোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করলেও এ বোধ সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে যথাযথ বিশ্বাস ও আস্থা রাখবে না এটাই স্বাভাবিক।

সে জন্য তার চিন্তা হল কেন চণ্ডীমণ্ডপ তার পূর্বের গৌরব ও গুরুত্ব হারাল। মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ দেবুর এই প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। তারাশঙ্কর বিশ্বনাথকে এভাবে চিত্রিত করেছেন যে, সে শিক্ষিত অথচ সাম্যবাদের প্রভাবে পড়ে নাস্তিক হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ তার পিতামহের ধ্যানধারণা মানে না। চণ্ডীমণ্ডপ কেন অনাদৃত হয়ে উঠছে তার ব্যাখ্যা সে দিয়েছে অর্থনীতির বিচারে। সে বলেছে, "এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে পার? কর না ওই ঘরটাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেখবে দিন-রাত লোক আসবে এই-খানে। ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে" (১৭৩)। বিশ্বনাথ অনেক যুক্তি দিয়ে দেবুকে অর্থনীতির এই সত্য বোঝাতে চেয়েছে যে, "টাকাই সব, সেকালের ধর্মমত সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরেও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে না-কি ওই টাকাটা ছিল ধর্ম, কর্ম, স্বর্গ, মর্ত্য, নরক সমস্ত কিছুর ভিত্তি। ভিত্তির সেই টাকার মশালটা আজ শূন্য।" আর চণ্ডীমণ্ডপ উপরোক্ত কারণেই তার পূর্ব মহিমা হারিয়েছে। দেবু ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন। অর্থনীতির এমন নবতম ধর্মহীন ব্যাখ্যা শুনে সে আতঙ্কিত হয়ে সভয়ে প্রতিবাদ করেছে, "ছি-ছি-ছি, বিশুভাই। তুমি ঠাকুর-মশায়ের নাতি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত" (১৭৪)।

অর্থনীতির ধর্মহীন ব্যাখ্যা তারাশঙ্করের নিজেরও পছন্দ নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি তিনি নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু এই তত্ত্বের 'বস্তুবাদসর্বস্বতা'কে মানেননি কখনও। এই তত্ত্বের সঙ্গে তিনি ভারতীয় তত্ত্বের সমন্বয় দেখতে চেয়েছিলেন।[১২] যদিও এই সমন্বয় কেমন করে হবে সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

শাস্ত্রীয় বাণী স্মরণ করে দেবু মাঝেমধ্যে ভাবে, দেবতা একদিন জেগে উঠে অন্যায়ের ধ্বংস করে ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। এমন একটি ধারণা থাকলেও তার আহত পৌরুষ আঘাত পেয়ে রুখে দাঁড়ল। সেটেলমেণ্টের কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দেবু দিল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মতোই। এই ঘটনার ফলে দেবুর কারাদণ্ড হল, কিন্তু দেবু পেল তার বহুকাম্য সম্মানের স্থায়ী আসনটি। গ্রামবাসী তাকে সমর্থন জানাল, শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করল। আর কারাগারে গিয়ে দেবু রাজবন্দীদের সাহচর্যে সন্ধান পেল নতুন ভুবনের। গ্রামে ফিরে এসে নজর-বন্দী যতীনের কাছে দীক্ষিত হল দেবু। সময়টা যদিও উনিশ'শো সাতাশ সাল তবু অসহযোগের তরঙ্গ এ দিকে এসে লাগেনি। সমাজ শক্তিকে দুর্বল হতে দেখে

১২॥ 'আমার সাহিত্যজীবন', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

দেবু এতকাল ক্ষুব্ধ ছিল। রাজনৈতিক চেতনার সূচনায় সে ভাবল, গ্রামের সকলকে একত্র করে কাজ করবে। তার কারামুক্তির আগেই গ্রামে প্রজাসমিতির সঙ্গে কংগ্রেস কমিটিও গঠিত হয়েছে। দেবুর জন্য অপেক্ষা করেছিল যতীন —যোগ্য নেতা চাই গ্রামবাসীর জন্য। যতীন জানে, কোনো বহিরাগত পারবে না গ্রামবাসীকে জাগিয়ে তুলতে। গ্রামেরই লোক প্রয়োজন এ কাজের জন্য।

পল্লীর ঘরবাড়ি দিনদিন জীর্ণ ও মানুষগুলি কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। যতীন চাচ্ছে প্রজাসমিতি গড়ে এর একটা বিহিত করতে। শ্রীহরির ঘরে শ্রীহীন চাষীদের ধান জমা হচ্ছে, নিরন্ন হয়ে পড়ছে চাষীরা। এখানে প্রজা সমিতির কাজকর্ম চালু রাখা দুঃসাধ্য। কারণ যতীন ভেবে দেখেছে, এ ব্যাপারে প্রথম সংঘর্ষই তো লাগবে শ্রীহরির সঙ্গে সমিতির। কার্যত দেখা গেল তা-ই। সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য চণ্ডীমণ্ডপে সমিতির কোনো কাজ শ্রীহরি হতে দেয় না। কারণ সেই হয়ে দাঁড়িয়েছে চণ্ডীমণ্ডপের স্বেচ্ছামালিক। এ বিষয়ে যতীন দেবুকে প্রশ্ন করলে দেবু সঠিক জবাব দিতে পারেনি —পারেননি লেখকও। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে দেবু দীর্ঘকাল পরে গ্রামে এসেছে এবং দেখেছে চণ্ডীমণ্ডপের একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছে শ্রীহরি। তার কপালে 'তিলক ফোঁটা' কাটা এবং সে হয়েছে পরম ধার্মিক। দেবু সব শুনেও নির্বাক থেকেছে। একবারও শ্রীহরির তথাকথিত ভণ্ড ধার্মিকতার সমালোচনা করেনি, পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। অথচ দেবু সেই সঙ্গেই দেখেছে শ্রীহরির 'হিংস্র জানোয়ার'-এর মতো নখের আঁচড় ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে পঞ্চগ্রামের জীবনকে। পাপকে প্রত্যক্ষ করেও পাপীকে তারাশঙ্কর দেখাতে চান না। এ তাঁর নীতিবহির্ভূত। তিনি বলেছেন, "··· পাপীকে উচ্ছেদ করে পাপকে উচ্ছেদ করা যায় না। পাপকে বিগলিত করতে হবে। Elimination নয় Sublimation। আড়াই হাজার বছর ধরে এই সাধনা চলেছে ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মাজী জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন ভারতের এই সাধনার অব্যাহত প্রবহমানতা। ভারতীয় দৃষ্টিতে ভারতের এই ইতিহাসের উপলব্ধি। পাশ্চাত্য মতে ইতিহাস ব্যাখ্যাতা আমাকে ভ্রান্ত এমন কি অজ্ঞও বলতে পারেন, বলুন।"[১৩] তিনি পাপীকে যেমন দেখাননি তেমনি দেখাননি রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে কাদের বিরুদ্ধে ও কেন। এও বলেননি অসহযোগ সম্পর্কে শ্রীহরির ধারণাটা কি?

দেবু প্রজাসমিতির ভার গ্রহণ করল। কৃষকরা তার নেতৃত্বে আগের তুলনায় অধিক স্বার্থসচেতন হয়ে উঠল। যতীনই দেবুকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিল। যতীন গ্রাম থেকে বিদায় নেবার সময় কর্মী দেবুকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে ভেবেছে,

১৩॥ 'আমার সাহিত্যজীবন', দ্বিতীয় পর্ব, (১৩৬৯), পৃ ১৫০।

"বন্দীজীবনে এই পল্লীর মধ্যে দেবুর জাগরণে সে সাহায্য করিয়াছে। বন্দীত্ব তাহার নিজের জীবনের জাগরণের ভাবপ্লাবনের গতিরোধ করিতে পারে নাই" (৩৭০)। প্রজাসমিতিকে দুর্বল করবার জন্য সচেষ্ট হল শ্রীহরি। শ্রীহরির সুন্দর বাগানখানা অনিরুদ্ধ প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে কেটে ছিঁড়ে নষ্ট করে দিল। এ বিষয়ে তদন্ত করতে এসে পুলিশের ইন্সপেক্টার প্রজাসমিতির প্রেরণাসৃষ্টির দিকটি আবিষ্কার করেছে।[১৪] দেবু যতই সেবাধর্ম পালন করুক না কেন, যতই উদারহৃদয় হোক না কেন, সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দেবু সৎকাজের পুণ্যফলে বিশ্বাসী, "বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য নয়, এ সংসারে একটা পরম তত্ত্ব আছে—সে পুণ্য, সে ধর্ম। তাহার পুণ্য তাহাকে রক্ষা করিবে" (৩৫৩-৫৪) সে এমন কথা বলেছিল কলেরা মহামারীতে সেবা করতে গিয়ে জীবাণুর সংস্পর্শে এসে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য ধর্ম-বিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করে তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের মৃত্যু টেনে আনল। দেবুর এমন পরিণতিতে গ্রামবাসী তাকে দিল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মান। 'দারোগার রক্তচক্ষু, শ্রীহরির শাসন, মহামারীর আক্রমণ সে উপেক্ষা করিবার শক্তি রাখে।' মরণোন্মুখ গ্রামবাসীর সে আশ্বাসস্থল। যতীন তাকে দিয়েছে 'একটি সুস্পষ্ট আদর্শ'। এতদ্‌সত্ত্বেও দেবু সামন্তবাদী। সমস্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দেবুর ভাববাদ দূর হয় না. তার দুর্বলতা রয়েছে সামন্তবাদের প্রতি। সামন্তবাদ মানবমুক্তির শত্রু, তাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে গ্রামের মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। সামন্তবাদ যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কর্তৃক প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমর্থিত এ সত্য অবজ্ঞা করে যাচ্ছে দেবু, যেমন অবজ্ঞা করেছেন তারাশঙ্করও। দেবুতে ও তারাশঙ্করে কোনো দূরত্ব নেই।

গ্রামে খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার আন্দোলন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক দেবুর ওপর আস্থা রেখেছে। মুসলমান কৃষকদের দেবুর মতো একজন সুহৃদ আছে, সে হচ্ছে কুসুমপুরের পাঠশালার মৌলভী ইরসাদ। ইরসাদ দেবুকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। ইরসাদ দেবুর মতো মানবতাবাদী এবং রাজনীতি-সচেতন। মুসলমানদের জীবনযাত্রা হিন্দুদের মতোই একই ধাঁচের। মুসলমানদের শ্রীহরি হচ্ছে সুদখোর দৌলত শেখ। খাজনা-বন্ধ আন্দোলন যাতে সার্থক না হয় সে জন্য উভয় সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিরা স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর হয়ে দেবুর নামে কুৎসা রটনা করল। হিন্দু মুসলমান উভয়েই দেবুর ওপর আর আস্থা রাখতে পারল না। প্রজা ধর্মঘটের অপমৃত্যু এভাবে ঘটল। বিস্ময়ের কথা এই যে, অধিকাংশ গ্রামবাসী ভিত্তিহীন অপবাদ

১৪॥ ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধর দুঃসাহস দেখে বলেছিল, "প্রজা সমিতি এ কাজ করতে বলে নাই এটা ঠিক, কিন্তু প্রজা সমিতি যদি না থাকত গ্রামে—তবে এ কাজ হত না। এতে আমি নিঃসন্দেহ" (৩৩৭)।

বিশ্বাস করল —সামন্তবাদের এমনি শক্তি! দেবু এ আঘাত সহ্য করে নিল তার অন্তরের শক্তি দিয়ে। সে গ্রামবাসীর যথার্থ মঙ্গলকামী। সে জন্য বন্যা-ত্রাণ সমিতির কাজ আবার যখন তার হাতেই অর্পিত হল দেবু সে ভার গ্রহণ করল।

পঞ্চগ্রামে একটা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের চিত্র দেখে দেবু অত্যন্ত বিষণ্ণবোধ করে। গ্রাম ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ল তীর্থযাত্রায়। কিন্তু ছয়মাস পরই সে ফিরে আসে স্বগ্রামে। ভারতবর্ষ ব্যাপী অসহযোগের স্পর্শে জেগে-ওঠা প্রাণের বাণী দেখে দেবু পরম আনন্দে ফিরে এসে কাজ শুরু করল। তখন শুরু হয়েছে উনিশ'শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। পঞ্চগ্রামে সে উত্তেজনার স্পর্শ লেগেছে। গ্রামের ঘরে ঘরে চলছে চরকা, বাউড়ী মুচীরা মদ ছেড়েছে, মিটিং হচ্ছে দিকে দিকে। দেবুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে কি দেখে চলে গিয়েছিল আর এসে কি দেখল। মানুষগুলিকে শীর্ণতা সত্ত্বেও কাজের উদ্দীপনায় নবীন দেখাচ্ছে। দেবু যোগ্য কর্মক্ষেত্র পেয়ে গ্রামবাসীকে জেগে উঠবার কাজে সাহায্য করতে শুরু করল। দেবুর এ বার কারাবাস হল তিন বছরের।

তিন বছর পর আবার দেবু তার গ্রামে ফিরে এসে পুরনো সকরুণ চিত্র দেখল, 'অনাহারে রোগে আবার পঞ্চগ্রাম মরিতে বসিয়াছে' (পঞ্চগ্রাম, তা র., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৪)। শুধু তাই নয়, 'পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে (২৮৭)। অসহযোগ সফল হবে কিনা সে কথা দেবু ভেবে দেখেনি। ১৯৩০ সালের আন্দোলনের উত্তেজনায় গ্রামবাসী দেবুকে প্রশ্ন করেছিল যে, এ আন্দোলনের ফলে তাদের কি লাভ হবে। দেবু নিজেই জানত না কি লাভ হবে। একটা অস্পষ্ট ধারণা ও কল্পনার সংমিশ্রণ করে, "সে সেদিন বলিয়াছিল— উহার মধ্যে মিলিবে সর্ববিধ কাম্য। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, অভয়।... লোকে মুগ্ধ হইয়া তাই শুনিয়াছিল।... তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিল—সত্যযুগের কথা" (২৮৮)। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, "১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনা-প্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে। যা ঘটে নাই—সকলে যা ঘটতে পারেনা বলে ভাবে—তাই ঘটবে—সেই আকাশকুসুম ফোটানোর উন্মাদনাই বড় ছিল" (৩৩)।

গ্রামের লোকজন অবশ্য দেবুর নেতৃত্বে ভরসা রেখেছিল। দেবু নিজে আস্থা রেখেছিল সর্বভারতীয় নেতৃত্বের ওপর। নেতারা ব্যর্থ হলে সেও ব্যর্থ হল। কিন্তু এর জন্য দেবু নেতাদের কোনো সমালোচনা করেনি কোথাও। সে রাজনীতির ক্ষেত্রে আদর্শবাহিত প্রেরণার একটি ধারা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের গোরা তার ধর্মমুক্তিতে একটা মানসিক সর্বভারতীয়ত্ব পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামেই সে কতটা গ্রহণযোগ্য হত (চরঘোষপুরে গোরার অবস্থানকালে যেমন হয়েছিলে) এবং গ্রামবাসী তাকে কতটা আস্থা জানাত সে বিষয়ে একটা সন্দেহ থেকে যায়। গোরা গ্রামীণ জীবনে হত অতিথি, বহিরাগত। দেবু কিন্তু তা নয়। সে পঞ্চগ্রামেই আজীবন রয়েছে। সর্বোপরি, সে সবার প্রিয়জন। এমন কাছের মানুষকে ভালোবাসা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়, এমন কি স্নেহও জানাতে পারে লোকে। সবার আপনজন হয়েও নিজের আদর্শবোধ ও আদর্শ সফল করবার প্রয়াসে দেবু স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। সে নতুন উদ্যমে স্বর্ণকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলবে। যেমন অপূর্ব চলতে চেয়েছিল ভারতীকে সঙ্গে নিয়ে, গ্রামে ফিরে গিয়ে, সেবাধর্ম পালন করবার পরিকল্পনায়। স্বর্ণকে দেবু ব্যক্তিত্বময়ী হতে সাহায্য করেছে। শিক্ষিত হয়েছে স্বর্ণ। স্বর্ণকে নিয়ে বিপত্নীক দেবু আরম্ভ করবে 'সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ধর্মের সংসার'।[১৫] এ শুধু স্বপ্ন নয়, এ তার বিশ্বাস। তার প্রত্যয়ই তাকে উজ্জীবনী শক্তি এনে দেয়। এমন আশ্বাস ও বিশ্বাস দেবুর স্রষ্টার নিজেরও। বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে এক অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, "আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, অন্তরে স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম। ...'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী'তে নোতুন করে সেইকথা বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা। জীবন-মুক্তি বলতে ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। সেই তার অভিযান।... সে সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের

১৫॥ স্বর্ণকে দেবু তার অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নিল বর্ণাঢ্য চিত্র বর্ণনা করে, "পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার; সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা; অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম, মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল দেহ আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে—বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলা-ফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার, পথ ঘাট..." (পৃ. ১৯৬)।

মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি সংগ্রামকেই অনুভব করেছিলাম আমি।"১৬ —এই অনুভব থেকেই দেবুও তার ধর্মের সংসারের ছবি তুলে ধরেছিল।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এঁরা সকলেই গ্রামকে সেবা করার উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের শোষণে শহর ও পল্লী উভয়েই যে পীড়িত এবং বিচ্ছিন্ন, সীমিত সেবার দ্বারা দেশের অবস্থার যে পরিবর্তন করা যায় না এ সত্য তাঁরা উন্মোচিত করেননি। কেবলমাত্র সন্ত্রাস-বাদী সবাসাচী এহেন ক্ষুদ্র প্রয়াসে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু সেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, সামন্তবাদকে বাঁচিয়ে রেখে। এরা সবাই বিচ্ছিন্ন সমগ্র দেশের প্রবাহ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও সামন্তবাদী বন্ধনকে পরিবর্তিত না করে কি সন্ত্রাস, কি সংস্কারকাজ —কোনোটাই সার্থক হতে পারে না। 'পল্লী-সমাজ' এর রমেশের মতো দেবুও সংস্কারক, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন না এনে পরিবর্তন আনতে চায় মানুষের জীবনে, যা একে-বারেই অসম্ভব।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ দুটি রাজনৈতিক কর্মী চরিত্র রয়েছে। নজরবন্দী যতীন ত্রিশ সালের অসহযোগের আগে পঞ্চগ্রামের অস্ফুট রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সাহায্যকারী চরিত্র। সে পঞ্চগ্রামের প্রিয় অতিথি। বন্দীজীবনেও সে দেবুকে জাগাতে সাহায্য করেছে। দেবু ও যতীনের সম্মিলিত শুভবোধ এই যে, "নূতন কালের ঘর্ষণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে—মানুষ বাঁচিবে। ভয় নাই, ভয় নাই" (গ ৩৭০)। সাম্যবাদী বিশ্বনাথ যতীনদের দল ত্যাগ করে সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়েছে। অথচ বিশ্বনাথের পিতামহ এ অঞ্চলের সবাধিক ধার্মিক নিষ্ঠা-সম্পন্ন ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। যতীন বহিরাগত হয়েও গ্রামে যে আপনবকতা পেয়েছে বিশু গ্রামের ছেলে হয়েও সেটা পাচ্ছে না। কারণ বিশ্ব নাথের বংশ-পরিচয় তার সাম্যবাদী ধারণার সঙ্গে বেমানান, বিশ্বনাথ নিজেও তার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সংস্কারে আস্থা রাখে না। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাতেই তার অনাস্থা, কারণ সে সাম্যবাদী। পিতামহ ও পৌত্র উভয়েই গ্রামীণ সমাজে মানানসই নয়। পিতামহ এ যুগে তার ধ্যান-ধারণার জন্য যতই শ্রদ্ধেয় হোক না কেন তার জীবন ও ধারণা অচল। আর পৌত্র ঐতিহ্যহীন-ধর্মহীন অতি প্রাগ্রসর বোধে উদ্দীপ্ত। তারাশঙ্কর তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ঢেলে দিয়েছেন মহামহোপাধ্যায়ের জন্য। ধর্মের প্রতি অতি নিষ্ঠাবান এই চরিত্রটিকে তিনি সমাজপতির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারলে সর্বাধিক সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু জীবন-ঘনিষ্ঠ লেখক বলে এবং তাঁর সামন্তবাদী মানসিকতা সত্ত্বেও এ সত্যটাকে উপেক্ষা করতে পারেননি যে, ন্যায়রত্নদের যতই শ্রদ্ধা-ভক্তি করা

১৬॥ 'আমার সাহিত্যজীবন', দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১

যাক না কেন তাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তারা সমাজপতির ভার বহন করতে পারে না। এদের জায়গায় এসেছে নব্যধারার নেতা।

সাম্যবাদী বিশ্বনাথ যদি সাম্যবাদী কংগ্রেসী চিন্তাধারার মধ্যে একটা সমন্বয় করে চলতে পারত তাহলে হয়তো গ্রামীণ মানসে সে সার্থকভাবে প্রভাব ফেলতে পারত। কিন্তু বিশ্বনাথ আপসের পথে গেল না। গ্রামবাসী তাকে গ্রহণ করল না। তারাশঙ্কর দেখাতে চাচ্ছেন যে, শুধু দেবুর ধারাটাই সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তির পথ খুঁজছে। বিশ্বনাথ একবার তার পিতামহর সঙ্গে তর্কের মধ্যে বলেছিল যে, তার সমর্থিত সাম্যবাদ যদি কখনো এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দেবুকে হতে হবে পলাতক নয়তো নির্বাক দ্রষ্টা। কারণ সমাজকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে বদলাতে চায় বিশ্বনাথ। কিন্তু তারাশঙ্করের দেবুর সে পথ বাঞ্ছিত নয়। লেখক ভেঙে ফেলতে চান না পুরাতন সামন্তবাদী জীবন যাপন প্রণালী। তিনি রক্ষণশীল, যে-জন্য নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক চান না সর্বান্তকরণে। এ কারণে বিশ্বনাথের ধর্মহীন, ইহলৌকিক সমাজ-চিন্তার ঠাঁই হয়নি দেবুর মনে। অথচ দেবুর কল্পিত স্বপ্নাচ্ছন্ন বিশ্বাসও উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। তারাশঙ্কর ভেবে দেখতে চাননি, কোন পথে দেবুদের মুক্তি সম্ভব। বিশ্বনাথের পথ দেবু সভয়ে পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিধর্মী বলেও আখ্যায়িত করেছে। কারাগারে বিশ্বনাথের অপমৃত্যুর চিত্র এ দেশের সমন্বয়পন্থী মানসিকতার প্রতিফলন এবং প্রতিফলও।

অথচ তারাশঙ্কর শ্রীহরিকেও সম্পূর্ণ রূপে অবলোকন করেননি। দেখতে চাননি কার অনুগ্রহে এবং কেন তার এমন পরিপুষ্টি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কেনই বা শ্রীহরিকে পুষ্ট করে তুলতে চায়, তাদের পালন করে পুলিশ, থানা হাকিমের সাহায্যে। দেবু এক সময় কল্পনা করত যদি কখনো ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে বিজয়ী হয় তবে সে গ্রামে রাস্তাঘাটের আমূল সংস্কার সাধন করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো আদর্শ ছাড়াই ইউনিয়ন, লোকাল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সমস্ত ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে শ্রীহরি ও কঙ্কনার বাবুরা। তারাশঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্পেষণের স্বরূপ যেমন দেখাননি, তেমনি বিরত থেকেছেন শ্রীহরির খল চরিত্রটির প্রতি কোনো চরম মনোভাব দেখানো থেকে। কারণ তিনি চরমপন্থী নন। দ্বন্দ্বের নয়, সমন্বয়ের পথ খুঁজেছেন দেবুর মধ্য দিয়ে, যে দেবু ধর্ম ও রাজনীতি কোনোটিকেই পরিত্যাগ করেনি।

'পঞ্চগ্রাম'-এর দায়সারা একটা সমস্যার সমাধান তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই সেটা সমন্বয়ের চিত্র এবং অবাস্তবও। এরপর তিনি সমস্যা-সঙ্কুল নগরের দিকে চোখ ফেরালেন। তারাশঙ্কর এ সময়ে বেশ দ্বিধাযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মকথায় বলেছেন যে, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘের সভাপতি রূপে তিনি সাম্যবাদের প্রভাবে অনেকটা 'আচ্ছন্ন' হয়ে পড়ে-

ছিলেন। সেই সাম্যবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) রচনা করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও যুদ্ধসৃষ্ট মন্বন্তরের পটভূমিতে সাম্যবাদী চরিত্র চরিত্রায়িত করা যেন তাঁর কাছে সহজ মনে হয়েছে। কারণ তাঁর সৃষ্ট 'গণদেবতা'র বিশ্বনাথ চরিত্রটি সাম্যবাদী, কিন্তু দেবু বিশ্বনাথের ধর্মহীন ইহলৌকিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা একেবারে গ্রহণ করেনি। তারাশঙ্করের মতবাদই দেবুর মত। এ মত তিনি আজীবন পোষণ করে গেছেন। কাজেই 'মন্বন্তর'-এ প্রকাশিত সাম্যবাদ সম্পর্কে সংশয় থাকবার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। 'মন্বন্তর' রচনার সময়ে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল কম্যুনিস্টদের হাতে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়া বিচিত্র ছিল না।

চক্রবর্তীবাড়ি অভিশপ্ত, অনেকটা সংক্রামক রোগের মতো। সুখময় চক্রবর্তীর উত্তরাধিকারী হচ্ছে কানাই। কানাই শিক্ষিত। তার বংশের দূষিত রক্তসঞ্চালিত ব্যাধি ও বিকৃতি থেকে সে মুক্ত। এ বাড়ির ছেলে হয়েও সে ব্যতিক্রম। যুদ্ধের ফলে মহানগরীর চারদিকে ধ্বংসের ছবি দেখা যাচ্ছে। তারাশঙ্কর বলেছেন যে, "যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে, বিশেষ ক'রে ব্যবসায়ী মহলে যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে উঠছে এবং অন্যদিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায়ভাবে যে আত্মবিক্রয় করছে সেই কথাটাই বলবার ছিল। এই পটভূমিতে পড়ন্ত ধনী ঘরের বিকৃত রূপ যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে বাঁচবার চেষ্টায় একাংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে।"[১৭] যুদ্ধের প্রভাবে যে সর্বনাশ সমাজে দেখা দিয়েছে তা তিনি বলেছেন, কিন্তু যুদ্ধের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোন কৌশলে যুদ্ধ লাগল এবং এ দেশে বিকার ছড়াল তার উল্লেখ 'মন্বন্তর'-এ নেই।

তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর' প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "মন্বন্তরে'র মধ্যে ক্ষোভ আছে কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের উপর, ইংরেজ রাজশক্তির বিরোধী মনোভাবই তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। পচনশীল বিলাসীর গৃহের পতন তার বিষয়বস্তু।"[১৮] অথচ আমরা দেখছি যে, 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর'-এ ইংরেজ রাজত্ব বিরোধী কথা প্রায় নেই-ই। ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব 'মন্বন্তর'-এ সোচ্চার নয়। কালোবাজারীদের তুলনায় বহুগুণে দুশ্চরিত্র ছিল 'গণদেবতা'র শ্রীহরি। কিন্তু জোতদার ও মহাজন শ্রীহরির তুলনায় তিনি কালোবাজারী রায়বাহাদুর বি মুখার্জিকে অনেক বেশী বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছেন। উভয়েই সমাজের চোখে অপরাধী কিন্তু তারাশঙ্কর জোতদার-মহাজনদের অপরাধের কথা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, কালোবাজারী ব্যবসায়ী তাঁর কাছে ঘৃণ্য ও সমালোচিত। তিনি সামন্তবাদী

১৭॥ 'মন্বন্তর', তা. র., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯।

১৮॥ 'আমার সাহিত্যজীবন', দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলেই এমনটা হতে পেরেছে। তারাশঙ্কর তাঁর সমাজের শক্তিহীনতা দেখে একবার বলেছিলেন, "সে মুমূর্ষু —শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে। চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।"[১৯] কিন্তু তাঁর এই স্মৃতিকথার দৃপ্তবোধটি তাঁর রচিত সাহিত্যের কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। অচলায়তন সমাজ এবং অনড় বিদেশী রাজশক্তি দুটোকে সরাবার গুরুভার দেবু নিতে পারে না। দেবু এ ধারায় চিন্তাই করেনি। এই বিরাট কার্যোদ্যমের এ বিপুল দায়িত্ব যারা বহন করবে তাদের থাকবে একটি দলবদ্ধ সংগঠন এবং উপযুক্ত কর্মসূচী। সাম্যবাদী দলের যে প্রধান দুটি কাজ 'মন্বন্তর'-এ দেখা যায় তার একটি হচ্ছে বক্তৃতা ও সভাসমিতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে একটা চেতনার সঞ্চার করা, দ্বিতীয়টি তাদের সেবা ও ত্রাণ কাজে তৎপরতা। কর্মীদের দেওয়া বক্তৃতাগুলি আদপেই অগ্নিবর্ষী নয়, সে বক্তৃতাগুলি অনেকটা 'পথের দাবী'র সভ্যদের মজুরদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতার মতো অর্থহীন।

সেবাত্রাণ কাজ তারাশঙ্করের অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ। সাম্যবাদী দলের সেবাত্রাণ কাজের উদ্যমী হওয়ার ব্যাখ্যাও তিনি পরে তাঁর স্মৃতিকথায় দিয়েছেন।[২০] বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের কিছু পরে এ উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে। অথচ বিয়াল্লিশের জনজাগরণ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ

১৯ ॥ 'আমার সাহিত্যজীবন', প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

২০ ॥ তৎকালীন ভারতের কম্যুনিস্টদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তাঁরা সেদিন যে তৎপরতার ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন তার প্রশংসা আজও করছি। বিশেষ ক'রে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এঁদের কর্মীরা। সে সময় সেইটেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।" পরে অবশ্য তিনি ঐ ধরনের সেবাকাজের পেছনে অন্য দুরভিসন্ধি দেখছেন, "তখন সঠিক বুঝতে পারিনি যে, আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বা রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যের খাতিরে দেশের সংগ্রামের বিরোধিতা করার অপরাধ এই একমাত্র আবরণ দিয়ে আবৃত করা ছাড়া এঁদের উপায় ছিল না।" 'আমার সাহিত্যজীবন', দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ১৩১।

তিনি এখানে করেননি। এ আন্দোলনের কোনো প্রভাবও তিনি দেখাননি। বিয়াল্লিশের গণ-অভ্যুত্থান কংগ্রেস নেতাদের মনঃপূত হয়নি। অসহযোগের অসফলতার প্রতিক্রিয়ায় ঐ বিশাল গণ-অভ্যুত্থান। সমালোচকরা তাঁকে আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নির্বিকার থাকার জন্য অভিযুক্ত করলে তিনি লিখেছিলেন যে, "আগস্ট বিপ্লব সম্পর্কে গোটা 'মন্বন্তরে'র মধ্যে কোথাও বিরোধী বা বিরুদ্ধ-বাদী উক্তি নেই।"[২১] তিনি সাম্যবাদীদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন অথচ জন-জাগরণকে যথোচিত মর্যাদা দিচ্ছেন না, আর এমন অপারগতাতে ধরা পড়ে যে, তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারায় অসঙ্গতি ছিল।

পঞ্চগ্রামের গ্রামীণ জীবনে ইহলৌকিকে বিশ্বাসী সাম্যবাদী বিশ্বনাথের স্থান হয়নি। তারাশঙ্কর যতীন ও বিশ্বনাথ এই দুই মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক পন্থার গ্রামীণ প্রয়োগ দেখাতে চেয়েছেন। যতীনের চায়ের আসরে দেবুর কারামুক্তির আগে বা পরে যত লোক এসেছে তাদের কাউকেই যতীন রাজনৈতিক চেতনার বীজ রোপণ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করেনি। যতীন প্রতীক্ষায় ছিল অর্ধশিক্ষিত, উদার, অন্যায়ে অসহিষ্ণু গ্রাম্য নায়কটির জন্য।[২২] অশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত, গ্রাম এবং শহরের মধ্যবর্তী যোগসূত্র রূপে দেবুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেবু উপন্যাসের শেষে এমন স্বপ্ন দেখছে যেন চার যুগ তপস্যার ফলে যে নব যুগ আসবে তাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে শস্যবাহিত যানবাহন। কিন্তু তপস্যাই বা করল কারা এবং ফলভোগই বা করবে কারা এমন প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি বা দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ দরিদ্র ব্যক্তিদের আত্মা নেই, আছে সদাজাগ্রত ক্ষুধা। আত্মার উন্নতি বা সাধনার কথা তারা ভাবেই না, তাদের দাবি বেঁচে থাকার মতো স্বচ্ছলতা। বেঁচে থাকার সংগ্রামে ডাকলে দরিদ্র জনগণ জেগে উঠবে—তারাশঙ্কর এ কথা জানতেন কিন্তু মানতেন না।[২৩]

২১॥ 'আমার সাহিত্যজীবন', দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

২২॥ যতীন বলেছিল, "আমি তো কিছু করব না, আমার কববার কথাও নয়। করতে হবে আপনাকে, দেবুবাবু। নইলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আপনার অপেক্ষা করছিলাম কেন?" (পৃ. ২৫৮)।

২৩॥ তারাশঙ্কর ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের আনন্দ,বর্ণনা করে স্বাধীনতা দিবসে দরিদ্র ব্যক্তিদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এইভাবে, "দরিদ্র নিরক্ষর ব্রাত্য যারা তাদের ঘরে শঙ্খ ছিল না—সম্ভবতঃ স্বাধীনতার সম্যক অর্থ তারা বোঝেনি, তবুও তাদের বুকে ওই আনন্দ তরঙ্গের ঢেউ লেগেছিল—তারাও জেগেছিল," —'আমার কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২।

এদের জাগরণের জন্য চাই ইহলৌকিক কার্যসূচীসম্পন্ন কোনো পন্থা। চাই ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন। আর কানাই, নেপী, নীলার মতো অসংখ্য কর্মী। কিন্তু তারাশঙ্কর-বর্ণিত বক্তৃতা আর ত্রাণকাজে সেই ব্যাপক কর্মসূচী কোথাও নেই।

'গণদেবতা' বা 'পঞ্চগ্রাম'-এ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। দূর-দূরান্তের দরিদ্র পল্লীবাসীর জীবন অর্থনৈতিক কাঠামোব হাড়ি-কাঠে বন্দী। এই দরিদ্রদ্রের সমস্যা টিঁকে থাকার। কংগ্রেসী রাজনীতির মুক্তিসাধনার কথাতে তাদের তেমন সাড়া দেবার কথা নয়। দেশের মুক্তিতে তাদের মুক্তি আসবে এমন কথাটা বোঝানো গেলে তারা সংগ্রামে অংশ নেবে। সফল রাজনীতি তাদের মুক্তি দিতে পারে এ কথা তাদের জানানো হয়নি। শ্রীহরিদের পীড়নে গ্রামবাসী অসুস্থ (১৩৪)। শ্রীহরির সঙ্গে অর্থ নৈতিক বোঝাপড়া করতে গিয়েই তারা শ্রান্ত এবং সর্বস্বান্তও। যুদ্ধকালীন মন্বন্তরে নগরও ধুঁকছে। নগরের কালোবাজারীরা স্বাধীনতা-সচেতন। কারণ স্বাধীনতা পেলে স্বাধীন রাষ্ট্রে তাদের একচ্ছত্র শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হবে (১৫১)। তারাশঙ্কর কালোবাজারীদের স্বাধীনতা-প্রীতিকে শ্রেণীস্বার্থ রূপে দেখেছেন, কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনকে সে দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কোথাও করেননি। আর স্পষ্ট করে বলেননি কোন শক্তি মজুতদারদের পুষ্ট করে, বাড়তে দেয়। তারা-শঙ্কর তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বণিকদের সুনজরে দেখেননি। সামন্তবাদী জমিদাররাই তাঁর ভক্তি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি যে শুধু বণিকদের নয়, মধ্যবিত্তেরও সুবিধা আদায়ের আন্দোলন —এ সত্য তিনি দেখাতে চাননি।

'পচনশীল পতনশীল বিলাসী গৃহ'-এর কানাই কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। সে ভালো বক্তা, কিন্তু তাকে পার্টির কাজে বিশেষ তৎপর হতে দেখা যায় না। তার লেখায় এবং বক্তৃতায় একটা ভাববাদী আদর্শ দেখা যায়। আসলে কানাই বিব্রত নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। বংশগত উন্মাদরোগের সম্ভাবনা নিয়ে সে কি করে দেশের কাজে মনোনিবেশ করবে। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সামন্তবাদী জমিদারতন্ত্রের সমালোচনা করলেও ঐ 'মরা পাহাড়ের চুড়া'র প্রতি তাঁর আজন্ম সম্ভ্রমবোধ এখানেও উপস্থিত। এ বোধ তাঁর কোনোদিন নষ্ট হয়নি।

'মন্বন্তর' উপন্যাসের সাম্যবাদী চরিত্রগুলি সাম্যবাদে যথার্থ দীক্ষিত কিনা তার নিরীক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে গান্ধী সম্পর্কে তাদের মনোভাবে। এ উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্রসমূহে অবৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের একটা মনোভাব দেখা যায়। যে নীলা সাম্যবাদী আদর্শের জন্য গৃহত্যাগী, সে গান্ধীর তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনের সংবাদে 'চমকে' ওঠে ও খবরটি পড়ে 'নিস্পন্দ' হয়ে যায়। এই

অনশনের শেষ দিনগুলিতে নীলার বিপ্লবী ভাই নেপীর তরুণ মনে 'অবৈজ্ঞানিক প্রত্যাশা' জাগে —নিশ্চয়ই মহাত্মাজী পার হবেন এই দারুণ পরীক্ষায়। গান্ধীজী পার হলেন তাঁর অগ্নি-পরীক্ষায়, কিন্তু নীলা-নেপী তাদের সাম্যবাদী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল।[২৪] আর এদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন 'কম্যুনিস্ট' বিজয়দা গান্ধীর অনশনভঙ্গের খবর পেয়ে একটা দীর্ঘ ভক্তি-বিনম্র স্তবগাথা রচনা করে ফেলল।

'বিজয়দা'র লেখার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য, "পৃথিবী যাই বলুক ভারতের চিরন্তন সাধনাব ধারা জযযুক্ত হয়েছে, বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয়নি। সত্য হল জয়যুক্ত। আত্মদহনের হোমশিখা তাঁকে দাহন করেনি, সে শিখা তাঁর দীপ্তিতে জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা, তুমি চিরায়ু লাভ কর। ভারতেব সত্যধর্মের প্রতীক তুমি।" বিজয়দা বহুদীর্ঘ এই ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রশংসাজ্ঞাপন কবে শেষে লিখল, "বিশ্বযুদ্ধের সত্যকার সমাপ্তিতে আসবে নববিধান। সে নববিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে যে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র, তাতে কেউ আনবে বৈষম্যমুক্ত সমাজ রচনার সূত্র, কেউ আনবে জড বিজ্ঞানের মহাজ্ঞান—কতজন আনবে কতবাণী। ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁডাবে ভারতের চিরন্তন বাণী —হে মহাত্মা, যা মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে" (৩৩১)।[২৫] এরপর বিজযদা আর সাম্যবাদী রইল না হয়ে পডল

২৪॥ লেখকের বর্ণানুসারে নীলা হচ্ছে, "নতুন যুগের আধুনিক মেয়ে—তার জীবনে সে একটা আদর্শকেও গ্রহণ করেছে, যার জন্য এতকালের প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাসকে ত্যাগ করলেই চলবে না, মাটির বুক থেকে তাকে মুছে ফেলতে হবে, কেন না তার আদর্শের সকল কাম্য পার্থিব, বাস্তব" (২৯৭)।

২৫॥ 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তারাশঙ্কব বলেছেন, "...মানুষের বিশেষ করে এই দেশের মানুষের যাদেব আমি জানতে চিনতে চেষ্টা করেছি —আমি নিজেই যাদেব একজন, তাদের আত্মার তৃষ্ণা থেকে, রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয়—এর পরও আছে পরম কাম্য, সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না। অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব।" (প্রথম পর্ব, পৃ. ৯১) —এই উক্তির প্রবল কোলাহলের মধ্যে যে সরল সত্যটি অবলুপ্ত হয়ে গেছে তা হল এই যে, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য না এলে 'অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা' তারা যতই পরম কাম্য হোক কিছুতেই আসতে

গান্ধীবাদী সোস্যালিস্ট। তার কারণ একাধিক। প্রথমত বিজয়দা'র আশাবাদ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। গান্ধীর অনশনভঙ্গের মধ্য দিয়ে সত্য কি করে জয়যুক্ত হল, বিশ্বযুদ্ধের সত্যকার সমাপ্তিতে কি করে আসবে নববিধান তার কোনো বাস্তব ভিত্তি বিজয়দা'র সম্পাদকীয় উচ্ছ্বাসের অন্তরালে আমরা দেখতে পাই না। মার্কসবাদ যেখানে বিজ্ঞান-নির্ভর ও বাস্তববাদী 'কম্যুনিস্ট' বিজয়দা সেখানে অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ দ্বন্দ্বে বিশ্বাস করে, দ্বন্দ্ব-বিহীন মার্কসবাদ অলীক কল্পনা। বিজয়দা'র সম্পাদকীয়তে দ্বন্দ্বের কথা নেই, আছে সমন্বয়ের কথা। তৃতীয়ত, বিজয়দা ভক্তির কথা বলেছেন। মার্কসবাদ ভক্তিতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে সংগ্রামে। 'চিরন্তন সাধনা' 'বশিষ্ঠের পুণ্যফল' 'চিরন্তন বাণী' 'আত্মা' 'আত্মদহন' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের ব্যবহারও প্রমাণ করে যে তাঁর কল্পনা বিগতকালের দিকে তাকিয়ে আছে। মার্কসবাদ সামনে যেতে চায়, অতীতে প্রত্যাবর্তন চায় না।

বিজয়দা আসলে কম্যুনিস্ট নন, তিনি নগরবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই শ্রেণী রাজনীতিতে উৎসাহী কিন্তু বিপ্লব ভীরু। উত্তর জীবনে তারাশঙ্কর বিজয়দা সম্পর্কে নিজেই বলেছিলেন, "মহাত্মাজী ও অহিংসা আদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল রাজনীতির কর্মী বিজয়বাবু কম্যুনিস্ট হলেও···ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য নন।"[২৬]

তারাশঙ্কর গান্ধীকে সনাতন ভারতবর্ষের প্রতীক রূপে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করেন। গান্ধীর সত্য ও অহিংসা তাঁরও। তিনি কম্যুনিস্টদের আঁকতে যেয়ে ধীরে ধীরে যে ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন তা সন্তোষজনক নয়। যথার্থ কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সঙ্গে সাম্যবাদী আদর্শের বিজ্ঞানভিত্তিক রূঢ়তাও তাঁর চিত্তকে বিচলিত করেছিল। আরও বেশী বিরূপ করেছিল ভারতের

পারে না। দরিদ্রের গৃহ অপরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য, দরিদ্রের মনও তাই, অবশ্য যদি তাদের মন বলে কিছু থাকে। এবং এতদঞ্চলের দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচবে না যদি ধন-বৈষম্য বজায় থাকে। অনগ্রসর উৎপাদন ব্যবস্থার যে অনগ্রসরতা তার প্রধান উৎস ধনবন্টন ব্যবস্থার অসাম্য। ওজস্বী ভাষার কোলাহল এ সত্যকে গোপন করে, আর ঐ ওজস্বিতা আসে ভাববাদী ভাবালুতা থেকে।

২৬॥ 'আমার সাহিত্যজীবন'-এ তারাশঙ্করের এ সম্পর্কে বক্তব্য, "আমার নায়ক-নায়িকা কম্যুনিস্ট—বিজয়দা কম্যুনিস্ট নায়ক, তারা পরস্পরকে কমরেড বলেছে এ কথা সত্য, কিন্তু তারা কি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কম্যুনিস্টদের সগোত্র, এক দলের এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী?" (দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২)।

কম্যুনিস্ট পার্টির তথাকথিত আচরণ।[২৭] অন্যদিকে এও বলা যায় যে কম্যুনিস্ট পার্টি যে-তারাশঙ্করকে নিজেদের দলে টানবার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিল তাতে চিনবার ভুল যতটাই থাকুক না কেন, একটা বড় সত্য উন্মোচিত হয়ে যায়। সে সত্য হচ্ছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন দুর্বলতা।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে তারাশঙ্করের আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক ধারণা রয়েছে। গুণদাবাবু 'মন্বন্তর' উপন্যাসের একটি চরিত্র। আগস্ট মুভমেণ্টের পর তিনি বেদনাহত হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকলেও পুলিশ তার অতীত ইতিহাস স্মরণ করে তাকে কারাগারে নিয়ে গেল। ঐ গুণদাবাবু'র স্ত্রী কম্যুনিস্ট-বিরোধী। লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন যে, "কম্যুনিস্ট-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীদের উপর অকপট ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা আছে।" গুণদাবাবু'র স্ত্রী কম্যুনিস্ট নীলাকে বলেছিল, "বড়লোক ঢের আছে, গাড়ী ঘোড়া গাড়ী ঢের লোকের আছে, আমি তাদের সমান হতে চাইনে। ওই ভিখিরী ছোটলোকদের সমানও হতে চাইনে দুনিয়াশুদ্ধ যদি ভিখিরী ছোটলোক করে তুলবে—তবে তো খুব স্বদেশী। খুব স্বাধীনতা…" (৩০৭)। এমন ধরনের বক্তব্যে শ্রেণীসচেতন তারাশঙ্কর এবং সাম্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ লেখকের মনোভাব ফুটে উঠেছে।

বলাই বাহুল্য, এই রকম ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও সাধারণ। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার তুলনায় উন্নততর। এই ব্যবস্থা দারিদ্র্য সৃষ্টি করবে না বা প্রতিষ্ঠিত দারিদ্র্যের বণ্টনের মাধ্যমে সকলকেই দরিদ্র করে তুলবে না; এ চায় প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধক-সমূহকে বিনষ্ট করে অধিক ধনসৃষ্টি ও সেই ধনের সমবণ্টন। সমবণ্টনের প্রতি-শ্রুতির মধ্যেই আছে অধিক ধন উৎপাদনের সম্ভাবনা। মার্কসবাদ-বিরোধী গুণদাবাবু'র স্ত্রী যদি তারাশঙ্করের মুখপাত্র হয় তবে তা দুঃখের ব্যাপার তো বটেই—লজ্জারও ব্যাপার হয়তো।

মস্কোতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি বলেছেন, জীবনের সমস্যা সমাধানে মার্কসবাদ শেষ কথা নয় কিন্তু "মার্কসবাদের তত্ত্বগুলি মানবজীবনে ও সমাজে একটি অনতিক্রম্য অধ্যায়…। ক্রেমলিনে প্রদর্শিত ঐশ্বর্যসঞ্চয় সে কথা যেন আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল চোখের উপর। এমন বৈষম্য জীবনের পক্ষে অনাচার, ক্ষয়রোগের মত ব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে জীবন নিজেকে মুক্ত করবেই।"

তারাশঙ্করের ঐ সঙ্গে ভারতের অবস্থার কথা মনে পড়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, "অহিংস সংগ্রাম এবং ভূদানের কথা মনে করে আনন্দ অনুভব

২৭॥ তা. র., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৮০

করেছিলাম। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপায়ণ আজ আমাদের অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হওয়া প্রয়োজন।"[২৮]

অহিংস সংগ্রাম এবং ভূদানযজ্ঞ কোনোটিই তাঁর দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়, এবং সর্বোপরি তিনি যে সমন্বয়ের পথে সমাজকে সুসংগঠিত করতে চাচ্ছেন সে সুসংগঠন সম্পূর্ণত পরিবর্তন বিরোধী। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলেছেন, "আজ সে দেশেও সত্য ও অহিংসা সগৌরবে জয়যুক্ত হয়েছে, নিঃসন্দেহে মানুষের মানসলোক উত্তরণ করেছে সেই স্তরে। লৌকিক জগতে দেহগত স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ মেটাবার পর তার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।"[২৯] তাঁর দেশের মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোকের পক্ষেই শুধু অমন লৌকিক জগতের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ মেটানোর উপায় রয়েছে এবং অধিকাংশই যে বস্তুজাগতিক দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যহীন ও উপায়হীন এ কথা তারাশঙ্কর নিশ্চয়ই জানেন কিন্তু তবু তিনি 'আত্মিক' ও 'মানস' পিপাসায় তথাকথিত অমৃতসন্ধানী। ডঃ. হরপ্রসাদ মিত্রর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেছিলেন যে, "রুশ বিপ্লবের ধারণা থেকেই আমাদের দেশে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনে চিন্তা জেগেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছি যে জাতির জীবনে 'সুখ' এক সুদূরপ্রসারী সাধনার ফল! মর‍্যালিটি ছাড়া সুখ হয় না। ...সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্ব এ সংসারে চিরকালের জিনিস। সৎকে কোথায় পাবে? ঈশ্বর সাধনার মধ্য দিয়েই সে অবস্থায় পৌছানো যায়"[৩০] —এ প্রত্যয় একান্তই ধর্মবাদীর, আদৌ বাস্তববাদীর নয় এবং এ প্রত্যয়ের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এক ধরনের ভয়। সে ভয় হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের, যাকে সমাজ-বিপ্লব বলা যায়। তারাশঙ্কর আসলে সংস্কার চান, বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান না। এই সংস্কার কামনার পেছনে সব সময়েই ক্রিয়াশীল থাকে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাই ভয়ের জন্মদাতা।

তারাশঙ্করের রচনায় হৃদয়ানুভূতির প্রাবল্য, সাহিত্যিক কলাকৌশল, সৌন্দয ও ভাষার ওজস্বিতার অভ্যন্তরে যে মানসিকতা নিহিত তা গভীরভাবে সামন্তবাদী। এ মানসিকতা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বটে কিন্তু কখনও সমাজ-বিপ্লবী নয়।

তিনি জাতীয় জীবনে সুখের কারণ স্বরূপ 'মর‍্যালিটি'কে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মর‍্যালিটিও শ্রেণীনির্ভর। বাঘের মর‍্যালিটি হরিণের ওপর এবং হরিণের মর‍্যালিটি বাঘের ওপর প্রয়োগ করা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় নয়।

২৮॥ 'মস্কোতে কয়েকদিন', ১৩৬৫, পৃ. ৭০-৭১।

২৯॥ 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

৩০॥ 'তারাশঙ্কর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।

নিপীড়নকারীর জন্য যা মর‍্যাল নিপীড়িতের কাছে তা অত্যন্ত ইম্‌ম্যরাল বলে জানবার কথা।

তারাশঙ্কর 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৩৫২) উপন্যাসে পুনরায় গ্রামীণ পট-ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 'সন্দীপন পাঠশালা'র নায়কের নাম সীতারাম। তার বাবা চাষী। সীতারাম সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। তাই সম্বল করেই সে পণ্ডিতি করে। সীতারাম রাজনৈতিক চরিত্র নয় কিন্তু সে রাজনৈতিক সময়ের মানুষ।

সন্দীপন পাঠশালায় ছাত্রদের রাজনীতির জ্ঞান দেওয়া হয় শুনে পুলিশ সাহেব এসেছিল তদন্ত করতে। ছাত্রদের প্রশ্ন করে ও তার উত্তর শুনে পুলিশ সাহেব যেমন বিরক্ত তেমনি হতবাক হয়েছিল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভালো লোকের নাম জিজ্ঞাসা করলে ছাত্ররা উত্তরে 'মহারাজ গান্ধী', 'চিত্তরঞ্জন দাশ', 'মতিলাল নেহরু' প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বলেছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশ সাহেব সীতারাম পণ্ডিতকে বলেছিল যে, সে-ই ছাত্রদের এ সব শিখিয়েছে। সীতারাম নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিল, "...আমি শিখাই নাই। এ সব আজকাল কাউকে শিখাতে হয় না হুজুর, দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা নিজেই শিখেছে।"৩১

পাঠশালার ছেলেদের মতো পরিবেশ থেকেই সীতারাম রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেছে। অবশ্য তার রাজনীতি-সচেতনতা একান্তই কংগ্রেসী। দেবুর সঙ্গে সীতারামের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই বর্তমান। উভয়েই গ্রামের বাসিন্দা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কৃষক সন্তান এবং দু'জনেই পণ্ডিত। কিন্তু এই সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য বেশী। দেবু রাজনীতি-সচেতন এবং তুলনায় অনেক বেশী বুদ্ধিবাদী। দেবু অর্থনীতিতে পরাশ্রয়ী নয়। সীতারাম জমিদার-আশ্রিত, যদিও ছোট জমিদার। কারণ রত্নহাটার জমিদাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ সামন্তবাদী শক্তি এখানে দুর্বল কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাবে এই জমিদার বংশই সেই হারানো ক্ষমতা ফেরত পাচ্ছে। কারণ নেতৃত্ব চলে যাচ্ছে মূলত জমিদারদের হাতে। তারাশঙ্কর অবশ্য তাঁর উপন্যাসে কংগ্রেসের রাজ-নীতিকে এভাবে দেখাতে চাচ্ছেন না, তিনি দেশের স্বাধীনতাকেই বড় করে দেখেছেন। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' (কঙ্কনার বাবু ও জোতদার শ্রীহরি), 'সন্দীপন পাঠশালা'র রাজনীতির কর্তৃত্ব দখল করেছে জমিদার বা সামন্তশ্রেণীর ব্যক্তি। জমিদার নয় বলেই দেবু নিজে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি যতক্ষণ না তাকে যতীন বা কারাগারের রাজবন্দীরা জ্ঞান ও উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছে।

৩১॥ 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

'সন্দীপন পাঠশালা'র জমিদারের ছেলে ধীরানন্দ একজন লেখকও বটে। সে গোঁড়া কংগ্রেসী। তারাশঙ্কর ধীরানন্দকে এমন মহিমান্বিত করে এঁকেছেন যে তার প্রণাম পেয়ে সীতারামও যেন মহৎ হয়ে ওঠে। এই চরিত্রটিতে তারাশঙ্করের নিজের ছায়া পড়েছে। কংগ্রেসের রাজনীতির আশ্রয়ে ধীরানন্দ দেশের মুক্তির কথা বলেছে। কিন্তু দেশের মুক্তির চেয়েও প্রাধান্য পাওয়া দরকার ছিল দেশের মানুষের মুক্তির বিষয়টি। সীতারাম কৃষকের সন্তান হয়েও কৃষি কাজকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে। 'চাষা' নামটি অপবাদের মতো মনে হয় তার কাছে। তারাশঙ্কর কিন্তু কৃষকের মুক্তির কথা বলেননি। কংগ্রেসের রাজনীতিতে কৃষকের মুক্তি আসেনি। রত্নহাটা হয়েছে 'ধ্বংসোন্মুখ' (১৩৫)। দেশের স্বাধীনতা সীতারামকেও কিছু দেবে না। মানুষের দুঃখকে দেখেছেন তারাশঙ্কর, সেই দুঃখের প্রতি সহানুভূতিও তাঁর কম নয়, কিন্তু দুঃখের জাগতিক কারণকে দেখেননি। যে জন্য সীতারাম জীবনে ব্যর্থ হয়ে তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের ট্রাজিক চরিত্রগুলির মতো অধ্যাত্মলোক আশ্রয় করে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছে। এ সান্ত্বনা পাঠককে কোনো পথের নির্দেশ দেয় না। উপকরণ সংগ্রহে বাস্তববাদী হয়েও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর ভাববাদিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তারাশঙ্করের পক্ষে অন্য কোনো সমাধান দেওয়া সম্ভবপর ছিল না —তাঁর নিবৃত্তিহীন ভাববাদিতার কারণে।

এই রকম আর একটি চরম ভাববাদী উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট' (১৩৬৭)। এ উপন্যাসের নায়ক সুদর্শন ঈশ্বরকে খুঁজছে। বর্তমান যুগ ঈশ্বরে আস্থা রাখে না। তাই সুদর্শন কি বস্তু কি মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যেমন খুঁজে পাচ্ছে না তেমনি ঈশ্বরকে সে সামনাসামনি আবির্ভূত হতেও দেখছে না। ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে সুদর্শন এক চোর সন্ন্যাসীর চুরি করা সোনার বিগ্রহ লাভ করে সেটা বিক্রি করল। সেই সোনা বিক্রির টাকায় নতুন জীবনসঙ্গিনী নিয়ে জীবন শুরু করল। তার সঙ্গিনী নলিনী ভ্রষ্টা রমণী। কিন্তু নলিনীর মর্‍্যালিটি তাকে চুরির টাকায় ঘর করতে বাধা দিল। সে সুদর্শনকে ত্যাগ করে মেয়ে হয়েও সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন যাপন করতে শুরু করল। যেহেতু সে ধার্মিক সে জন্য পতিতা হওয়া সত্ত্বেও হল সুখী। আর সুদর্শনের পরিণতি হল ভয়াবহ —সে হয়ে উঠল নিষ্ঠুর এক ব্যক্তি। কারণ সে নলিনীর মতো আধ্যাত্মিকতার পথে গেল না। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেই যে সুদর্শনের মতো অসৎকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে এবং বিবেকহীন হয়ে উঠবে এমন দৃষ্টান্ত বাস্তবে পাওয়া দুরূহ। অন্যদিকে তেমনি কঠিন ঠিক বিপরীত চিত্রের চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী তারাশঙ্কর ঈশ্বরে বিশ্বাস কমে যাওয়ার জন্য দায়ী করেছেন সাম্যবাদী ধারণাকে। তাঁর মত হল এই যে, সাম্যবাদের প্রভাবেই নাস্তিক্য তাঁর

এবং অন্যান্য দেশের আস্তিক্যবাদে আঘাত হানছে।[৩২] রুশদেশ সম্পর্কে সুদর্শনের বক্তব্যে (৩৪৭) এবং সুদর্শনের গ্রামের ডেটিন্যু ধীরেনবাবুর চরিত্রকে জঘন্য ও কুটিল করে এঁকে তিনি সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ঐ ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। ধীরেনবাবু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মী। সুদর্শনের তরুণ মনে নিরীশ্বরবাদী ধীরেনবাবু ঈশ্বরে অবিশ্বাস অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল। মানবশক্তি-নির্ভর এই অশুভ আদর্শের প্রভাবে সুদর্শনের ঈশ্বরে বিশ্বাস একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে শিথিলমূল হয়েছিল। সুদর্শন ক্রমশ নাস্তিক হয়ে গেল এবং নাস্তিকতার প্রভাবে চরম পরিণতির পথে পা দিয়েছিল, ঠিক তার যুগটার মতোই। ঠিক তার যুগের মতোই সে ভোগসর্বস্ব ইহবাদে বিশ্বাস করে এবং হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশীদার হয়ে অসংখ্য হত্যা পর্যন্ত করেছে। অথচ নলিনী ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বল করে যুগের যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে সুদূর হিমালয়ে পরম প্রশান্তিতে আতুরদের আশ্রম চালায় এবং ভিক্ষা করেই চালায়। সে শান্তি ও সুখের প্রতীক।

কংগ্রেসপন্থী তারাশঙ্কর সুদর্শনের মুখে 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে কংগ্রেস-বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, "গান্ধীজী থাকতে কংগ্রেসের অহিংসার আস্তিক্যবাদে যে মূল্য সে মূল্য গান্ধীজীর। তিনি আজ নেই। আজ তার মূল্য প্রতিষ্ঠানের, অর্থাৎ দেহের। ক্রিশ্চান ইউরোপের মতোই তার পরিণতি হবে" (৪২৭)। তারাশঙ্করের আগের উপন্যাসগুলি থেকে একটি স্পষ্ট ব্যতিক্রম এখানে লক্ষণীয়। আগের উপন্যাসগুলিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল একটা সহজাত সংস্কারের মতো। কিন্তু তিনি উত্তরজীবনের সাহিত্যে ক্রমশ ঈশ্বর অন্বেষণে অধীর-চিত্ত হয়ে পড়েছেন। এর একটি ব্যাখ্যা তাঁর লেখা থেকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর সাহিত্য রচনার পশ্চাতে একটি প্রধান প্রেরণা ছিল, স্মৃতিচারণায় তিনি প্রথমেই যে প্রেরণার কথা বলেছিলেন তা হচ্ছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য সাহিত্যের মাধ্যমে যুদ্ধ করবেন এবং 'সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ ও মহিমা'কে[৩৩] প্রকাশ করবেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির মধ্যে পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার কামনা··· স্বাভাবিকভাবেই শক্তি ও প্রেরণার বড় একটি উৎস"[৩৪] ছিল। দেশ স্বাধীন হলে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাদাতা রূপে 'নতুন একটি পথ' খুঁজছিলেন। বলা চলে অন্বেষণ করছিলেন একটি বন্ধনের পথ যা দিয়ে মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেওয়া যায় অন্য খাতে। তিনি 'আমার কথা'য় ঠিক এ কথাই বলেছেন, "মুক্তি শব্দটি

৩২॥ 'যোগভ্রষ্ট', তা. র., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৩৩॥ 'আমার কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

৩৪॥ ঐ, পৃ. ২১৩।

যখনই উচ্চারণ করি তখনই তার পিছনে কোন বন্ধনের উপলব্ধি বা অস্তিত্ব অনিবার্যরূপে এসে পড়ে। …কোনো বন্ধনের অস্তিত্ব না থাকলে মুক্তির স্বাদও নেই, রূপও নেই, অর্থও নেই। তাই যখন প্রশ্ন ওঠে তখন বন্ধনের স্বরূপটি এবং তার বেদনাটিই হয় জীবন সংগ্রামের মূলধন। যখন সংগ্রামে জয়লাভ করি… দেখি সংগ্রামের সব মূলধন ফুরিয়ে গেছে। তখন আবার খুঁজতে হয় নতুন বন্ধন।"[৩৫] দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্করের মধ্যে সব সময় একটা ভীতি আছে। তিনি অজানাকে ভয় পান এবং বন্ধনহীন স্বাধীনতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে বলেও ভয় পান। মুক্তি বলতে তিনি যে কি বোঝাচ্ছেন তা স্পষ্ট হয়নি। এ মুক্তি কার জন্য চাচ্ছেন—ব্যক্তির না সমাজের? অর্থনৈতিক না আধ্যাত্মিক? 'মুক্তি' যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক হয় তবে সে মুক্তির পথ আছে একটি নতুন সমাজ গঠনে। তারাশঙ্কর স্পষ্টতই তেমন সমাজ চাচ্ছেন না। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মুক্তি সন্ধানই তাঁর অভীষ্ট। অথচ এই আধ্যাত্মিক মুক্তি শেষ পর্যন্ত একটা অন্ধ গলি। 'সন্দীপন পাঠশালা'র পণ্ডিত সেই গলিতেই গিয়ে পৌঁছেছে। তারাশঙ্কর অবশ্য ঐ গলিকে গলি বলে চিহ্নিত করেননি বরং ওজস্বিতার আচ্ছাদনে তাকে মহিমান্বিত করে উপস্থিত করেছেন এবং মুক্তির একমাত্র পথ বলে চিত্রিত করেছেন।

"বুদ্ধিমানের জগতে বিশ্বাসের চেয়ে সন্দেহ বড়। সত্যকে এখানে প্রমাণ করতে হয় সত্যের চেয়ে প্রমাণ বড়।"[৩৬] তারাশঙ্কর নিজেও এ কথা জানতেন। দলবাদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু মনোভাব 'যোগভ্রষ্ট'-এ তিনি প্রচার করেছেন। তারাশঙ্কর যখন মার্কসবাদীদের দলীয় আনুগত্যকে কটাক্ষ করে চলেছেন, তখন তিনি নিজেও তো 'মন্বন্তর' পর্বশেষে তাঁর পুরনো দল কংগ্রেসের অনুগত হয়েছেন। এর পরে তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদে রাজ্যপাল মনোনীত প্রথম সদস্য হিসাবে সভ্য ছিলেন। তারপর ১৯৬০ সাল থেকে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। সাম্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিভ্রান্তিকর ধারণার পশ্চাতে মার্কসীয় যুক্তি-কাঠিন্য ও বৈজ্ঞানিক সত্য কতকটা দায়ী, কিন্তু আসলে তিনি ভাববাদী এবং তাঁর সামন্তবাদী ধারণাও অমন অসহিষ্ণুতার জনক। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সহজ ধর্মবিশ্বাসী, মধ্যবয়সে বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে কিঞ্চিৎ ঝোঁক গিয়েছিল, কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনে ডুবে গিয়েছেন। যে জন্য তাঁকে 'আরোগ্য নিকেতন' জাতীয় উপন্যাসে তত্ত্বের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। 'যোগভ্রষ্ট'-এর নলিনী বা সুদর্শনের

৩৫॥ 'আমার কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৩৬॥ 'যোগভ্রষ্ট', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫।

সঙ্গে এই পর্যায়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দুর সহজ ঈশ্বর-বিশ্বাসের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কৃষ্ণেন্দু আগে প্রেমিক পরে ঈশ্বরবাদী। কৃষ্ণেন্দুর ঈশ্বর-অন্বেষা ছিল না। প্রেমিকাকে পাবার জন্য সে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রেমে ব্যর্থ হলে সে মানবসেবার মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার কৃষ্ণেন্দুর ঐ পন্থা স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে বলে সে সার্থক চরিত্র হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু চরিত্রের সাফল্যের রহস্য তার ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রলেপের মধ্যে নয়, বরং প্রেমিক রূপে। তারাশঙ্কর সঙ্কটময় বর্তমান যুগকে ভারতীয় প্রতিষেধক নিতে বলেছেন। ধর্মভিত্তিক জীবন যাপন ও দুঃস্থ মানুষের সেবার মধ্যেই তিনি মনে করেছেন রয়েছে অমৃতের সন্ধান।

তারাশঙ্করের সর্বশেষ রচনা হচ্ছে দুটি উপন্যাসের সমষ্টি, নাম '১৯৭১' (১৩৭৮)। প্রথমটি 'একটি কালো মেয়ের কথা' এবং দ্বিতীয়টি 'সুতপার তপস্যা'। দিনপঞ্জীর উপাদান নিয়ে রচিত উপন্যাস দুটি। দুটি উপন্যাসই একাত্তর সালের আগে-পরে রাজনীতি-কবলিত উভয় বাংলার জীবন্ত চিত্র। 'একটি কালো মেয়ের কাহিনী' বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য-অধ্যুষিত দিনের কাহিনী। যতই আবেগ ও আবেদন থাকুক না কেন, এমন ধরনের রচনা বাস্তব নয়। কারণ এ কাহিনীতে বাংলাদেশের যথার্থ রূপায়ণ হয়নি। নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিল। পরে সে হল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং সর্বশেষে বাংলাদেশী। বাঙালী ডেভিড একটি ভিক্ষাজীবী দরিদ্র কালো মেয়েকে নিয়ে সীমান্ত পার হল। ঐ মেয়ে ধর্ষিতা, নিপীড়িতা, বাংলাদেশের প্রতীক যেন। ডেভিড এই মেয়েকে ভালোবেসে ফেলল। সে খ্রীস্টান, যে কোনো দেশের নাগরিকত্ব সে নিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ মুক্ত হলে সে ঐ কালো মেয়েকে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাবে। ভিক্ষাজীবী কালো মেয়ে ও খ্রীস্টান নায়ক ডেভিড বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে না। আসলে তারাশঙ্কর মুসলমানদের তাঁর ভাবনার মধ্যে আনেননি। পুরাণ, পাঁচালী, মহাভারত, আত্মার মহিমা নিয়ে তিনি যে ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভুবন সৃষ্টি করেছেন সে জগতে মুসলমানদের অস্তিত্ব কোথায়? দেবুর গ্রামের মুসলমান চাষীরা কি যথার্থ বাস্তব পরিচয় বহন করে? শেষের দিকের রচনা 'বিপাশা' বা 'উত্তরায়ণ'-এ তিনি মুসলমানদের যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে তাঁর অনুদার মনোভাবই ফুটে উঠেছে। 'একটি কালো মেয়ের কাহিনী'তে আশা-উদ্দীপনার বিচ্ছুরণ রয়েছে। কারণ এখানে তিনি পেয়েছেন বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দিয়ে-গড়া ডেভিডের জীবন-বাসনা, সর্বোপরি বাংলাদেশের দূরত্বও লেখকের মনে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বিপরীত জীবনচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন 'সুতপার তপস্যা'য়। উজ্জ্বল জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে সুতপা ও ব্রত অগ্রসর হতে চাচ্ছিল, কিন্তু দিগন্তব্যাপী হতাশার মধ্যে দিয়ে

তাদের বিবাহিত জীবনের শেষ হল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি-প্রভাবিত জীবন-যাত্রার প্রভাবে এরাও ছন্নছাড়া হয়ে গেল। দলীয় রাজনীতি, হিংস্র সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি কিভাবে মানুষের ধর্মবোধ, শুভবোধ এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কারের সঙ্গে তিক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে সেটা চিত্রায়িত করেছেন। রাজনীতির দলীয়তা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার, অর্থাৎ প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক-গুলিতে ফাটল ধরাচ্ছে। এই বিষাক্ত ক্লেদাক্ত রাজনীতি গ্রামের শান্তিকে নষ্ট করছে। এমন পরিবেশে সুস্থ, সরল, সহজ কিছু করা অসম্ভব বলে লেখকের মনে হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন যে, "একালের পৃথিবীর বাতাসে ভালবাসা নেই, একালের অন্নে নেই, একালের জলে নেই, বোধকরি আকাশে সূর্যের আলোতেও নেই। একালের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে একালের অন্নে বেঁচে থেকে বোধহয় আর কেউ কাউকে ভালবাসতে পারবে না।"[৩৭] তারাশঙ্কর এই অশুভের মূলে 'কাল'কেই দেখেছেন তাঁর আভাসিক প্রত্যয়ে। অথচ কোনো কাল শুভ বা অশুভ নয়। প্রত্যেক কালেই শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সুব্রত ও সুতপা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী। প্রেমও এদের রাজনৈতিক আদর্শের মিলন ঘটাতে পারল না; কেউ কাউকে নিজের দলভুক্ত করতে পারল না। অথচ 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ পেরেছিল তার কিশোরী স্ত্রীকে কংগ্রেসী রাজনীতির সমর্থক করতে। অভিমান করে সুব্রত চরমপন্থী রাজনীতির আশ্রয় নিল। দাঙ্গা-হাঙ্গমায় তার মৃত্যুর খবরে চরম আধুনিকা সুতপা নিজের উগ্রতা কমিয়ে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত জীবন যাপন শুরু করল। শাশুড়ী ও স্বামীর অসমাপ্ত সেবাত্রাণ কাজ সে গ্রামে গিয়ে করতে শুরু করল। নাস্তিক সুতপা পরম নিষ্ঠা সহকারে পূজা করতে শুরু করল এবং সেবা-সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পন্ন করতে থাকল। এদিকে সুব্রত সত্যি মরেনি। কোনোমতে বেঁচে গিয়ে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে সে 'যোগভ্রষ্ট'-এর সুদর্শনের মতো তীর্থ হতে তীর্থান্তরে ঘুরেছে ঈশ্বরের সন্ধানে কিন্তু এক সময় "মিথ্যা মনে হয়েছে ঈশ্বর ধর্ম শাস্ত্র তীর্থ সব।··· আবার পৃথিবীর সংসার আমাকে টানলে। অর্থ টানলে, যৌবন টানলে আবার টানলে —সেই রাজনীতি। ঈশ্বর কাউকে রাজা করে দেন না —রাজা হতে হয়। সারা ভারতবর্ষে যেখানে গেলাম সেখানেই দেখলাম মানুষ এতেই পাগল হয়েছে" (১৭৮)। সুব্রত তার সঙ্গে অসৎ উপায়ে অর্জিত প্রচুর টাকা নিয়ে ফিরে এল স্ত্রীর কাছে। এই টাকা দিয়ে স্ত্রীকে বশ করে সে রাজনৈতিক দলাদলিতে নেমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করবে। বিগ্রহপূজা ও সেবাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত সুতপাকে সুব্রত ব্যঙ্গ করে। সুব্রত ভাবে একটা অর্থহীন উদ্দেশ্যে সুতপা নিয়োজিত। বৃথাই সে কালক্ষেপ করছে পূজা ও

৩৭॥ '১৯৭১', (১৩৭৮), পৃ. ১৭৮।

সেবায়। সুতপা এদিকে সুব্রতর অন্তর্ধানে আমূল পরিবর্তিত হয়ে সনাতন ভারতবর্ষীয় নারীতে পরিণত হয়েছে। তাই স্বামীর মতিগতি দেখে সে ঐ 'নিষ্ঠুর রক্তপিপাসায় অধীব মানুষটি'র হাত থেকে তার একমাত্র পুত্রসন্তান 'শিবা' এবং বংশের বিগ্রহটি নিয়ে সভয়ে পালিয়ে গেল। এদের রক্ষা সে করবেই, এই তার তপস্যা। সুতপার গন্তব্য অনেক দূরে "যেখানে নতুন কালের প্রভাত হবে" (১৭৯)। তারাশঙ্কর এখানে রাজনীতিকে চিত্রিত কবেছেন সর্বগ্রাসী রূপে। রাজনীতির সর্বগ্রাসী লোলুপতাব ঊর্ধ্বে উঠবাব জন্য এবারও তিনি ভারতীয় তপস্যার আলোকাভিসারী। তাঁব মতে মানুষ এবং ঠাকুর-সেবা এই হচ্ছে শান্তিময় জীবনযাত্রার মূল মন্ত্র। বিগ্রহ পূজা ও মানুষের মূর্তির মধ্যে যে দেবত্ব বয়েছে তার সেবা করা —এ দেবতা অবশ্য পীড়িত, অন্ধ অথবা খঞ্জ রূপে সেবকেব সামনে ধরা দেয়।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চব্বিশ বছর পরে কেন তিনি এমন বাজনীতি কবলিত ধ্বংসোন্মুখ গ্লানিময় জীবনচিত্র তুলে ধরলেন? পারতেন সুতপা-সুব্রতকে নিয়ে অম্লমধুর প্রেমকাহিনী বচনা কবতে, যা তিনি এর আগের অরাজনৈতিক উপন্যাস-গুলিতে করছেন। রাজনীতি যে বাস্তব সত্য এ কথা তারাশঙ্কর অস্বীকার করতে পাবেননি। রাজনীতি কিভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে 'মহাশক্তি'তে সেটা তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি পড়লে সে ইতিহাস জানা যায়। কিন্তু বাজনীতির মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য তিনি খুঁজে পাননি যেহেতু তিনি মূলত ধার্মিক। যখন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল যে, কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডে রাজনীতি ও ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে তখন তিনি হয়েছেন উৎসাহী কর্মী। তিনি সাবা জীবনই মানুষের দুঃখ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সে জন্যেই তিনি দুঃখবাদী ঔপন্যাসিক। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তিনি দেখেছেন, যোগও দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন তাঁব জানা ছিল। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হলেও সামন্তবাদ-বিরোধী ছিলেন না। বরং সামন্তবাদী সংস্কৃতির মধ্যেই তাঁর বিকাশ এবং তার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ। সে জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তিনি মার্কসবাদী হওয়া দূরের কথা, রয়ে গেলেন প্রবলভাবে গান্ধীবাদী। সেইসঙ্গে কম্যুনিস্ট চরিত্রকে গান্ধীবাদী করে তুললেন। শেষজীবনে তিনি মানুষের মঙ্গল, ধর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। এটা কোনো বিস্ময়ের কথা নয়। তিনি তাঁর কালের পটভূমিতে সামন্তবাদেরই একজন বিশ্বস্ত প্রতিভূ। রাজশক্তির অদলবদলে দেশের সাধারণ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি এও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের কাজে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োগ বা প্রয়োগের সম্ভাবনাকে তিনি তাঁর উপন্যাসে দেখাননি। আর এভাবে রাজনীতিকে তিনি

দেখতেও চাননি। তপোবনের মতো একটি সামন্তবাদী স্বর্গের স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখে গেছেন। ধর্মই ছিল তাঁর কাছে চরম কথা। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করেই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "এ যুগের শিক্ষিত ভারতবর্ষের মন পুরোপুরি ইউরোপের কাছে দীক্ষা নিয়েছে, তাতে বেদ মাত্র দুটি—একটি ফ্রয়েডীয় বেদ, অপরটি মার্ক্সীয় বেদ। একটির কথা হল সবের বীজ কাম, ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো, মার্ক্সবাদের বীজ হল অর্থ বা ওয়েল্‌থ। ধর্ম ছিল এ দেশের মূল কথা—সেটাতে ঢেঁড়া দাগ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।" —"মনের আয়নায় নিজের ছবি", 'শনিবারের চিঠি', পৌষ, ১৩৬৯, পৃ. ১৮৩।

তারাশঙ্কর জীবননিষ্ঠ লেখক। জনজীবনের কাছাকাছি থেকে এবং রাজনীতিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি এই সত্য বুঝে নিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক কালে রাজনীতি একটা অত্যন্ত বাস্তব সত্য। সেইসঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে এই গোপন উদ্বেগও ছিল যে, রাজনীতি যাতে সমাজ-বিপ্লবের সৃষ্টি না করে। সে কারণে রাজনীতিকে তিনি একটা বিশেষ ধারায় প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেছেন, যেমন করেছে কংগ্রেস। কাজেই কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে তারাশঙ্করের কাজের একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে, এই সাদৃশ্যের ভিত্তি হচ্ছে তারাশঙ্করের শ্রেণীগত অবস্থান ও অভীপ্সা। তাঁর উপন্যাসে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতা রয়েছে তাঁর আগের লেখকদের উপন্যাসে তেমন নেই। এর অন্য একটা কারণ তাঁর যুগে রাজনীতি আরও প্রবল ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারাশঙ্করের রাজনীতি অধ্যাত্মবাদ ও ভক্তিবাদ অর্থাৎ সামন্তবাদী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক, প্রকৃত বক্তব্যের বিচারে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের তুলনায় কম অগ্রসর। শরৎচন্দ্র ধর্মের সামাজিকতাকে স্বীকার করেছেন ঠিকই কিন্তু ধর্মের আধ্যাত্মিকতার দিকে মনোযোগ দেননি। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ভাবাবেগ সত্ত্বেও এক ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতা ছিল যেটা তারাশঙ্করে অনুপস্থিত। তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশী ভাববাদী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উদার জীবন-স্বীকৃতি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন কিন্তু বঙ্কিমের মতো জীবনের সীমানাকে আরও প্রসারিত করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁর ভাষার ওজস্বিতা বিশেষ করে উপন্যাসের পরিণতিতে প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁর আত্মবিশ্বাস কম। তাঁর ভাববাদিতা ও রাঢ় অঞ্চলের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ রূঢ়তা একত্র হয়ে ভাষাকে এক ধরনের আপাত পৌরুষ দিয়েছে যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে অনুপস্থিত। কিন্তু এই পৌরুষ আবার প্রতারকও —কেন না এর অভ্যন্তরে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নেই।

তারাশঙ্করের মতো শক্তিশালী লেখক উপন্যাসের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন তাতে ক্ষতি হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত পাঠকের স্বচ্ছতা অভিলাষী দৃষ্টিভঙ্গির এবং প্রতিবাদোন্মুখ চেতনার। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসেই

আবেগ ও উপাদানের বিপুল সমারোহ রয়েছে, কিন্তু তাদের পরিণতি সামান্য। উপন্যাসগুলিতে অপচয় রয়েছে। অপচয় একদিকে তাঁর শৈল্পিক শক্তির, অপরদিকে সামাজিক সম্ভাবনার। চিন্তাধারাকে অর্থনীতি ও সামাজিক বিন্যাসে বিশ্লেষণমুখী করলে এবং সেইসঙ্গে শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে তিনি হয়তো সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারতেন এবং সামাজিকভাবে সেটা অত্যন্ত হিতকর হতে পারত। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে আধ্যাত্মিকতা প্রচার করেছেন, যে আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিকে স্বার্থপর ও সমাজবিচ্ছিন্ন এবং বাস্তববিমুখ করে তোলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা তারাশঙ্করের বিপরীত পথ ধরে। তারাশঙ্করের মতো তিনি সাহিত্যিক হবার আগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। সাহিত্যিক হবার পরই মানিক রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে, " লেখক কবিও টের পাচ্ছেন যে, নিছক হাসি-কান্নার আরক আর ভূমার মলবনে প্রেম চলবে না। মানুষের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিকের মতো মানুষের রোগ উপবাস লড়াই নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।"[১]

তারাশঙ্কর মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে আন্তরিকতার সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন, অথচ দুঃখ-কষ্টের জাগতিক কারণ না দেখিয়েই একটা আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন। স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানিক এ দেশের নিপীড়িত মানুষের দুর্দশার মূল কারণ খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। সাহিত্য-জীবন শুরু করবার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মার্কস-বাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে স পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছেন। মার্কসবাদের সঙ্গে তার পরিচয় হবার পর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর আগের লেখায় 'অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি' রয়ে গেছে।[২] দেশের মানুষের মুক্তি বলতে তিনি নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিকেই বুঝেছেন। ফলে তিনি স্বপ্ন কথার ভুবন রচনা করেননি।

তারাশঙ্কর যদিও দলাদলির ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন তবু নিজে ভারতের সবচেয়ে বড় ও রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সদস্য থেকেছেন এবং তাঁর রচিত সাহিত্যের বড় একটি অংশ জুড়ে রাজনৈতিক চরিত্রাবলী ও বক্তব্য রয়েছে। তারাশঙ্কর রাজনীতিকে এড়াতে পারেননি। যদিও রাজনীতির শক্তিমত্তা তাঁর কাছে অশুভ মনে হয়েছে। এই অশুভ, শক্তিময় রাজনীতিকে তিনি দেখেছেন হিংস্র, ধর্মহীন এবং মহিমাহীন রূপে। প্রথমদিকের উপন্যাসগুলি রচনাকালে কংগ্রেসের রাজনীতি তাঁর কাছে আদরণীয় মনে হয়েছিল। সে রাজ-নীতির প্রকাশ ছিল উদ্দীপক শক্তি হিসেবে। ঐ রাজনীতি অবশ্য তাঁর দলের রাজনীতি —আদর্শচালিত, অহিংস, সংস্কারপন্থী এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী শূন্য।

১॥ 'প্রতিভা', 'লেখকের কথা', (১৯৫৭), পৃ ৫৩।

২॥ 'সাহিত্য করার আগে', 'লেখকের কথা', পৃ. ১৬।

তেমন ভাববাদী ও বাস্তবিক পক্ষে শূন্যগভ রাজনীতির বাস্তবের মাটিতে শক্ত পদক্ষেপ কষ্টসাধ্য। তারাশঙ্কর তাঁর শ্রদ্ধাভাজন বহু মানুষকে রাজনৈতিক কোন্দলে প্রবৃত্ত হতে দেখেছেন এবং কংগ্রেসের রাজনীতির কাছে তাঁর আদর্শের চাহিদা অনুসারে প্রতিশ্রুত শর্তগুলি পালিত হতে দেখেননি।

বয়োঃকনিষ্ঠ হলেও মানিক তারাশঙ্করের সমসাময়িক লেখক। তিনি ব্যতিক্রমধর্মী সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সময়ে তাঁর সামনে একদিকে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তাঁদের প্রভাব, অন্যদিকে অতি আধুনিক কল্লোল কালি কলম গোষ্ঠীর নব সৃষ্টির উল্লাস। সর্বোপরি মানিক নিজে ছিলেন বিদেশী সাহিত্যের পাঠক।[৩] তার নিজের সাহিত্য রচনার হাতে খড়ি 'রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী' দিয়ে।[৪] ১৯৩৫ সালে প্রথম গল্প দিয়ে সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। 'চরিত্রহীন' এর বিশেষ ভক্ত ও অনলস পাঠক হয়েও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মানিকের অভিযোগ ছিল, "শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয় সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।'[৫] হৃদয়াবেগের তুলনায় যুক্তি ও মননশীলতার প্রতি তার আগ্রহ অধিক। কবি রবীন্দ্রনাথ তার কাছে 'প্রশ্নোত্তর সাহিত্যিক। অতি আধুনিক তরুণ লেখকদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।

"সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, সেই সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।'[৬] এই ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে সৃষ্ট চেতনার নিরাসক্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি তার প্রথম জীবনের সাহিত্যে অসঙ্গতির মূল কারণ খুঁজেছিলেন রয়েডের ব্যাখ্যায়। এই অনুসন্ধান স্বল্পায়ু। বেশীদিন লাগেনি তার জীবনের সামগ্রিক অসঙ্গতির মূল কারণ অনুসন্ধান করে নিতে। তখনই তার সাহিত্যের পাল বদল ঘটেছে।

হিন্দু বাঙালী তারাশঙ্কর মানুষের মহিমাকে দেখতে চেয়েছেন সামন্তিক শাসিত, আদর্শায়িত ভারতবর্ষের পটভূমিকায়। যদিও সনাতন ভারতবর্ষ

৩॥ 'সাহিত্য করার আগে' প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪॥ ঐ, পৃ. ৩১।
৫॥ ঐ, পৃ ২২।
৬॥ ঐ, পৃ. ২৭-২৮।

আরোপ করা সত্ত্বেও তার চরিত্রগুলি রয়ে গেছে বাঙালীই। মানিকও মানুষকে দেখেছেন, বাস্তব মানুষকে। দেখেছেন, পর্যালোচনা করেছেন শহরে গ্রামে ছড়ানো মানুষের সামগ্রিক জীবনসমস্যার পটভূমিকায়। তারাশঙ্করের মহিমান্বিত চরিত্রাবলী ত্যাগী, সেবক ও ঈশ্বরপ্রেমিক। মানিকের দেখা ও জানা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি যে শ্রেণীবদ্ধ মানুষের প্রতিনিধিদের সাহিত্যে এঁকেছেন তাদের শক্তি নিহিত সংগ্রামী মনোভাবে ও কাজে। সকল প্রকার নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত মানুষকে তারাশঙ্কর দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যে অহিংস আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন তার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না সেই মুক্তিকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা। তারাশঙ্করের নিপীড়িত শ্রেণী দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া নিজেরা জাগে না। তাদের প্রতিবাদী করে তোলে মধ্যবিত্ত কোনো নেতা বা নিম্নবিত্ত অর্ধশিক্ষিত কোনো ব্যক্তি।

মানিকের দেখবার দৃষ্টি ও দৃষ্টিসংবেদ ভিন্ন প্রকারের। তিনি অত্যাচারিত শ্রেণীর মধ্যে শক্তির উন্মেষ লক্ষ্য করেছেন এবং সেই উন্মেষকে সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। এ শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে উৎপীড়িত শ্রেণীর চেতনা এবং একতা। আর রয়েছে এই তথ্যটি যে জাগতিক পরিস্থিতিই মানুষের চালক এবং শক্তিদায়ক।

প্রথম জীবনে মানিক রোমান্টিক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী'র (১৯৩৫) রোমান্টিকতা বিশ্লেষণ করলে সেখানেও তার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা ধরা পড়ে। তার সমসাময়িক লেখকদের মতো জননীকে নিয়ে ভাববিলাসী হবার সুযোগ তিনি নেননি। অথচ তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে মৃত্যুও রোমান্টিক। 'জননী' মানিকের প্রথম উপন্যাস আর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের ভাবাবেগময় রচনা 'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৫৯) হচ্ছে পরিণত বয়সের রচনা।

মানিক তার সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতিপর্বে ভাববাদ ও বাস্তববাদের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হয়েছিলেন। যখন ভাববাদের ঘোর মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তখনই তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, অর্থনীতি মানুষের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ামক। ফলে ফ্রয়েডীয় ধারায় মানুষের অসঙ্গতিকে তিনি বিচার করা ছেড়ে দিয়ে মার্কসীয় ধারায় বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। অর্থনীতিকে মানুষ ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই মতকে তিনি উপন্যাস রচনার দ্বিতীয় পর্বে রূপ দিতে চেয়েছেন। অবশ্য তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা দেবার আগে তিনি তার দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব কয়েকটি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সঠিক পথ যেন পাচ্ছেন না ঐ সময়ে। এ সময়কার দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে 'শহরতলী'[৭] ও 'প্রতিবিম্ব'[৮]। অস্পষ্টভাবে হলেও মানিক 'শহরতলী'তে শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনা ও

সেই শক্তির শত্রুকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা তাঁর শেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির পূর্বসূরী।

ক্রমশ তাঁর রাজনৈতিক ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তখন তিনি দেখলেন —অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণই শুধু করা যায় না, অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নিপীড়িত জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করাও যেতে পারে জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় অধ্যায়, যাকে শেষপর্ব আখ্যা দেওয়া যায়, সে সময়ে তিনি হয়ে উঠলেন খাঁটি বিপ্লবী। প্রথম বা প্রস্তুতিপর্বে ভাববাদী ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে পথ খুঁজছিলেন, দ্বিতীয় পর্বে পথের সন্ধান পেয়েছেন —সে পথ দেশের আপামর শ্রমজীবী শ্রেণীর শোষণমুক্ত হবার একমাত্র নির্দিষ্ট সড়ক। তৃতীয় পর্বে তিনি সে-পথ চলবার প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়েছেন।

মানিক অন্য অনেক ঔপন্যাসিকদের মতো আপসকামী রাজনীতির সুগম পথটা বেছে নেননি। তাঁর কাছে দেশের মুক্তি মানে অর্থহীন স্বাধীনতা নয়— যে স্বাধীনতা শুধু স্বল্পসংখ্যক লোকের সুবিধা বয়ে আনে। তিনি মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছেন। কারণ তিনি দেখেছেন অর্থনীতির সূত্র ধরেই নিপীড়নের বীজ জনগণের মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত রাষ্ট্র। ইংরেজকে তিনি এ দেশের একমাত্র শত্রু রূপে আঁকেননি। এঁকেছেন সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রী রূপে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরেও শোষণের যে অবসান হয়নি তা তিনি তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্তের দূরত্বটা অতিক্রম করে জনজীবনের কাছে গেলে যে সত্য সামনে আসে তা তিনি উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন। সে সত্যের নাম শ্রেণীসংগ্রাম।

মধ্যবিত্ত মানিক স্বশ্রেণীর জন্য মমতা বোধ করতে পারেননি। কারণ মধ্যবিত্ত যতক্ষণ না, শ্রেণীচ্যুত হচ্ছে ততক্ষণ সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার পথে বিঘ্ন থেকে যাচ্ছে। তিনি দেখেছেন, কি প্রচণ্ড অবক্ষয়ের ভেতর দিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী উচ্চবিত্তের সঙ্গে আপস করে নিজের হাস্যকর শ্রেণীচেতনাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। জনজীবন-বিচ্ছিন্নতা এই মধ্যশ্রেণীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ আপন উপনিবেশে মধ্যবিত্তের আধাসামন্তবাদী আধাবুর্জোয়া মানসিকতা লালন করে তাকে এমন বিচ্ছিন্ন করে রাখে নিজের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়কে অক্ষুন্ন রাখতে। মানিক রাজ-

---

৭॥ 'সহরতলী', (প্রথম পর্ব, ১৯৪০, দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৪১)।

৮॥ 'প্রতিবিম্ব', রচনাকাল ১৯৪৩ সাল। মুদ্রিত উপন্যাসে গ্রন্থ প্রকাশের কোনো তারিখ নেই।

নৈতিক আন্দোলন পর্যালোচনা করে তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত মধ্যবিত্ত আন্দোলনগুলি শ্রেণীস্বার্থ আদায়েরই আন্দোলন। যদি কখনো আন্দোলন গণমুখী হয়ে উঠতে চেয়েছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভু সে আন্দোলনকে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সহায়তায় হয় থামিয়ে দিয়েছে, নতুবা মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের আন্দোলনে পর্যবসিত করেছে।

তাঁর বক্তব্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে এবং সেইসঙ্গে নিপীড়িত চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে আরও সংগ্রামী, নিজেদের মুক্তির পথ সম্বন্ধে নির্ভুল লক্ষ্যসন্ধানী। মানিকের প্রথম দিকের রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলি কতকটা আত্মসন্ধানী। ধীরে ধীরে এই শ্রমজীবী শ্রেণী নিজেদের সামাজিক অবস্থান ও উচুতলার অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল। এরপর তিনি দেখালেন এদের একতা ও ঐক্যবদ্ধ শক্তির রূপটাকে।

মানিকের রচনাতেও তারাশঙ্করের মতো মধ্যবিত্ত নেতা রয়েছে। তারাশঙ্কর নেতৃত্ব আরোপ করেছেন মধ্যবিত্তের হাতে। মানিক আগে দেখেছেন নেতারা কোন ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছে। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সত্যটাই তাঁর বিবেচনার বিষয়, নেতৃত্ব নয়। তবু যখন নেতৃত্বের প্রসঙ্গ এসেছে তিনি তাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করেছেন। যেমন, যে-নেতৃত্ব শুধু নিজ ও শ্রেণীস্বার্থ সন্ধানী তাকে তিনি ক্ষমা করেননি তাদের তিনি চিহ্নিত করেছেন জনগণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল রূপে। সন্ত্রাসবাদী নেতাদের তিনি সমালোচনা করেছেন, অবশ্য সশ্রদ্ধভাবে। আর যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীচ্যুত হয়ে যথার্থই মেহনতী শ্রেণীর জন্য লড়াই করতে চাচ্ছে তাদের প্রতি তিনি প্রীতিজনিত আস্থা রেখেছেন। শ্রেণী অবস্থানের গুরুত্ব তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অন্তরে শুধু শুভবোধ থাকলেই নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি আনা যায় না—এ সত্য তিনি বারবার বিভিন্ন উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তের পক্ষে পুরোপুরি শ্রেণীচ্যুত হওয়া যেমন দুঃসাধ্য, তার চেয়েও দুরূহ নিচুশ্রেণী কর্তৃক মধ্যবিত্তকে সন্দেহমুক্ত হয়ে আপন জন রূপে গ্রহণ করা। তবে কি শ্রেণী বিভেদ ঘুচবার নয়? মার্কসীয় দৃষ্টিতে তিনি এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে. সে মুক্তি আনতে পারে শ্রেণীচ্যুত মধ্যবিত্তের নিরভিমান বৈজ্ঞানিক শুভবোধ আর শ্রমজীবী শ্রেণীর একতাবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি। নেতৃত্ব সম্বন্ধে মানিক চরম কথা বলেছেন। তাঁর মতে পরিবেশই নেতার জন্মভূমি। উপযোগিতা ও চাহিদা অনুসারে নেতার অভ্যুদয় যে কোনো শ্রেণী থেকেই সম্ভব। তার জন্য বীরপূজার প্রয়োজন নেই।

মানিক অধ্যাত্মবাদী যেমন ছিলেন না (যার জন্য আত্মার কথা তিনি কখনও বলেননি), তেমনি নিজে বামপন্থী দলের সভ্য হলেও তাঁর উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির উপায় দেখাতে গিয়ে তাদের যে বিশেষভাবে কোনো বিশেষ

বামপন্থী দলেরই অনুগত হতে হবে এমন কোনো কথা বলেননি। তাঁর রচনায় শ্রমজীবী অত্যাচারিত মানুষেরা নিজেরাই দল বেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে তাদের নামমাত্র কোনো নেতা রয়েছে, কখনো জনগণ নিজেই প্রতিরোধের নেতৃত্ব নিয়েছে।

তাঁর বক্তব্য যে সর্বত্র সুস্পষ্ট হয়েছে এমন নয়। লেখাই ছিল তাঁর জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। অনেক সময় তাকে খুব তাড়াতাড়ি লিখতে হয়েছে। সে জন্যও বটে, আবার আধাসামন্ত আধাবুর্জোয়া পরিবেশে বসে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পন্থা অন্বেষণ করা যেমন দুঃসাধ্য নয়, তেমনি নির্ভুল লক্ষ্যের জন্য পথ নির্দেশ করাও দুঃসাধ্য। তিনি তারাশঙ্করের মতো জনপ্রিয় হতে পারেননি। তিনি যে শোষণহীন জীবনে উত্তীর্ণ হবার জন্য সংগ্রামী আহ্বান জানাচ্ছেন সে চেতনা হয়তো শ্রমজীবী মানসে রয়েছে কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক আবেদন সেখানে পৌঁছাবার কথা নয়। তিনি শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতায় আস্থা রেখেছেন এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তিতে দ্বিধাহীন বিশ্বাস রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি যদিও শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র অনেকটা তুলে ধরতে পেরেছেন তথাপি শ্রেণীসংঘর্ষের অবশ্যম্ভাব্যতাকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে পাঠকের সামনে আনতে পারেননি। এমন ক্ষেত্রে বক্তব্যের অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এর কারণও অবশ্য অপ্রত্যক্ষ নয়। মধ্যবিত্ত পাঠক যে সমাজের তা নিত্য অবক্ষয়ের মধ্যেও টিঁকে রয়েছে, শুধু টিঁকেই নেই শ্রেণীদ্বন্দ্বকে প্রাণপণে এড়িয়ে ও ঠেকিয়ে চলেছে। সেই এড়ানো ও ঠেকানোর কারণের জন্য শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাজনীতি কোনো প্রবলতা লাভ করতে পারেনি; বাস্তবে যা সুস্পষ্ট নয় সাহিত্যে তার প্রতিফলন স্বভাবতই অস্পষ্ট। যে জন্য প্রত্যাশিত ভুবনকে বাস্তবায়িত হতে তিনিও দেখে যাননি।

মানিকের রচনা সর্বত্র সুখপাঠ্যও নয়। ভাষাকে তিনি বক্তব্যের অনুগামী করেছেন, স্বপ্ন-বোনার কাজে ব্যবহার করেননি। ভাষাকে ব্যবহার করেছেন লড়াইয়ের হাতিয়ার রূপে। অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতো তিনি আঙ্গিকপ্রধান উপন্যাস লেখেননি, লিখেছেন বক্তব্যপ্রধান লেখা।[১] তাঁর বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক

রুগ্নতার জন্যও অনেকটা এবং জীবিকান্বেষণের ব্যস্ততার কারণেও বটে তাঁর লেখা সকল সময়ে শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তদুপরি প্রত্যেক শিল্প মাধ্যমই একটা বিশেষ এবং নিজস্ব ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে মানিক যে বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন সেই বক্তব্যের পক্ষে অবলম্বনযোগ্য ও সহায়ক কোনো ঐতিহ্য ছিল না। তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই তাঁর রচনার মধ্যে এক ধরনের অনভ্যস্ততা আছে যা শিল্পে-উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে ধনাত্মক নয়, ঋণাত্মক।

এ বার মানিকের উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তার ধারা প্রবাহটি অবলোকন করতে সচেষ্ট হতে পারি। 'সহরতলী'র যশোদা জানত না তার সামাজিক অবস্থান ও মূল্য। মৃতবৎসা, বিধবা, বিরাটকায়া যশোদা তার বাড়ির শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসে শ্রমিক সুহৃদ হয়ে পড়ল। শ্রমিক রাজনীতি কি তা স্বল্পশিক্ষিতা যশোদার জানবার কথা নয়। অথচ যেহেতু শ্রমিকরা বুঝে নিয়েছে যে, যশোদা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তখন বলতে গেলে তারই কথামতো মালিক সত্যপ্রিয়র ত্রুটি মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে এগিয়ে গেছে। একসঙ্গে থাকার ফলে এইসব বঞ্চিত শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উপযোগী সময় ও ক্ষেত্র সম্পর্কে বুদ্ধিমতী যশোদা সজ্ঞানতা লাভ করেছিল। 'গণদেবতা'র দেবুর মতোই উপচাকির্মু যশোদা। শ্রীহরিদের প্ররোচনায় যেমন দেবুকে গ্রামের সবাই ত্যাগ করল, যশোদাকেও তেমনি শ্রমিকরা পরিত্যাগ করল সত্যপ্রিয়র মিথ্যা রটনায়। শ্রমিকরা যে একটা 'শ্রেণী' যশোদা সেটা জানল শ্রমিকদের জন্য আয়োজিত সভায় গিয়ে। সত্যপ্রিয়র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত যশোদাকে সহরতলী ছেড়ে চলে যেতে হল। শ্রমিকদের স্থান সঙ্কুলান সহরে হতে চায় না তাই সহরতলী যতই সহর হয়ে ওঠে শ্রমজীবী মানুষকে ততই সেখান থেকে সরে যেতে হয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশে শ্রমজীবী শ্রেণীর শ্রম অনিবার্য রূপে প্রয়োজনীয়; কিন্তু সামাজিক স্বার্থের কারণে শ্রমজীবী শ্রেণীর পাশাপাশি অবস্থান ধনিক-শ্রেণীর কাম্য নয়। সহরের সামাজিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর উপস্থিতি ধনিকশ্রেণীর পক্ষে এক ধরনের সামাজিক উপদ্রব। তাই এই শ্রেণীকে ক্রমশ সহর থেকে সহরতলীতে সরিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দেয়।

যশোদা সংগ্রামী নয়, জেদী। শ্রমিকদের জন্য আয়োজিত সভায় গিয়ে কর্মকর্তাদের আলাপ-আলোচনা শুনে তার চেতনা হয়েছিল যে, ঐ শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশার লঘুকরণ অন্তত একক প্রচেষ্টায় হয় না। তার বিপ্লবী চেতনা হয়তো নেই, কিন্তু রয়েছে আশ্চর্য কাণ্ডজ্ঞান। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের শেষাংশে দেবু সত্যযুগীয় ভারতবর্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ও স্বপ্নের কথা বলেছে (পঞ্চগ্রাম—পৃ. ২৯৬)। দেবুর গ্রাম-পরিকল্পনা নিখুঁত। ঐ ত্রুটিহীন স্বপ্নচিত্রের সঙ্গে যশোদা যে তার 'মনের মতো সহরের' ছক আঁকে, সেই ভবিষ্যৎ চিত্রটির তুলনা করা চলে।

যশোদা কুলি-মজুরদের সঙ্গে বসবাস করে। দেবু যেমন গ্রামবাসীদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল যশোদাও তেমনি কুলি-মজুরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে। যশোদা প্রথমেই চায় শ্রমজীবীরা যেন পেট ভরে খেতে পায়। তারপর তারা যেন পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ও প্রয়োজনানুসারে স্ত্রী পায়। যশোদা তার কল্পনাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে মজুরদের জন্য তার ছকে একটু অবসর ক্ষণও রাখে। যে অবসরের ফাঁকে ওরা জীবনটা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু যশোদার ছক এ পর্যন্ত এসে থেমে যায়। কারণ সে বুঝে ফেলেছে যে, অন্য শ্রেণীর মতো শ্রমজীবীদের ধন মান স্বাস্থ্য সুখ তেজ জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যশ দাবি করতে নেই। তার কল্পনার শক্তি আশ্চর্য রকম আছে। দরিদ্র শ্রমিকদের রোগ শোক, দুঃখ তাপ, তার কল্পনার ক্ষমতার বলে সে ম্যাজিকওয়ালাদের মতো দূর করে দিতে পারে, কিন্তু কল্পনাবোর বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করে আর এগোতে চায় না, "এদের দুর্দশা দেখিতে দেখিতে কল্পনা বোধহয় তার হইয়া গিয়াছে ভোতা, তাই অসম্ভব স্বপ্ন দেখিতে পারে না"।[১০] দেবুর সঙ্গে যশোদার পার্থক্য এখানেই। দেবু স্বপ্ন সার্থক হবে কেমন করে এই বাস্তব প্রশ্ন তোলেনি। সে সজ্ঞানে তার আদর্শায়িত কল্পিত সত্যযুগকে ভবিষ্যতে স্থাপিত করেছে। কৃষক সন্তান আদর্শবাদী দেবুর আকাঙ্ক্ষা তারাশঙ্করের কাছে আবেদনময় মনে হয়েছে, কিন্তু অমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা কোন পন্থার প্রয়োগে সম্ভব হবে সে বিষয়ে নিরুত্তর তারাশঙ্কর। অন্যপক্ষে যশোদা স্বপ্ন দেখে কিন্তু 'অসম্ভব স্বপ্ন সে দেখিতে পারে না'। কৃষকের পুত্র দেবু কল্পনায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে। যশোদা হয়নি, তার জাগতিক অবস্থান তার কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যশোদার কল্পনা আছে, কিন্তু কল্পনা বিলাস নেই। শ্রমিকদের 'দুদশা'ই বড় সত্য তার কাছে, অন্যদিকে কৃষকদের 'দুদশা' তত বড় সত্য হয়ে ওঠেনি দেবুর কাছে, কেন না মনের দিক থেকে সে দূরবর্তী হয়ে পড়েছে কৃষকদের থেকে।

'সহরতলী' উপন্যাস মানিকের লেখক জীবনের সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি। সংগ্রামী মানুষকে তখনও তিনি খুঁজে ফিরছেন। শ্রমিক ও দরিদ্রদের যে সংগ্রামী জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'বীভৎস'। এমন মানসিক অবস্থায় তাকে মেনে নিতে দেখি, "...আমাদের কথা কে শুনবে বলো? আমরা হলাম গরীব মানুষ" (৩৬৭)। যে রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ইলেকশনে জেতা, তার কথা 'সহরতলী'তে নেই। কিন্তু রয়েছে মিল-মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আংশিক সফল সংঘর্ষের জীবন্ত দলিল যা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমনভাবে দেখা যায়নি। শ্রমিক সম্বন্ধে সচেতনতা এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দিক। মানিক যশোদার মাধ্যমে এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে,

১০। 'সহরতলী', মা. গ্র., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক শ্রমজীবীর জন্য দরদ দেখাতে গেলে তা সার্থক হয় না, তাতে সমস্যারও সমাধান হয় না। একটা শ্রেণী হিসাবেই তাদের সমস্যাকে অনুধাবন করতে হবে। ভাবালুতাহীন একটা বলিষ্ঠ জীবনাবেগ এ উপন্যাসে প্রতিফলিত।

'প্রতিবিম্ব' রচিত হয়েছে মানিকের পুরোপুরি মার্কসবাদী শিক্ষা গ্রহণের কিছু আগে। সে কারণে 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসকেও বলা চলে তাঁর সাহিত্য জীবনের সন্ধিক্ষণের রচনা। 'প্রতিবিম্ব'-এর আগে রচিত 'অহিংসা' (১৩৪৮) উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রণিধানযোগ্য।, রূপক-ধর্মী রাজনৈতিক উপন্যাস রূপে 'অহিংসা'র বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগটি ছিল মূলত উপন্যাসের নাম নিয়ে। ভারতবর্ষে তখন অহিংস আন্দোলন চলছিল, কাজেই উপন্যাসের 'অহিংসা' নামকরণে বিতণ্ডার সূত্রপাত। ধর্মকে মূলধন করে এ দেশের আশ্রমিক ব্যবসায়ে যে ভণ্ডামী চলে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই বইটিতে। মানিক নিজে অবশ্য এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা স্বীকার করেননি।[১১] কিন্তু উপন্যাস পর্যালোচনা করলে তাঁর ঐ অস্বীকৃতি ঠিক মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন মেনে নেওয়া যায় না রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাখ্যাটিকে যে, 'চার অধ্যায়' রাজনৈতিক লেখা নয়।

'অহিংসা'র কাহিনীতে জটিলতা রয়েছে। যদিও চরিত্রগুলির কার্য ও কারণের পেছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তা লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তবু একটা অস্বচ্ছভাব কুয়াশার মতো কাহিনীকে আবৃত করে আছে, যেমন থাকে রূপকে। সহস্র মাইল ব্যাপী তপোবনের মালিক বিপিন একজন আশ্রমিক ব্যবসায়ী। লোকের ভক্তিকে ভাঙ্গিয়ে সে পয়সা উপার্জন করে। ভক্তের সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে তার ব্যবসায়ের উন্নতি। ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের ভক্তি নিষ্কাশনে যে ব্যক্তি অধিক পারদর্শী, বিপিন তাকেই আশ্রমের ভার দিয়ে দেয়। সে জন্য যখন তার আশ্রমে তারই প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী ভণ্ড সদানন্দ জনগণের কাছে ভক্তির তুলনায় ভীতির পাত্র হয়ে উঠল তখন বিপিন সদানন্দকে আশ্রম থেকে সরিয়ে দিল। সদানন্দর স্থলাভিষিক্ত হল মহেশ চৌধুরী। মহেশ চৌধুরী অহিংসা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র। জনসাধারণের ভক্তিকে আকর্ষণ করে আশ্রমিক ব্যবসা জমে ওঠে। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা সে জন্য এ ব্যবসায়ের একটি প্রধান দিক। এমন কি বণিক বিপিনও জানে, "ওদের বাদ দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়।"[১২] সাধারণ মানুষ আবার পছন্দ করে

১১॥ "বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই", —'লেখকের বক্তব্য', মা. গ্র., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

১২॥ 'অহিংসা', মা. গ্র., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯০।

মহেশ চৌধুরীকে। মহেশ বিশ্বাসী লোক, 'নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা' তার আছে।

মহেশ অহিংস হলে কি হবে তার ছেলে বিভূতি জেলফেরতা সন্ত্রাসবাদী। বিভূতি বিভিন্ন গ্রামে ব্যায়াম সমিতি গড়ে তুলেছে তরুণদের সাহায্যে। আর অর্ধ-উলঙ্গ বোকা নোংরা লোকগুলোকে সে আত্মহত্যার বদলে হত্যা করতে শেখায় (১৭৬)। স্বভাবতই মহেশ নিজের সন্তানের এ হেন কাজকে 'অকাজ' বলে মনে করে। তার আক্ষেপের ভাষা, "ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে —গ্রামে আর এমন ছেলে নাই! কেবল বুদ্ধিটা একটু বিকৃত ভালমন্দের ধারণাটা ভুল" (১৮০)। যাত্রাগান উপলক্ষে ছোটলোকদের পক্ষ নেওয়াতে বিরোধী দল বিভূতির নিরীহ পিতা মহেশকে নৃশংসভাবে প্রহার করল। বিভূতির প্রতিশোধ স্পৃহা দেখে মহেশ প্রাণপণে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছে। "মার খাইয়া মহেশ চৌধুরী মার ফিরাইয়া দিয়াছে, মানুষের কাছে এই রকম অসভ্য বর্ব্বররূপে পরিগণিত হওয়ার ভয়" (১৯২) যে আসলে তার পিতার দুর্বলতা ও ভীতির কারণ তা বুঝতে বিভূতির দেরী হয়নি। কিন্তু তবু বিভূতি তার ও তার পিতার প্রহারের প্রতিশোধ নিয়েছে। লম্পট সন্ন্যাসী সদানন্দের প্ররোচনায় বিভূতি সদানন্দের ভক্তদের হাতে প্রহৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আদালতে দাঁড়িয়ে মহেশ বিভূতির মৃত্যুর জন্য সদানন্দকে অভিযুক্ত না করে নিজের পুত্রকেই দায়ী করেছে। তার মতে বিভূতির ন্যায়-অন্যায় বিচার বোধ ছিল না, থাকলে সে হিংস্র হতে পারত না। এমন একটা মনোভাব দেখা যায় মহেশের।

মহেশের কাছে অহিংস থাকাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ন্যায়, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। মহেশ এই সত্যটা দেখতে পায় না যে, হিংসার মৌল কারণ কি। বিপিনের অনুরোধে মহেশ আশ্রমের ভার নিল। কারণ বিপিন দেখেছে মহেশ যেমন জনসাধারণকে ভালোবাসে, জনসাধারণও তার কথা শোনে। আশ্রমের ভার গ্রহণের আগে সদানন্দ আয়োজিত দাঙ্গার ফলে বিভূতি মারা গেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এই আশ্রমেই। পুত্রের মৃতদেহের পাশে বসে শোকাভিভূত মহেশ একটা সত্য আবিষ্কার করেছিল, যেটা উল্লেখযোগ্য। সে দেখল যে, এত বড় দাঙ্গা, মৃত্যু এ সব ঘটনার চেয়ে লোকজন বরং গতরাতে 'এগার বছরের মেয়েকে নিয়া একটু আমোদ করিয়াছিল' —এমন অশ্লীল ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে সকলে যেন সেই আলোচনাটা বেশী উপভোগ করছে (২০০)। সে তখন একটা পুরনো কথা নতুন করে উপলব্ধি করল, "চাপা দিলে সত্যই রোগ সারে না" (২০১)। মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহেশ আরও একটা সত্য জানে যে, মানুষ অনেককাল ধরে রোগে ভুগছে এবং দু' একজন 'মহাপুরুষ' রোগমুক্তির জন্য 'ছোটখাট' নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়েছেন, এবং এই মহাপুরুষরা "মানুষের রোগের

কারণ ···জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাও রুগী।" কতকটা অস্পষ্ট হলেও লেখক বলতে চাচ্ছেন যে, ধার্মিক মহাপুরুষরা যে পথে মানুষকে মুক্ত করতে চান সে পথে মুক্তি আসা অসম্ভব। ব্যবস্থা পাল্টালে অবস্থা বদলাবে। লেখক এও বলেছেন যে, মহেশের এই আত্মদর্শন কাজে লাগবে না। কারণ সে উক্ত মহাপুরুষদের মতোই ধর্মের পথে মানুষের বিকার থেকে মুক্তির পথ খুঁজবে। মানিক 'অহিংসা'য় লেখকের মন্তব্যে নিজেই বলেছেন যে, "মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার, একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে, এইটুকুই আমরা দু'জনে জানি" (২০১)। এই বক্তব্যে যে শাস্ত্রটির উল্লেখ মানিক করতে চেয়েছেন সেটা অবশ্য অস্পষ্ট থাকে না। তিনি এইসঙ্গে আরও বলেছেন যে, মহেশ চৌধুরীর উত্তেজনাহীন একপেশে অহিংসায় মানুষের রোগমুক্তি ঘটবে না।

জনপ্রিয়, চরম অহিংস, মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মানবপ্রেমিক মহেশ চৌধুরী স্বাভাবিকভাবেই মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কেন না দু'জনের কাজে ও চিন্তাধারার মধ্যে একটা সাদৃশ্য বর্তমান। নিজে গুরুতর রূপে প্রহৃত হয়ে পুত্রকে অন্যের দ্বারা নিহত হতে দেখেও হিংস্র কোনো বিকল্প মহেশ ভাবতে পারেনি, বরং আপন সন্তানকেই ঘটনার জন্য দায়ী করেছে। অহিংসাই তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়, যেমন ছিল গান্ধীর। মানিক নিজেও জানেন এবং জানাতে চেয়েছেন যে, মানুষের রোগ-যন্ত্রণার স্থায়ী মুক্তির জন্য একটিই শাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু মহেশ চৌধুরীদের মতো মহাপুরুষরাই সেটির প্রয়োগ হতে দেবে না।

যে কালে মানিক মানুষের মুক্তির জন্য একটা নির্ভুল পথ খুঁজেছেন সেই-কালের শেষ উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'। ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে উত্তীর্ণ হবার সঠিক রাস্তা তখন তিনি সন্ধান করে ফিরছিলেন। প্রবৃত্তির, মানুষের প্রকৃতির অন্তর্লীন আবর্তের কার্যকলাপের তুলনায় বস্তুর অর্থাৎ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ যে জীবনের জটিলতার জন্য বেশী দায়ী, অধিকতর সক্রিয় তা তিনি আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলেন। ১৯৪৩ সালে রাজনীতি-সন্নিকটবর্তী ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে।[১৩] শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে শ্রেণীর পক্ষ তিনি নেবেন সেই পক্ষের প্রয়োজনে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পন্থার জন্য তাঁর অন্বেষা। সাম্যবাদী ধারণা

১৩॥ সরোজমোহন মিত্র, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য', (১৩৭৭), পৃ. ৬৬।

তখনও তিনি গড়ে তুলতে পারেননি। যখন ধারণা গড়ে তুললেন তখন লেখার ধারাও গেল বদলে। ১৯৪৪ সালের শেষাংশে মানিক ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন এবং আমৃত্যু তিনি পার্টির সদস্য ছিলেন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য থেকেও তিনি নিজের মতো করে সাম্যবাদী ধ্যান ধারণার কথা বলে গেছেন। পার্টির মতানুসারে বলেননি। যেমন শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের কর্মী হয়েও রচনা করেছেন সন্ত্রাসবাদীদের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হবার আগে 'প্রতিবিম্ব' লেখা হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে লেখকের বক্তব্য-সম্বলিত একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। "সাধারণ কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে"[১৪] এবং এর ফলে ভাবপ্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্বের স্বরূপ কি সেটা জানাবার জন্য এ উপন্যাসের সৃষ্টি।

নায়ক তারক মধ্যবিত্ত, আদর্শে ও ভাববিলাসী। কল্পনায় সে শ্রমিক জাগরণ চায় (৩৭৯)। কিন্তু বাস্তবে তারক মজুর হিতৈষণা সত্ত্বেও তার পার্টি আরোপিত দায়-দায়িত্ব বহনের পালাটিকে সুনজরে দেখে না। সুতরাং বাধ্যবাধকতার জন্যে পার্টিতে যোগদান ও জীবন যাপনের জন্য চাকরি করা উভয়কেই সে এড়িয়ে যায় সুকৌশলে। গ্রামের ছেলে তারক কলকাতায় এসে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মসূচী দেখে হতাশ হয়। এদের দলাদলি, পাণ্ডিত্যমন্যতা এবং হাস্যকর দরিদ্র জীবনকে 'ত্যাগ' নামে চিহ্নিত করাকে সে সমালোচনা না করে পারে না। এদের পরিকল্পনা তার কাছে অর্থহীন, অবাস্তব মনে হয়। অথচ এই কলকাতার ট্রামে তারক পর্যবেক্ষণ করেছে ভদ্রলোকদের একাকীত্ব এবং ছোটলোকদের একতা (৪০৩)। অভিজ্ঞতা হয়েছে ভদ্রলোকদের ভণ্ডামী সম্বন্ধেও। কলকাতার পার্টির নির্দেশ হল তারক চাকরি করে দলকে টাকা দেবে। তারক ইচ্ছা করে চাকরি নিল না, সে ফিরে গেল তার মফস্বল শহরে।

ভাববাদী তারক এ বার তার ত্রুটি সংশোধনে তৎপর হবে। এত দিনকার পরিচিত চাষী-মজুরদের বিশেষভাবে সে চিনতে সচেষ্ট হবে (৪১৪)। দেখবে ওরা কি করে, কি ভাবে। কারণ শ্রমজীবীদের সঙ্গে তার চেনা-জানা সম্পূর্ণ হয়নি। অবশ্য এই অসম্পূর্ণতার কোনো স্পষ্ট কারণ 'প্রতিবিম্ব'-এ দেখানো হয়নি।

মানিক তার অনেক পরের একটি উপন্যাসে ('ছন্দপতন', ১৯৫০) কবি নায়কের মুখে তারকদের অন্য শ্রেণীর সঙ্গে অমন অসম্পূর্ণ পরিচয়ের কারণ খুলে বলেছেন। 'প্রতিবিম্ব'-এ অবশ্য তিনি শুধু ত্রুটি নির্দেশ করেছেন, কতকটা সংশোধনের পথ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সুস্পষ্ট কোনো সমাধান দেননি।

১৪॥ 'লেখকের বক্তব্য', 'প্রতিবিম্ব', মা. গ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

শ্রমজীবীদের জন্য আন্দোলন করতে মধ্যবিত্তরা দল গড়ছে, কেউ বা তারকের মতো অন্দলীয় থেকেও শ্রমজীবীদের উন্নতি করতে চাচ্ছে। অথচ এরা কেউ ঐ শ্রেণীকে ভালোভাবে জানে না। ফলে আন্দোলন সফল হয় না। অথচ তারকদের মতো লোক যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তার কথা মতো বিশটা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়। যশোদা হেরে গেছে মালিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তি ও কূটনীতির কাছে। তারক লড়াইতে নামেনি, কারণ সে অলস, ভাববাদী ও স্বশ্রেণীতে অবস্থিত। তবু এই ব্যঙ্গাঙ্কিত চরিত্রটির মধ্যে এমন একটি সহজ কাণ্ডজ্ঞান রয়েছে যা তৎকালীন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল না। যাদের জন্য তারকরা প্রাণপাত করবে সেই শ্রেণীর মানসিকতা ও লোকদের কতটা চেনে এরা? শ্রেণীচ্যুতি কতটা সম্ভব এদের পক্ষে?

মধ্যবিত্ত ভাববাদী কর্মীদের এবং কৃষক মজুরদের মধ্যে যে একটা 'ফাঁক' রয়েছে এ বিষয়টা লেখকের চোখ এড়ায়নি, যদিও তা পার্টির লোকদের চোখ এড়িয়েছে। পার্টি আর লেখকের তফাৎ এইখানে। পার্টির দৃষ্টিশক্তি অধিক প্রখর হওয়া স্বাভাবিক কেন না পার্টিতে সমষ্টিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আছে —ব্যক্তিতে যা নেই। তবু পার্টির তুলনায় মানিকের উপলব্ধি প্রখর কারণ তার অবস্থান কিছুটা দূরে এবং তার চেয়ে বড় কারণ তিনি হৃদয় দিয়েও দেখেন, শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়। যদিও বুদ্ধি তার সর্বদা জাগ্রত এবং সেখানেই মানিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন অন্য সব ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বতন্ত্র।

তৎকালীন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের সমালোচনা কেবল মাত্র কংগ্রেসী তারাশঙ্কর করেননি, মানিকও করেছেন। এই পার্টির অভ্যন্তরে অযৌক্তিক দলাদলি, আত্মম্ভরিতা, অস্বাভাবিকতা এবং বক্তব্যের দুর্বোধ্যতা অনেকের সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। পরবর্তীকালে লেখা মানিকের ডায়েরিতে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অন্ধ্রের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয়ে মানিক ৫৩৫৫ তারিখে লিখেছেন—

"অন্ধ্রের ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। এই বিরাট বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ কি? দায়ী কে বা কারা?

"বিনয় শিখতে হবে, ঐতিহ্যকে বা বর্তমান সমাজকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার দম্ভ ত্যাগ করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। আমি মার্কসবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি, সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারি না। আমি লড়ায়ে শ্রমিকশ্রেণীর যোদ্ধা কমিউনিস্ট —আমার হৃদয় পাথর।" —ভারতের তৎকালীন কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের আত্মম্ভরি-মানসিকতার স্বরূপকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন রূঢ় ভাষায়। উপরোক্ত সমালোচনার শেষে একান্ত দুঃখের সঙ্গেই তিনি নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, "The C. P. I. does not

understand the mind of India."[১৫] অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছিলেন যে, 'প্রতিবিম্ব'-এ তিনি কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। বিদ্রূপ করেছেন ততোধিক। মানিক অবশ্য এ অভিযোগ সত্য নয় বলে জানিয়েছিলেন।[১৬] 'প্রতিবিম্ব' রচনাকালে তিনি নিজেও তারকের মতো কোনো দলের সভ্য ছিলেন না। সে কারণে একটি বিশেষ দলীয় রাজনীতির ত্রুটি দেখাতে নির্মম হতে পেরেছিলেন —সেটা দলের প্রতি তারকেরও প্রতি - কারণ উভয়েই ভাববাদী।

তারক কি তার আদর্শের অনুরূপ কর্মক্ষেত্র ও সহযোগী পেলে আলস্য ত্যাগ করে যথার্থ কর্মী হত না? মানিক সে প্রশ্ন তোলেননি। 'আদুরে ছেলে' তারক তত্ত্বগতভাবে দরিদ্র মানুষের শুভার্থী। সে নিজে বেকার। তার পিতা বৃদ্ধ ও অক্ষম এবং প্রায় দরিদ্র। তারক নিজের তরুণী ভার্যার সাহচর্য লাভ করবার জন্য বৃদ্ধ পিতার ভারবাহী হয়ে পিতার কাছে স্থায়ী হয়েই থেকে গেল। এই বিবেকহীন যুবক এরপর যাপন করবে একটা বিকারগ্রস্ত ঘরোয়া জীবন। অথচ সে মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছে যে, এর ফাঁকে সে শ্রমজীবী মানসকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনে নেবে। ব্যক্তিগত জীবনে তারক অলস এবং স্বার্থপর। এই তারক জনজীবনে পরার্থে কতটা উদ্যম দেখাতে সক্ষম হবে সেটা অমীমাংসিত রয়ে যায়। তার জীবনে সে নিজের দুই আপাত-বিরোধী জীবনধারাকে কিভাবে মেলাবে, তার পক্ষে কতটা সক্রিয়তা দেখানো সম্ভব হবে দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে মেলামেশায়, শ্রমজীবী শ্রেণী তাকে কেমন করে তাদের মনের ভাব জানাবে, তারকের পরিণতিটাই বা কি তা 'প্রতিবিম্ব'-এ তুলে ধরা হয়নি। কারণ মানিক তখন সম্ভবত নিজেও জানতেন না এ সকল জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর কি।

এরপর মানিক বদলেছেন, রূপান্তরিত হয়েছেন। রূপান্তরের বীজ তাঁর মধ্যেই ছিল। মধ্যবিত্তের স্বার্থসঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে প্রায় প্রথম থেকে তিনি সচেতন। মার্কসবাদ গ্রহণ করে যুক্তিসম্মত সমর্থনও তিনি পেয়ে গেলেন এ বিষয়ে। অতঃপর মধ্যবিত্তের প্রতি তাঁর সমালোচনা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

লেখকের এক অসাধারণ রাজনৈতিক উপন্যাস 'দর্পণ' (১৯৪৫)। 'দর্পণ' উপন্যাসে স্বাধীনতাকামী মানুষের কথা পরাধীনতার বেদনার কথা রয়েছে, কিন্তু তিনি সে সব কথা বলেছেন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। একটি বিশিষ্ট মতবাদ তিনি এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই এটি দর্পণ। মানিক তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব চরমে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে শোষিত শ্রেণী

১৫॥ সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-২৮।

১৬॥ দ্রষ্টব্য : 'লেখকের বক্তব্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।

তাদের দুঃসহ সামাজিক অবস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংগ্রামে রত। এ সংগ্রামটা অতি অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এ দ্বন্দ্বের ইতিহাস একটা সামাজিক সত্য। তাঁর মতে এই সত্যটিকে স্বীকার করে তাকে রূপ দেওয়াটাই হচ্ছে প্রগতি সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।[১৭] 'দর্পণ' উপন্যাসের রচনাকাল থেকে তিনি শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত করবার কাজে নিয়োজিত হলেন।

বাংলা সাহিত্যে কৃষকদের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে অত্যুজ্জ্বল কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি তাঁর আগে। আমরা দেখেছি শরৎচন্দ্রের নায়করা সকলেই মধ্যবিত্ত এবং 'পথের দাবী'তে কৃষক হয়ে রয়েছে অপাংক্তেয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্তরায়। সব্যসাচী নির্দ্বিধায় বলেছিল যে, নিরীহ চাষাদের জন্য ভদ্রশিক্ষিত শ্রেণীর দুশ্চিন্তা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সব্যসাচীর মতে কোনো দেশেই কৃষকরা স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে তো না-ই বরঞ্চ বাধা দেয়। কৃষকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে দলে টানবার চেষ্টাকে সব্যসাচী বলেছে 'পণ্ডশ্রম'। এর-পর সব্যসাচী স্পষ্ট করেই বলেছে যে তার "কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র সন্তানদের নিয়ে।" এর কারণ হিসাবে সে বলেছে, "আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধ, নিরীহ কৃষকের কাছে আশা করা বৃথা, তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম,—অশক্তের, সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশি কামনার বস্তু।" কৃষকরা স্বাধীনতার ফাঁকা তত্ত্বকথায় যে ভোলে না —শরৎচন্দ্র তাঁর ভাবনাকে ঠিক ঐ ধরনের চিন্তার পথে চালিত করেননি। করলে তাঁর সব্যসাচীর ঘোষণা অবান্তর হয়ে দাঁড়াত। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের শান্তিপ্রিয়তাও তো তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন, অব-লোকন করেছেন 'পথের দাবী'র অন্যতম নায়ক অপূর্বকে। শিক্ষিত, স্বদেশ-প্রেমিক, দেশবাসীর অবমাননায় ক্ষুব্ধ, সজ্ঞান এই চরিত্রটি তার কাপুরুষোচিত কর্মের জন্য সব্যসাচীর একক প্রচেষ্টায় প্রাণভিক্ষা পেয়েছে। ভীরু, স্বার্থসচেতন এই 'শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্রসন্তান'টিকে সব্যসাচীর পন্থার দেশপ্রেম সংস্কারমুক্ত করেনি, করেছে ভারতীর অকুণ্ঠ প্রেম। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তকে যুক্তি দিয়ে এখানে দেখবার চেষ্টা করেননি। করলে দেখতেন তাঁর স্বষ্ট সব্যসাচীর উক্তির বিপক্ষে তাঁরই আর এক নায়ক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক পাশাপাশি। সব্যসাচী-বর্ণিত কৃষকাধিক কৃষক সে।

'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' বা 'সন্দীপন পাঠশালা'য় যে কৃষক আছে সে কোন কৃষক? পঞ্চগ্রাম কোন গ্রাম? দেবুর চোখে-দেখা কৃষক ও গ্রাম। দেবু নিজে কৃষক পুত্র, কিন্তু পৈত্রিক বৃত্তি ত্যাগ করে পণ্ডিত হয়ে বসেছে। পিতার

১৭॥ 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ', মা. গ্র., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।

অকালমৃত্যুর পরও সে কিছুকাল নিজের হাতে চাষ করত। কিন্তু তারপর পাঠশালার পণ্ডিত—এই অভিমানে সে আর নিজের হাতে চাষ করে না। দারিদ্র্য সত্ত্বেও শিক্ষার অভিমান তাকে চাষী হতে বাধা দিয়েছে যেমন দিয়েছে সীতারামকেও। কৃষকদের জীবনের নিপুণ চিত্রকর তারাশঙ্কর। কিন্তু ঐ চিত্রায়ণ যেন ধারা বর্ণনা। তাতে আবেগ রয়েছে, যুক্তি নেই। দেবু নিজে কংগ্রেসের আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখল। তার জেল খাটাই সার হবার কথা। কিন্তু লেখক অন্য কথা বলেছেন। দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে থেকে দেবু 'অন্য মানুষ' হয়েছে। "মানুষের জীবনীশক্তির মধ্যে অমরত্বের সন্ধান পাইয়াছে সে। ...দিন দিন মানুষের বুকের উপর মানুষের অন্যায়ের বোঝা চাপিতেছে। মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুত তাহার সহনশক্তি, নাভিশ্বাস ফেলিয়াও সেই বোঝা নীরবে বহিয়া চলিয়াছে, অদ্ভুত তাহার আশা —অদ্ভুত তাহার বিশ্বাস। সে আজও সেই কথা বলিতেছে, সে দিন গণনা করিতেছে—কবে সে দিন আসিবে। মানুষ—এই দেশের মানুষ মরিবে না। সে থাকিবে...।"

অহিংস, সহনশীল, ভাববাহী তার নিজের দেশের অমন নির্জীবতা তার শঙ্করের দেবুর কাম্য। তারাশঙ্কর ব্যক্তি মানুষের জাগতিক দুঃখ কষ্টের কথা ভাবেননি, "...এদেশের মানুষ মরিবে না। মঙ্গলময় মূর্তিতে নবজীবন লাভ করিবে। চার হাজার বৎসর ধরিয়া বারবার সঙ্কট আসিয়াছে—ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে—সে সঙ্কট সে ধ্বংস সম্ভাবনা সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নবজীবন জাগ্রত হইয়াছে"। মানুষকে বাদ দিয়ে তার জীবনকে একটা ধারা হিসাবে কল্পনা করেছেন লেখক। ব্যক্তি যে নিহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেই সত্তাকে অবজ্ঞা করে সমষ্টিগত পরিচয়ে সে যে বেচে থাকছে সেই সত্তাটুকুকেই বড় করে তোলা হচ্ছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি কবিদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। যেমন কবি বলেছেন, নাইটিঙ্গেলের মৃত্যু নেই, এই অর্থে যে একক নাইটিঙ্গেলটি মরে, কিন্তু সব সময়েই অনেক নাইটিঙ্গেল বেঁচে থাকে, নাইটিঙ্গলটির মৃত্যু আছে, কিন্তু নাইটিঙ্গেলেরা অমর। কবি যেমন পাখিকে দেখেন ঔপন্যাসিকের তেমন করে মানুষকে দেখবার কথা নয়, ঔপন্যাসিক জীবনের সন্নিকটবর্তী। এই কারণেই বলা হয় উপন্যাস হচ্ছে অবিশুদ্ধ শিল্পকলা, অর্থাৎ জীবন যেমন জটিল উপন্যাসও তেমনি। তদুপরি, সমষ্টিগত জীবন কোনোমতে টিঁকে থাকবে এই উপলব্ধিতে ব্যক্তির সান্ত্বনা কোথায়?

গতানুগতিক অধ্যাত্মগন্ধী সহানুভূতি থেকে কৃষকদের রেহাই দিলেন মানিক। মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে চরম অর্থনৈতিক পীড়নে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেই অসন্তোষ কিভাবে বিপ্লবী চেতনায় রূপান্তরিত হল তার অগ্নিসম্ভব চিত্র 'দর্পণ'-এ বিধৃত। হেরম্ব-লোকনাথ, হীরেন-মমতা, রম্ভা-রামপাল,

আরিফ-মোহনলাল, কৃষ্ণেন্দু-বীরেশ্বরের যে পার্থক্য তা শহরের বা গ্রামের দূরত্বের নয় —প্রভেদটা শ্রেণীগত। লেখক অত্যন্ত দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে দু'শ্রেণীর মনের প্রতিচিন্তন ও কর্মকে উপস্থিত করেছেন। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানিক দেখেছেন যে, তার নিজের দেশের জীবন যাপন প্রণালীর ধারায় ভূমি নির্ভর প্রায় সকলেই। 'প্রতিবিম্ব' থেকেই তিনি বলতে চাচ্ছেন, গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে সহাবস্থান শুধু কর্তব্য নয়, তাদের মন জানাও কৃষক-শ্রমিক হিতৈষী-দের উচিত। কৃষ্ণেন্দু যাদের মধ্যে কাজ করে তারা শ্রমিক। বীরেশ্বরদের গ্রামে সে আগেও গিয়েছে। তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে শহরের কল কারখানা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ। 'প্রতিবিম্ব' এর তারক আলতোভাবে, বাহ্যিক রূপ চেনা চাষী মজুরদের কলকাতায় বসে মনে করতে চেষ্টা করেছে। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ চাষী মজুরদের কথা ভাবতে গিয়ে 'কবর সার্ভিসেট পোস্টার দেখছি' আর তারকের আক্ষেপ ছিল 'ওদের ভাল করে জানি না'।

কৃষ্ণেন্দু সহরাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে নবচেতনা অন্বেষণ করে ফেরে। ছোট বড় হাঙ্গামা দেখে শ্রমিকদের মধ্যে "নতুন চেতনার লক্ষণ আবিষ্কার করে পুলকিত হবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়। চেতনা কই? জোয়ারে একটা অসন্তোষ সাড়া দিচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, এইটুকু শুধু সে অনুভব করতে পারে। অধিকারের দাবী কেউ তুলছে না। কয়েকটা অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার শুধু চাইছে।"[১৮] অথচ শ্রমিকদের নিয়ে যখন কৃষ্ণেন্দু খুব ব্যস্ত তখনই ঝুমুরিয়া থেকে বীরেশ্বর এসে কৃষ্ণেন্দুর সাহায্য চেয়েছে। বীরেশ্বর এবং ঠিকাদার হেরম্ব চক্রবর্তীর মধ্যে তুমুল বিরোধ শুরু হয়েছে। হেরম্ব ঝুমুরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে কুলি সংগ্রহের জন্য ঝুমুরিয়ার চাষীদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। বীরেশ্বর আগে থেকেই স্বদেশীআলাদের ছোঁয়াচ পাওয়া বদমেজাজী, জেদী চাষী। বীরেশ্বর আর গ্রামের কয়েকজন লোক হেরম্বর 'অন্যায় অত্যাচারে' বাধা দিচ্ছে বলে হেরম্ব বীরেশ্বরকে নানাভাবে শায়েস্তা করেছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে গ্রামের নিগৃহীতরা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সাহায্যে সে প্রচেষ্টা স্তব্ধ করে দেওয়া হল। খুন হল বীরেশ্বর। এই ঘটনার আগে কাহিনী আবদ্ধ ছিল মোটামুটি কৃষ্ণেন্দু, মমতা-হীরেন এবং রামপাল-রম্ভার দৈনন্দিন ও কিছু বহির্জাগতিক জীবন সম্পর্কের মধ্যে। ধনীকন্যা মমতা ও ধনীপুত্র হীরেনের শ্রমিকপ্রীতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভাববাদীর উদ্ভট নেশা। মমতা হীরেনকে সম্পূর্ণভাবে গরীবদের উদ্ধার কাজে নিয়োগ করবে বলে বিয়ে করেছিল। কিন্তু মমতা হীরেনকে তার দলে টানতে পারল না। হীরেনের স্বভাব পাল্টাল না। অন্যদিকে চাষীর মেয়ে রম্ভা কিন্তু পারল তার স্বামী রামপালকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে

১৮॥ ', মা. গ্র., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৬০।

নামাতে। এরা যে সংগ্রামে নামতে পারল তার কারণ হচ্ছে এ সংগ্রাম তাদেরই শ্রেণীর সংগ্রাম। মমতার উদার ভাববাদী সহানুভূতির সঙ্গে নির্যাতিত রম্ভা ও রামপালের সংগ্রামী মনোভাবের পার্থক্য থাকবে বৈকি। মমতার দূরত্ব, এমন কি মধ্যবিত্ত কৃষ্ণেন্দুর অসঙ্গতি —উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের আচরিত ধ্যান ধারণার মধ্যেই নিহিত। যেমন মমতা সারাদিন পরে থাকে লোক-দেখানো মিলের আটপৌরে শাড়ী, কিন্তু তার রাতের পোশাক সূক্ষ্ম রেশমী রাত্রিবাস। কৃষ্ণেন্দুও নিজের বিশেষ ধরনের পোশাক পরে ও সেই পোশাক তার দেহে কতটা মানানসই সে সম্পর্কে সচেতন (১১৪)।

মতের মিল না হওয়াতে মমতা সংসার ছেড়ে নেমে এল শ্রমিকদের পল্লীতে। সে সাধারণভাবে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু সাধারণ জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। বাইরে থেকে মমতা এতকাল এই বস্তিপাড়ার আসল জীবনের একটি কণাও বুঝে উঠতে সক্ষম হয়নি। এ জীবনের স্বরূপ যেমন রূঢ় তেমনি স্থূল। মমতা জনজীবনের সঙ্গে বসবাস করে উপলব্ধি করল, "এরা জানে না পরিচয় দেবার প্রয়োজন। এরা মানেই জানে না পরিচয় দেবার। এরা জানেও না নিজেদের পরিচয় কি"। বস্তির জীবনযাত্রা দেখে সেই জীবনের সঙ্গে মমতার ব্যবধান বেড়ে গেল।

মমতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'দর্পণ'-এ যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া শ্রমজীবীর জীবন যাপন পদ্ধতির রূপান্তর ঘটানো যাবে না। ব্যক্তিগত প্রযত্ন এখানে অর্থহীন। এমন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক দৈন্যের সমাধান আবেগ দিয়ে সম্ভব হয় না। সে জন্য মমতা এদের ভালো করবার আবেগটুকু কাজে লাগাতে পারছে না।

বরঞ্চ এই অযৌক্তিক ভাবাবেগ তার দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরিয়েছে। আরিফ নামে তাদের বন্ধুটি অর্থকরী ডক্টরেট ডিগ্রি না নিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের লোক ক্ষেপানোর অভিযোগে জেলে গেল। আরিফ, কৃষ্ণেন্দু এবং শ্রমিকেরা দরিদ্র জনসাধারণের নির্ভেজাল বন্ধু। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরা কতটা সফল? শ্রমিকদের পূর্ব ইতিহাস কৃষিক্ষেত্রে বিস্তৃত। এ দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রীতদাস কৃষকদের বাদ দিয়ে বিপ্লব বা রাজনীতি সার্থক হয় না। কৃষ্ণেন্দু আজীবন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, যেমন সে জাগিয়েছে ঝুমুরিয়ার কৃষকদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে। বীরেশ্বরের হত্যার প্রতিবাদে এবং প্রতিবাদীদের সম্মিলিত শক্তিকে একটা সংগ্রামী রূপ দিতে কৃষ্ণেন্দু বদ্ধপরিকর।

দেশভক্ত, এ্যাডভেঞ্চারাস নেতা কৃষ্ণেন্দু জনশ্রুতিতে, পল্লীমানসে মহাপুরুষ তুল্য। সে চাচ্ছে ঝুমুরিয়াবাসীদের সহযোগিতায় বীরেশ্বরের হত্যার প্রতিবাদে একটা শক্তিশালী সভার আয়োজন করতে। স্থানীয় কৃষক নেতা মোহনলালকে

পুলিশ গ্রেপ্তার করল নিরাপত্তার খাতিরে। ঐ সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুকেও। নানাবিধ অত্যাচার অরাজকতায় কৃষকরা এতদিন ম্রিয়মান হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু ও মোহনের গ্রেপ্তারের খবরে, 'সকলের মধ্যেই কম বেশি তীব্র প্রতিবাদ গুমরে উঠল। এর আগে চাষীদের আর এক প্রিয় ব্যক্তি কারাগারে নিমুনিয়ায় মারা গেছে। সে মৃত্যুর শোক তাদের বুকের মধ্যে রয়েছে। বীরেশ্বরের লড়াইকে ওরা এতকাল কতকটা 'ব্যক্তিগত কলহ' বলে মেনে নিয়েছিল। কৃষকদের অমন মানসিকতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানিক বলেছেন যে, বীরেশ্বরের হত্যাকারী ধনী হেরম্বকে এরা অত্যাচারী বলে জানে। কিন্তু এই অত্যাচারকে প্রকৃতির একটা অনিবার্য উৎপাতের মতো মেনে নেবার সংস্কারটা এদের পুরোপুরি কেটে ওঠেনি। আসলে দেশের লোকের সঙ্গে জমিদার, ধনী আর প্রতিপত্তিশালীদের প্রকৃত লড়াই হয়নি আজও। "ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রেরণাও যোগাননি নেতারা। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হেরম্বদের সঙ্গে সংগ্রামের ঐতিহ্য তো নেই, বরং আছে মুখ বুঁজে সব সয়ে যাবার অভ্যাস।' কিন্তু দুজন প্রিয় ব্যক্তির গ্রেপ্তারের খবরে গ্রামবাসীদের মধ্যে স্পষ্ট উত্তেজনা চরমে উঠল। বটতলার মাঠে 'গরম মানুষের ভিড় জমে উঠল। 'সমধর্মী মানুষের নিবিড় সান্নিধ্য তেজস্কর সঞ্জীবনীর কাজ করে"। বেপরোয়া হেরম্ব গ্রামবাসীদের অত্যাচার করে আরও ক্ষেপিয়ে তুলল। ফলে পাঁচনিশের থানা পুড়ল মরল দারোগা। এ সব ভয়ানক কাণ্ড সঙ্ঘটনের জন্য কোনো নেতা বা নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়নি। এইসব আপাত শান্তিপ্রিয় মানুষ গুলো আপসের মাধ্যমে আর শান্তিতে বাকী জীবন কাটাতে রাজি হল না। ঝুমুরিয়াবাসী 'বাংলার বাঘে' পরিণত হল। এক নিমেষে হাওয়ায় উড়ে গেল গ্রামবাসীর কাছে হেরম্বের তাত্ত্বিক খাতির, তাকে পুড়িয়ে মারা হল। হেরম্বের হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে মারা গেল রামপাল। যে রামপাল তার শ্বশুর খুন হবার পর থেকে গ্রামে এসে নিষ্ক্রিয় নিরুদ্যম হয়ে বসে ছিল। প্রতিশোধকামী, অসীম সাহসিকা স্ত্রী বন্তার তেজের আগুন তার প্রাণেও ছড়াল। বীরবিক্রমে বীরেশ্বরের নিজের শ্রেণীর লড়াইতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দেখা যাচ্ছে এ উপন্যাসে নেতা ও বীরপূজার বদ্ধমূল ধারণাটা শিথিল। বীরত্ব ও নেতৃত্ব আপেক্ষিক। বন্তা ও রামপাল যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীর এবং নেতা প্রয়োজনানুসারে সৃষ্টি হয়, তার জন্য কতকগুলি ছকে বাঁধা গুণাবলীর তালিকা প্রস্তুত করতে হয় না। নেতৃত্ব বাইরে থেকে আসে না, নেতৃত্ব সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। যথার্থ নেতৃত্ব অবশ্যই শ্রেণী-নেতৃত্ব, কৃষক ও শ্রমিকের নেতা ঐ শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত হবে, অথবা শ্রেণীচ্যুত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে।

বিদ্রোহী গ্রামবাসীদের দমন করতে জোরালো প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ

করা হল। কি হবে এই গ্রামবাসীর ভবিষ্যৎ? "ওরা কোন গাঁয়ে যাবে কে জানে?" —লেখক এর উত্তর দেননি। কিন্তু উপন্যাসে বিধৃত চেতনা থেকে এটা অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রামপাল ও তার সঙ্গীদের প্রাণদান উদ্দেশ্যহীন নয়। বৃথা যাবে না কৃষ্ণেন্দুর বিপ্লবী চেতনা-সন্ধানী মানসিকতা। কারণ এমন চেতনার বীজ বপন করাই আছে ঝুমুরিয়ায়। এ গ্রামের লোক পাঁচ-নিখের থানা পুড়িয়েছিল এর আগেও আর একবার। এ ছাড়া রস্তা ও রস্তার গর্ভে লুকানো সংগ্রামী রামপালের সন্তান রইল।...এদের অগ্নিবর্ষী চেতনার আগুনে আবার পুড়বে অত্যাচারের সম্ভাবনা।

তারাশঙ্করের পঞ্চগ্রামবাসী 'চারহাজার বৎসর ব্যাপী' মুখ বুঁজে যে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে এবং যে গ্রামের দৌলত শেখ নিঃসম্বল হবার দুঃখে বীরেশ্বরের মতো তেজী হওয়া সত্ত্বেও গলায় দড়ি দিয়েছে, তেমন ভারবাহী জীবের ঐতিহ্য মানিকের ঝুমুরিয়াবাসীদের জন্য নয়। 'দর্পণ'-এ রয়েছে ঘটনা-কালীন সময়ে সমগ্র দেশের যথাযথ অনতিরঞ্জিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছায়া। এ উপন্যাসে সার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে, কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং তার পাশে হীরেনের মতো উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অপরিত্যাজ্য স্বার্থপরতা ও স্বশ্রেণীতে প্রত্যাবর্তনের গোপন অথচ স্বাভাবিক ইচ্ছার অনবদ্য বিবরণ।

সাম্যবাদী মানিক তাঁর এ সময়ের লেখা ছোটগল্পেও তাঁর বিপ্লবী চেতনাকে রূপ দিয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর 'আজ-কাল-পরশুর গল্প' (১৯৪৬)-এর ভূমিকায় বলেছেন, "গল্পগুলি একটা বিশেষভাবে পরপর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, যাতে 'আজ-কাল-পরশুর গল্প' নামটির সঙ্গতি হয় তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম।" —এই বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আজকের চলতি গল্প হচ্ছে দুর্ভিক্ষ মহামারী কবলিত দারিদ্র্য ও অসহায়তা। কালকের গল্পগুলিকে চিহ্নিত করা যাবে অসন্তোষের ধূম্র রেখা দিয়ে। কিন্তু পরশুর গল্প একেবারে ভিন্ন চেতনাশ্রয়ী। মানিকের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পরশুর মানুষ খাঁটি ও নির্ভীক সংগ্রামী। পরশুর গল্পের বক্তব্য এ রকম—

"চাঁপার আর্ত চিৎকার শোনা যায় বেশী দূরে নয়। হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, 'চল যাই'।

আজিজ বলে, 'ওদের বন্দুক আছে'।

"লাঠির কাছে বন্দুক, বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।"[১৯]

মানিক তাঁর পরবর্তী গল্প-সঙ্কলন 'পরিস্থিতি'তে (১৯৪৬) বিপ্লবী চেতনার প্রয়োগ করেছেন অনেক বেশী। ক্রমেই তিনি অধিক বিপ্লবী ও সংগ্রামী করে

১৯॥ 'শত্রুমিত্র', 'আজকাল পরশুর গল্প', মা. গ্র., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

এঁকেছেন তাঁর চরিত্রদের। তাঁর চরিত্রগুলি ক্রমশঃই একে অন্যের চেয়ে সাহসী হয়ে উঠেছে। যেমন 'প্রাণ' গল্পটি একটি নিরুদ্যম, হতাশাগ্রস্ত মেয়ের ইতিহাস যার পক্ষে পুরাতন মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। মালতী তার স্বামী ও এককালের কৃষক অটলের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসেছে। উপবাসী এই রমণী একটি বাবুর নজরে পড়েছে। মালতীরা ঠিক করে যে, নিশুতি রাতে সে বাবুর ঘরে অভিসারে গিয়ে অটলের জন্য দরজাটা খুলে দেবে। তারপর "ক্ষুধার জ্বালা, আশ্রয়ের অভাব, শীত, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নোংরামি, মৃত্যু"র[২০] যে কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা এই দম্পতির জীবনে সঞ্চিত হয়েছিল তার থেকে সুনিশ্চিত মুক্তি। কিন্তু মালতী পারল না। তার নীতিবোধ তাকে বাবুর ঘরেই যেতে দিল না। অটলের চূড়ান্ত আদেশও সে মানতে পারল না। এরপর তাদের ভাবনা হয়ে দাঁড়াল, "...পরশু কি খাবে তাই ভাবে দু'জনে, পরশুর পরদিন"। তাদের ভাঙা চালার আশ্রয়ে ফিরে যেতে যেতে অত্যন্ত অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী অটল তার স্ত্রীকে বলছে, "কি জানিস, এ সব মোদের কাজ নয়কো"। এমন ধরনের নীতিবোধ নিয়ে মালতীরা উজ্জ্বল হতে পারেনি। এ গল্পের উত্তরপর্ব 'উপায়'।

'উপায়'[২১] গল্পের মল্লিকা 'প্রাণ' গল্পের মালতীর মতো একই গোত্রের নায়িকা। প্রমথ নামে একটি বাবু মল্লিকাকে সুনজরে দেখেছে, এমন কি নিয়েও গেছে নিজের বাগানবাড়ির অভ্যন্তরে। নিরিবিলিতে সুযোগ পেয়ে মল্লিকা হঠাৎ সোডার বোতলের আঘাতে প্রমথকে মেরে বসল, "...কিনে দেওয়া নতুন শাড়ির আঁচলটা পাকিয়ে প্রমথের গলায় ফাঁস বাঁধে—সোডার বোতলের মুখটা তাতে ঢুকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যতটা ক্ষমতায় কুলায় শক্ত করে এঁটে দেয় ফাঁসটা।"[২২] তারপর সে ঐ বাবুর পকেট থেকে টাকার তোড়া আর নিজের পরিত্যক্ত ময়লা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে আস্তানায় ফিরে এসে হাসে আর বলে, "ভাতের কষ্ট পামু না আর। পোলারে চাইরবেলা দুধ খাওয়ামু। ময়লা কাপড়খান পইরা আবার যামু ইষ্টিসানে, আবার ডাকাইতরা আমারে কিনতে আইবো"। মল্লিকা সতেজে ঘোষণা করে, "এইবার ছোরা নিয়া যামু লুকাইয়া।"[২৩] গ্রামত্যাগী, দুর্ভিক্ষ-কবলিত মালতী আর উদ্বাস্তু মল্লিকার গোত্র ও শ্রেণী এক। কিন্তু চেতনায় তারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর। আর এ চেতনা মানিকের আরোপিত।

২০॥ 'প্রাণ', 'পরিস্থিতি', মা. গ্র., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৫

২১॥ 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ', (১৯৬৩)।

২২॥ 'উপায়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।

২৩॥ ঐ, পৃ. ৫০২।

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র শ্রেণীর ভীরু মনোবৃত্তি মানিককে ব্যথিত করেছিল, "দু'শো বছরের পরাধীনতায় বাংলার মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে। গরীবগুলোকে কত বললাম—না খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মত রাস্তাঘাটে মরে পড়ে না থেকে তোরা একবার উঠে দাঁড়া। সরকারের তালাবদ্ধ শস্যের গুদামগুলো লুঠ করে একদিনও পেট পুরে খেয়ে বাঁচি —তারপর না হয় জেল খাটবি, —কিন্তু ব্যাটাদের কি সে সাহস আছে!"[২৪] তাঁর স্বচক্ষে দেখা অনাহারে ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত ঐ সব দুস্থ ভীরু মানসিকতার নিখুঁত প্রতিবেদন 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' ছোটগল্পটিতে রয়েছে। এ গল্পে তিনি অনাহারী দুর্বল মানুষদের উদ্যমহীনতার বিশ্লেষণ এ ভাবে করেছেন, "একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু-চার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু'দিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চর্য কি।"[২৫]

মার্কসবাদী মানিক দরিদ্র শ্রমজীবীদের এই ভীরু দাস মনোভাব কিন্তু খুব বেশী দিন সহ্য করতে পারেননি। তাঁর সৃষ্ট পরবর্তী চরিত্রগুলি এর প্রামাণ্য দলিল। তাঁর বক্তব্য এরপর দাঁড়াল যে, অত্যাচার, অন্যায়, নিষ্পেষণ এ সব দুঃসহ। এমন কি এমন দুঃশাসনীয় আচরণ যদি জনক-জননীর আপাত বাৎসল্যের মোড়কে ভরা থাকে তবু তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। মার খেয়ে কেন কাঁদবে অভুক্ত জননীর অভুক্ত সন্তানরা। লেখক নিজেই গল্পের নামকরণে সঙ্কেতময় প্রবোধ দান করেছেন 'আর না কান্না।' এ গল্পের দশ বছরের রোগা ক্ষীণকায় প্যাকাটির মতো মেয়েটি এবং তার তিনটি ভাই বোন তাদের মা অবলার নিষ্ঠুর শাসন সহ্য করে। অবলা নিজেই নিষ্ঠুর এক অক্ষমতার শিকার, একটি অপারগতার, যার নাম দারিদ্র্য। দরিদ্রদের বোধকরি একটি মাত্র দাবি মরণ পর্যন্ত থাকে। দাবিটা নিতান্তই জৈবিক। তা হচ্ছে পেটের অন্ন। দরিদ্রদের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই স্বল্প পরিমাণে খাদ্য নির্ধারিত। তাই ছোট মেয়েটি মায়ের কাছে স্বল্প পরিমাণ বরাদ্দ খাদ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। জননীর দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ, "ছোট ছোট চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।"[২৬] লেখক অতঃপর নব্যন্যায়নীতির

২৪॥ উদ্ধৃত: সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

২৫॥ 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'খতিয়ান', (১৯৪৭), মা. গ্র, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৪২।

২৬॥ 'আর না কান্না', 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩।

বাল্যশিক্ষা দিয়েছেন। বক্রোক্তিও করেছেন মাতৃত্বের, পিতৃত্বের সনাতন মূল ধারণাকে নিয়ে, "বাপ হওয়া কি সহজ কাজ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের!" সনাতন মুগ্ধবোধ মোটেই সঞ্চারিত হয়নি রোগা মেয়েটির মনে। জননীর মুখে তাদের মৃত্যুকামনা উচ্চারিত হতে দেখে প্রহৃতা ছোট বোনটিকে আগলিয়ে সে প্রতিবাদ করে, "মরবে তো নিজে নিজে মর না? আমাদের মারছ কেন?"[২৭] তার তীক্ষ্ণ কচি কণ্ঠের প্রতিবাদের অনুরণন থেকে যায় বহুক্ষণ, প্রতিধ্বনি ফেরে বিবেকের কাছে। প্রতিবাদ ছোট, কিন্তু যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন প্রতিবাদী দলের লোক মানিক। মানিক তাঁর ডায়েরিতে জননীর অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা লিখেছেন। "অনেক কষ্ট পেয়ে মৃত শিশু প্রসব করার পরে খরচ বাঁচার চিন্তায় স্ত্রীকে আশ্বস্ত হতে দেখে ব্যথিত বিস্ময়ে তিনি ভাবেন, "মানুষ সন্তানকে ভয় করছে? দশমাস গর্ভধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে, বাঁচা গেল? অভিশপ্ত সমাজ এমনি অস্বাভাবিক করেছে জীবন।"[২৮]

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'ভিটেমাটি নাটকে মানিক সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকের সংঘবদ্ধ আত্মরক্ষার একটা চিত্র দিয়েছেন। এই নাটকটিতে আছে বহু গ্রাম বিস্তৃত আত্মরক্ষার পরিকল্পনা এবং আপৎকালীন দুর্যোগ ঠেকানোর বাস্তব ব্যবস্থার কথা। জুনপাকিয়া গ্রামের নেতা ছোটলাল। সে গ্রামবাসীকে জড়ো করে যৌথ উদ্যমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার অনুরোধ জানিয়েছে। তাঁবু গেড়ে শত্রুপক্ষ আসছে গ্রামের দিকে। এলেই শুরু হবে ত্রাসের রাজত্ব। ভীত সন্ত্রস্ত নরনারী দলে দলে ভিটেমাটি ছেড়ে পালাচ্ছে। নারীর চরম অবমাননা এবং পোড়ামাটি নীতির একটি ভয়াবহ পরিবেশ এ নাটকে আছে। কিন্তু কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি কেন এবং কারা এমন শাস্তি দিতে আসছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পিত, আদর্শায়িত 'স্বদেশী সমাজে' একটা মঙ্গলময় শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের কথা বলেছেন। কিন্তু স্বদেশী সমাজের তেমন সামাজিক উন্নতির অবসর জুনপাকিয়ার মতো শত্রুর বেড়াজালে ঘেরাও হবার সন্ত্রস্ত মুহূর্তে থাকে কি? রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণকে আত্মশক্তি বর্ধিত করবার কথা বলেছেন। স্বদেশী সমাজ গড়বার যে স্বদেশী উদ্যম তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছে তার মধ্যে বিদেশী শাসকের প্রতি উদাসীন মনোভাব দেখা যায়। অথচ অর্থনৈতিক ভিত্তিবিহীন পরিকল্পনা আর স্বপ্নে কোনো প্রভেদ নেই।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সময়ে নিজেই সেটা উপলব্ধি করেছেন। পরাধীন দেশে, বিদেশী সরকারের শোষণ-ব্যবস্থার মধ্যে অমন বিচ্ছিন্ন স্বদেশী সমাজের কাঠামো গড়া কিভাবে সম্ভব হবে তা হয়তো তিনি ভেবে দেখেননি। আরও ভাবেননি এই অর্থনীতির নির্মম নিয়ন্ত্রক কারা।

জুনপাকিয়া গ্রাম স্বদেশী সমাজের অনেক পরের সময়ের, অনেক পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতা তাদের। গ্রামীণ শক্তির উৎস দেখাতে গিয়ে মানিক দেখিয়েছেন যে, এই শক্তি নিহিত রয়েছে পারস্পরিক সমঝোতা ও একতায় এবং এই একতা গড়ে ওঠে জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থকে কেন্দ্র করে। নাটকের নামকরণে বস্তুধর্মিতার স্বাক্ষর রয়েছে। স্বার্থ থেকে শ্রেণীবোধ জাগে এও একটা সত্য। সে জন্য এখানে আত্মশক্তির কথা নেই, রয়েছে আত্মরক্ষা নীতির কথা। সমাজের নেতা আর দরিদ্র কৃষকের স্বার্থবোধে স্বভাবতই দূরত্ব থাকবে। মানিক শ্রেণীস্বার্থকে ভিত্তি করে এই নাটকে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কালোবাজারী ও মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদ এবং সেই সঙ্গে দরিদ্রশ্রেণীর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই নাটকে প্রধান দুটি চরিত্রের করুণ পরিণতি আশাবাদী মানিকের সঠিক পরিচয় বহন করে না। অবশ্য তিনি আপস করার কথা কোথাও বলেননি। বিপরীত পক্ষের অত্যাচার ভয়াবহ এবং তারা প্রায় সর্বশক্তিময়। এর বিরুদ্ধে লড়াই বা আত্মরক্ষার কৌশল ব্যর্থ হলেও হতে পারে। কিন্তু সে জন্য তাঁর সৃষ্ট সংগ্রামী চরিত্ররা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকল না, আপসও করেনি। নকুড় আপস করেছে, তার শ্রেণীর ধর্মই আপস করা। কারণ সে কালোবাজারী মহাজন। আত্মরক্ষার ভিত্তিতে যে প্রতিবাদ মুখরিত সেটাই নাটকের আত্মা। মধুর গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া এবং পদ্মার লাঞ্ছনার দূরাগত বর্ণনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন সময়ে পুলিশী নির্যাতনের প্রত্যক্ষ চিত্র ফুটে উঠেছে।[২৯]

'চিহ্ন' (১৯৪৭) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে

২৯॥ ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসক বিভিন্ন স্থানে যে নির্যাতন চালিয়েছিল তার এক মর্মন্তুদ দলিল রমেশচন্দ্র মজুমদার তুলে দেখিয়েছেন, "Lt. Colonel Arthur Osborn, D. S. O., in his book. *Must England lose India*, quotes an official who told him : 'I give you my word that after some of my punitive police have been stationed in a village for a few days, the spirit of the tougest of the political agitators is broken.' Lt. Colonel Osborn enquired, 'How ?' 'Well, they

রসিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে। ছাত্র ও জনতার ওপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের একাত্ম প্রতিবাদ প্রকাশের এক অসামান্য প্রতিবেদন এ গ্রন্থে লভ্য। 'চিহ্ন'-এ ঘটনার গতি দ্রুত, চরিত্রের সংখ্যা অনেক। প্রখর ঘটনার প্রবাহে চরিত্র-মিছিলের স্রোত অবশ্য একাভিমুখী। মানিক বহুজনের হৃদয়ে ধৃত দেশপ্রীতি ও আদর্শকে নিরীক্ষণ করেছেন নিজের জীবনদর্শনের আলোকে। নিরীক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে রসিদ আলী দিবসে কলকাতার রাজপথ। 'চিহ্ন'-এর নায়ক, নায়িকা কে? ভূমিকায় মানিক বলেছেন যে, "বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই"।[৩০] এক বা একাধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়ক-নায়িকার নিভৃত, নিশ্চিত নিবাস ছিল বাংলা উপন্যাসে। পুরনো এই ছক ভেঙে অসংখ্য চরিত্রকে সমমর্যাদায় তুলে ধরেছেন মানিক। চরিত্রগুলি অবশ্যই ব্যক্তিত্ব প্রকাশক। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ উপন্যাসের পূর্ব ধারণানুযায়ী নয়। এই উপন্যাসে ব্যক্তিত্ব ঝলকিয়ে উঠে নির্বিবাদে মিশে গেছে সমষ্টিতে। একার কথা নয়, অনেকের বক্তব্য নিয়ে এ উপন্যাস।

---

will help themselves to everything. Within twenty-four hours there will not be a virgin or a four-anna piece left in that village." —*History of the Freedoom Movement in India*, Vol. iii (1963, p. 472)। লেখক এ বিষয়ে পরে মন্তব্য করেছেন, "In view of the authenticated accounts of the brutality perpetrated by the Government in 1932, one need not hesitate to accept the charges made against them in 1942. If we recall to our mind that Churchill, the Prime Minister of Britain, declared triumphantly in the House of Commons that "the distrubances were crushed with all the weight of the Government" and that large military reinforcements were sent to India. We can easily imagine that there was no limit to the barbarous atrocities perpetrated by the Government in those terrible months of 1942. Up to the beginning of October, 1942, the British "Used 112 battalions in putting down recent uprisings." *Ibid*, p. 660.

৩০॥ 'লেখকের কথা', 'চিহ্ন', মা. গ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৫।

তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'য় এমন একটা প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহুর কথা বাদ দিয়ে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এর নায়ক হয়ে দাঁড়াল দেবু। 'চিহ্ন' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের নাম বিপ্লবী চেতনা। এখানে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ-রহস্য উন্মোচিত করে দেখানো হয়েছে। পারিবারিক পরিচিতি আছে হেমন্ত, অক্ষয়, রসুল, রানী আরও অনেকের। পরিচিতি আছে দু'রকম আন্দোলনের। মানিকের একান্ত নিজস্ব স্টাইল এটি। জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি নিয়ে এসেছেন শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকদের আর একটি আন্দোলনের ধারাকে। "···এ দেশের রাজনীতি স্বাধীনতার সংগ্রাম, বংশানুক্রমিক সুদীর্ঘ সংগ্রাম" —এ হল 'চিহ্ন'র একজন চরিত্রের স্বীকারোক্তি। এই বংশানুক্রমিক প্রজ্বলিত আন্দোলনের একদিক রসিদ আলী দিবস। উক্ত দিবসে অহিংস জনতার ওপর গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের জমাট অসন্তোষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাদবদের গ্রামে ভাগচাষীদের আন্দোলনের অলিখিত ইতিহাসের প্রবল ধারা।

অহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করে 'চিহ্ন' লেখা হয়নি। বরং অহিংস হৃদয়, নির্বিকার চিত্ত কিভাবে গর্জন করে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্তই এখানে উপস্থিত। ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর সময় গণেশ মারা যায়। সে কুলি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণেশ একাগ্র উৎকণ্ঠায় জানতে চেয়েছে সংগ্রামী জনতা সব উপেক্ষা করে 'এগোবে না'? এই গণেশের বাবা হচ্ছে যাদব। ভাগচাষীরা যখন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছিল তখন যাদব ছিল একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। সেই আন্দোলন সম্বন্ধে তার কোনো উৎসাহ ছিল না। ভাগচাষীরা আন্দোলন করছিল বলেই বিপ্লবী চেতনার অধিকারী। যে জন্য ব্যারাকের লোক এসে যখন যাদবের যুবতী কন্যা রানীকে তুলে নিয়ে গেল তখন গ্রামবাসীরা ব্যারাকে আগুন দিয়ে ছিনিয়ে আনল রানীকে। এমন ঘটনা ঘটতে দেখে যাদবের মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। সে ভাবল, "চিরকাল সে নিজেকে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাংসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচনে মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়"। যাদব অঙ্গীকার করে, শহরে বউ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে এসে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সুতরাং এরপর যাদবের স্বার্থ শুধু মাত্র তার নিজ পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না, কৃষকদের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করে দেখতে শিখেছে। চাষীদের সংগ্রামে সে হবে একজন অংশীদার।

শহরের অধিবাসীরাও নিরীহ প্রতিবাদী জনতার ওপর গুলিবর্ষণের নৃশংসতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। জনসাধারণ লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের আপস-মুখী আকুল আবেদন কানেই তোলেনি। মিছিল এগোবেই, "সবাই এক হয়ে

গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দেশ দিতে হয়নি নেতাদের।" এমন 'প্রতিবাদের বিস্ফোরণ' তৈরী হয়েছে বহুযুগ-সঞ্চিত ক্ষোভ থেকে। মানিকের উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনে গ্রাম ও শহর অভিন্ন।

'চিহ্ন'র একটি চরিত্র সীতা, সে নিজে রাজনীতি সচেতন। সীতা পরাধীন দেশের রাজনীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেছিল, দেশের অমন অবস্থায় সকলের বুঝতে পারা উচিত যে, সব কিছুর মধ্যেই এ দেশে রাজনীতি জড়ানো। এ দেশে কারুর পক্ষে রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা অসম্ভব। যদি কেউ রাজনীতি এড়াতে চায় তবে তাকে তালা বন্ধ করে রাখা দরকার। কারণ তা না হলে চারদিকের ঘটনাবলী এসে সে ব্যক্তিকে সচেতন করে তুলবে। সামলিয়ে রাখতে চাইলেও আসলে রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলা যায় না (১৩১)। ঠিক এই কারণেই ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। "শিক্ষার্থীকেও আজ অন্তত ভাষায় ঘোষণা করতে হবে ···অন্যায়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদকে সে সমর্থন করে, সেটা রাজনীতির চর্চা হোক বা না হোক।" আন্দোলন থেকে যে সব ছাত্ররা গা-বাঁচিয়ে চলে তাদের সম্পর্কে সীতা মন্তব্য করেছে, এ সব ছাত্ররা আসলে দেশের কথা ভাবে না, নিজের কথা ভাবে। কি করে পাস করে আরামদায়ক পেশা নিয়ে থাকা যায় এটাই তাদের লক্ষ্য। তার মতে আন্দোলন-রত ছাত্ররাই আসলে "ভাল করে লেখাপড়ার দরকার বোঝে। তারাই জোর করে বলে ছাত্রদের, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা প্রথম কর্তব্য ছাত্রের, পরীক্ষায় পাস করাটা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। তাই বলে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ থাকবে না? তারা প্রকাশ করবে না তাদের রাজনৈতিক মতামত, সঙ্ঘবদ্ধ হবে না তাদের দাবি, তাদের ক্ষোভ, তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশকে জোরালো করে তুলতে" (৮৪)? এরপর লেখক প্রশ্ন করেছেন —সামলানো যাবে কি 'বিপদজনক আজাদী'র লড়াকু পুত্রদের জননী ও পিতাদের শোক? অত্যাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে? লেখকের প্রশ্নের উত্তর যেন দিয়েছে গণেশের বাবা যাদব। নিজের ছেলের অন্তিমকালীন প্রশ্নের উত্তরটাও সে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের প্রতিবাদে শোভাযাত্রী অসংখ্য ছেলের মুখে চিহ্নিত হতে দেখেছে, "ঠেকাতে পারেনি আমরা এগিয়েছি"।

মানিক তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও সভা সমিতির উপযোগিতার কথা বলেছেন। 'চিহ্ন'র সংগ্রামী জনতা ও মানুষের রূপায়ণ ঘটেছে এভাবে। তাঁর আগের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় 'চিহ্ন'র ভাষার ব্যবহার তীক্ষ্ণতর। তিনি নির্ভুল লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরবাসীকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার প্রস্তুতির চিত্র তুলে দেখিয়েছেন। লড়াইয়ের ধারা যেমন হোক না কেন লক্ষ্য একই।

তারাশঙ্কর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'ঝড় ও ঝরাপাতা'

(১৯৪৬)। রসিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতার বুকে যে উদ্দামতা, তেজের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল সেটাই 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র উপজীব্য। জীবিকা যুদ্ধে পরাজিত নিম্ন মধ্যবিত্ত গোপেন সরকারী অত্যাচারের নমুনা দেখে জ্বলে উঠল ক্রোধে, "এ যে কি ক্ষোভ—এ যে কি বুকের আগুন—সে অন্যে বুঝতে পারবে না। ভারতবর্ষীয়-বাঙালী—কলকাতার বাঙালী না হলে অন্যে বুঝতে পারবে না। গোপেনের সম অবস্থার লোক হলে আরও ভাল বুঝতে পারবে। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা কি তা গোপেন জানে না—কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতায় আর মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নেই। সেই স্বাধীনতার জন্য সে ক্ষেপে উঠেছে"।[৩১] অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির কথা গোপেন ভাবেনি। রসিদ আলী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল কোনো রাজনৈতিক পন্থার অনুসারী হয়ে নয়, সে গিয়েছিল আকস্মিক উন্মাদনার ঝোঁকে অর্থাৎ ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে। সরকারী অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় সে বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ। গোপেনের 'সম অবস্থা'র লোক না হলে ঐ জ্বালা হয়তো কেউ বুঝতে পারবে না—এ কথাটা লেখক নিজেই বলেছেন।

শিল্পী তারাশঙ্কর অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে জর্জরিত গোপেনের সন্তাপ ও মর্মপীড়া অনুভব করেছেন, দেখিয়েছেন অবদমিত জ্বালার প্রকাশ কিভাবে বৃহৎ বিক্ষোভ আন্দোলনের সুযোগে অগ্নিবর্ষী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তি তারাশঙ্কর তাঁর আদর্শানুযায়ী জ্বালার অমন বহিঃপ্রকাশ পছন্দ করেন না। তাঁর গোপেন তাই আবার দাসত্বে আত্মনিয়োগ করে মনের জ্বালা গোপন রেখেছে। তারা-শঙ্করের শ্রেণী অহিংস, সর্বোপরি তিনি নিজে গোপেনের সম অবস্থারও নন। তাই উত্তরকালে 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র পুনর্মুদ্রণ তিনি করেননি।[৩২] পিতৃ-হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে ও ব্যর্থতাবোধের মধ্যে 'ঝড় ও ঝরাপাতা' শেষ হয়েছে। কিন্তু মানিকের 'চিহ্ন'তে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই করার প্রস্তুতি এবং যে কোনো পেশা বা অবস্থানের হোক না কেন সবাইকেই তিনি সংগ্রামে শরিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে বলেছেন। যুক্তির সার্থক ও শিল্পসম্মত প্রয়োগ এ গ্রন্থে দেখানো হয়েছে।

চলমান, বর্তমান ঘটনাবলী মানিকের সাহিত্যের উপাদান হয়েছে অনেক-বার। ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলাদেশের চাষীদের তেভাগা আন্দোলনের পট-ভূমিকায় লেখা 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) সম্ভবত মানিকের সর্বাপেক্ষা

৩১॥ 'ঝড় ও ঝরাপাতা', তা. র., অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৪।

৩২॥ অনেক পরে ১৩৭০ বঙ্গাব্দে 'কালবৈশাখী' নামে তিনি 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র নাম বদলে একটি সংস্করণ বের করেন। রচনাবস্তুর কিছুটা অদলবদল 'কালবৈশাখী'তে হয়েছিল।

জনপ্রিয় রাজনৈতিক ছোটগল্প। রাজনীতি যে দেশে জীবন ও জীবিকার নিত্য সহচর সেখানে এই গুরুগম্ভীর বিধাতার অসঙ্গতিকে নিয়ে প্রহসন লেখার অবকাশ কম। তিনি বড় কমলাপুরের চাষীদের ঘটনা দেখে লিখেছেন, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নামে ব্যঙ্গাত্মক গল্প। মানিকের রচনা-তালিকায় গল্পটি বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর দেখা জীবন বাস্তব ও নিষ্ঠুর। সেই বাস্তব জীবনের সমস্যাবলীও নির্মম।

যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার জন্য মুখের দৃঢ়তা ও কাঠিন্যই তার অন্যতম রণবেশ। হাস্যরস এখানে বেমানান। মানিক তাই তার চরিত্রদের করতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ। তাঁর সৃষ্টির মূলগত পৌরুষ ট্র্যাজেডির নায়কের। ট্র্যাজেডির নায়করা যেমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় বটে, কিন্তু পরাজয়কে মেনে নেয় না, অপরাজেয়ই থেকে যায় মনোভাবে, মানিকের নায়করাও তেমনি পীড়িত হতে পারে কিন্তু পরাভূত নয়। তার নায়ক নায়িকারা লড়ছে প্রবানত রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সেটাই তাঁর মূল সামাজিক বাস্তবতা।

'জীয়ন্ত' (১৯৫০) উপন্যাসের অন্তর্গত ঘটনাকাল উপন্যাসের রচনাকালের পশ্চাদবর্তী। কিন্তু কেন লেখকের এমন পশ্চাদভূমি অবলোকন? এই শতাব্দীর শুরু থেকে যে সব রাজনৈতিক প্রয়াস চলেছিল সেই সব বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মূল্যায়ন সামগ্রিকভাবে করবার চেষ্টা করেছেন লেখক 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে বর্ণিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, একুশের অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াতেই যে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্ভব মানিক সে কথা বলেছেন। অসহযোগ এবং সন্ত্রাসবাদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার পাশে তিনি নিজস্ব রীতিতে তুলে ধরেছেন সংগ্রামী কৃষকশ্রেণীর ইতিহাস। যাদের লড়াইয়ের চিত্র তাঁর আগে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি।

'জীয়ন্ত' যেন উপন্যাসাকারে শানিত ইস্তাহার। এই গ্রন্থে রয়েছে উনিশশো পাঁচ সাল থেকে একেবারে তিরিশ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অপ্রতিম উপস্থাপনা। মূলত দুটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এর প্রধান চরিত্রগুলি বিকাশিত। একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, অপরটি শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রদূত কৃষক আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের সময়ের অগ্নিপুরুষ শ্যামল জানা। তিরিশ সালের দিকে সে হয়ে পড়েছে ক্ষীণপ্রাণ। আন্দামানের অনিয়ম ও অত্যাচারে সে ভগ্নস্বাস্থ্য মুমূর্ষু। গ্রামবাসী তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। অপরপক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের সুবিধাবাদী নেতা অনন্ত, বসন্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা জনসাধারণের চোখে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার পাত্র। বিকৃত স্বভাব ও শ্রেণীগত আত্মম্ভরিতার জন্য এবং অসহযোগের ব্যর্থতার কারণেও এরা এমন অশ্রদ্ধেয় —এরা এক ব্যর্থ আন্দোলনের উপজ।

"একুশ সালের উদ্গত আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, বোমারুদের অদ্ভুত দুঃসাহস

ছাড়া চারিদিকে নিষ্ক্রিয় ক্ষোভ, কল-কারখানায় ধর্মঘটের শ্রীবৃদ্ধিতে স্বাধীনতার ইঙ্গিত সবার চোখে পড়ছে না।"৩৩ লেখক 'সবার চোখে' না দেখে নিজ দৃষ্টি-পাতে অমন পর্যালোচনা করেছেন বিগত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যার জের বহু-কাল পর্যন্ত চলবে। কারণ মানুষ যথার্থ মুক্তির উপায় খুঁজছে। জ্ঞানদাস 'বিরাট এক অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থান'-এর (জী. ৯৭) —খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের তেজী কৃষক নেতা। আন্দোলন থেমে গেছে কিন্তু অত্যাচারিত জ্ঞানদাসের তেজ কমেনি। ভাইপো পাঁচু জ্ঞানদাসের যেন আধুনিক বিপ্লবী সংস্করণ। চেতনায় শুধু তেজী নয়, সে শিক্ষাজীবনে সন্ত্রাসবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। জ্ঞানদাসের অভিজ্ঞতা তাকে দিয়েছে বাস্তববোধ। পাঁচুর পুঁথিগত শিক্ষা, মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থী বন্ধুদের সঙ্গ ও প্রভাব তাকে কৃষকপুত্র হওয়া সত্ত্বেও করে তুলেছে খানিকটা ভাবাচ্ছন্ন। এমন ভাবালুতা অর্থহীন তাদের শ্রেণীর কাছে। সে জন্য জ্ঞানদাস খাজনা-বন্ধের আন্দোলনের সঙ্গে ইংরেজ-খেদানো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে মেলাতে পারে না। তার মত হচ্ছে যে, "কড়ায় গণ্ডায় মরণের মূল্য আদায় না করে ভাবের বশে প্রাণ দিতে তার সায় নেই। তার ছেলেমানুষ পাঁচু শহরের স্কুলে পড়ে হয়তো অন্য হিসাব শিখেছে। নলিনী দারোগাকে শুধু তেড়ে মারতে গিয়ে বিপদে পড়াটা হয়তো যথেষ্ট প্রতিশোধ, উচিত কাজ ভেবে নেবে?" জ্ঞানদাস ভদ্রলোকীয় শিক্ষার প্রভাবে পাচুকে ভাববিলাসী হতে দেখে সমালোচনা না করে পারে না। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে তাদের কারবার। সে জন্য জ্ঞানদাসের আক্ষেপ, "অনেক বিষয়ে অনেক কথা পাচু বলে যার উদ্দেশ্য এমনি শূন্য, মানে এমনি ফাঁকা" (জী. ১৭৫)। পাঁচুর ভাববাদী প্রতিবাদে তার কোনো সমর্থন নেই। তার মতে কৃষকদের আন্দোলন 'মরণের মূল্যে' সংঘটিত হয়। সে জন্য সেটা ভাববিলাস না হয়ে হবে তাদের বাঁচবার আন্দোলন।

পাঁচুর মতো রাগ করে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিলে অথবা ইংরেজ তাড়ালে জ্ঞানদাসের কি এসে যায়? শোষণের পাহাড়কে আগে ধূলিসাৎ করতে হবে। আবার লক্ষণীয় বিষয় এই যে, খাজনা-বন্ধের আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও সে আন্দোলনের প্রভাবে কৃষকদের "মেজাজ খানিক গরম হয়েছে সবার, তেজ বেড়েছে। দু'টা চড় চাপড় চুপচাপ সয়ে যাবে তো তিনটে চড় কোন মতে আর সইবে নি। মোদের চাষী-বাসীর মধ্যি গায়ের জ্বালা কম ছিল, শোক তাপে মরি তো গা জ্বলবে কিসে? জ্বালাটা বেড়েছে ইদানীং।" কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত তেজ এটা। শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠছে যে কৃষকরা এটা তারই নিদর্শন।

ফুকলি নামে এক কিশোরী বিধবাকে জমিদারের ছেলের লোভ থেকে

৩৩॥ 'জীয়ন্ত', মা. গ্র., সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

বাঁচাতে গিয়ে পাঁচু ভিটেছাড়া হল। পাঁচু তুকলিকে ভালোবাসে। তুকলিকে উপলক্ষ করে জমিদার ও তার বশংবদ আইন রক্ষাকারী পুলিশের অত্যাচার চরমে উঠল। পাঁচু, তুকলি ও জ্ঞানদাস ভিটে-ছাড়া হল। ব্যাপারটা আর ব্যক্তিগত থাকল না। কারণ ঐ পুলিশী নির্যাতন থেকে আঁটুলি গাঁয়ের কৃষকরা রেহাই পায়নি। পাঁচু, জ্ঞানদাস এবং তুকলি যে একত্র হল এটা আসলে একটা শক্তির সম্মিলন। কারণ এরা তিনজনাই 'তেজী'।

এই উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকে সূচনাকাল থেকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। শ্যামল জানা পুরনো সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিভূ। আন্দামানে জীবনীশক্তি শেষ করে শ্যামল জানা আঁটুলি গাঁয়ে ফিরে এসেছে। তার চরিত্রের পাশে আনা হয়েছে অসহযোগের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় যে সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপ চলেছিল সে দলের কালীনাথকে। অসুস্থ শ্যামল বই পড়াকেও সংগ্রামের অংশ বলে মনে করে। সে এখন মার্কসীয় ধারায় দেশের মুক্তির কথা ভাবে এবং সার্থক বিপ্লবের মূল কথাটা অনুসন্ধান করে ফেরে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে দেখেছে তাদের পন্থা সঠিক ছিল না। নব্য সন্ত্রাসবাদী কালীনাথের সঙ্গে তার মতভেদ রয়েছে। কালীনাথরা ইংরেজকে মেরে তাড়ানোই চরম লক্ষ্য মনে করে। কিন্তু শ্যামল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছে। দেখেছে তার নিজের দেশের বিচ্ছিন্ন বিপ্লবের ব্যর্থতা। কারণ সংগ্রামটা দরিদ্রদের জন্য হয়নি। গরীবদের একমাত্র সম্বল 'খাটুনি'। শ্যামল জানে মৃত্যুর কথাতে দরিদ্ররা যেন 'নির্ভয়', তেমনি আবার ক্ষেপে উঠলে ওদের ঠেকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য কর্ম। তবে শ্যামল শুধু একটি সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না, "ওদের ক্ষেপাবে কে, কিসে ক্ষেপবে" (১৮৪)। সে অর্থে কালীনাথদের সন্ত্রাসবাদী প্রয়াসও একেবারে ব্যর্থ নয়। কারণ কালীনাথরা পাঁচুদের উদ্বোধিত করতে পেরেছে।

'দর্পণ'-এর মতো 'জীয়ন্ত'-এর শেষাংশে লেখক জনগণের মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপক ও সঠিক ক্ষেত্র এবং প্রস্তুতিপর্ব দেখিয়েছেন। এ আন্দোলন হবে শ্রমজীবীর শ্রেণী আন্দোলন। কৃষকরা পারবে আন্দোলন করতে কিন্তু কৃষকদের আগে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। কৃষক ধনদাসের পুত্র পাঁচু। এটাই পাঁচুর একমাত্র পরিচয় নয়, সে আবার 'তেজী' জ্ঞানদাসের ভাইপো। পাঁচু নব্য সন্ত্রাসবাদী কালীনাথের শিষ্য হয়ে অর্জন করেছে বিপ্লবী চেতনা, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করবার মানসিক উদ্যম। পাঁচু আবার পুরনো সন্ত্রাসবাদী এবং পরে মার্কসবাদী শ্যামলেরও শিষ্য। এদের কাছ থেকে সে যা শিক্ষা পেয়েছে সে শিক্ষা ও বিপ্লবী চেতনা দিয়ে পাঁচু সংগ্রাম করবে। কারণ পরবর্তী জীবনে বিপ্লবী পাঁচু শুরু করবে তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্যামলের মতে যা হবে এ দেশের জনসাধারণের 'বেঁচে থাকার লড়াই', 'বাঁচার মতো বাঁচার সংগ্রাম।'

'জীয়ন্ত'র প্রধান চরিত্র পাকা। পাকার মাধ্যমে লেখক মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, দরিদ্ররা দারিদ্র্য সত্ত্বেও একটা সাবলীল সহজ জীবন যাপন করে। পাকা প্রথমে রাজনৈতিক কার্যকলাপের বাইরে ছিল। কিন্তু তার গায়েও রাজনীতির আঁচ লাগল। কারণ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের মধ্যে বসবাস করে রাজনীতির স্পর্শ এড়ানো সম্ভব নয়। শ্যামল জানার মতো পাকাও রূপকধর্মী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পাকা যদিও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি তবু সে ব্যতিক্রমধর্মী। তার বন্ধুদের দেখলে সে কথা উপলব্ধি করা যায়। সে হতে চায় সন্ত্রাসবাদী দলের সাহায্যকারী কিন্তু প্রচণ্ড অভিমানী। একবার সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য হতে যেয়ে দলের নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে আর কখনও সে সদস্য হবার জন্য আগ্রহ দেখায়নি। নিজের মধ্যবিত্ত ভাবালু পরিবেশ থেকে উদ্ধারকামী পাকা অনেকটা রোম্যান্টিক গোছের। অবশ্য তখনকার সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে তরুণরা ঝুঁকত কতকাংশে রোমান্সের খোঁজেই। উদ্দীপনাময় পাকা ইংরেজবিদ্বেষী। সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যকারী রূপে সন্দেহ করাতে তাকে পুলিশের হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হল। নির্যাতিত পাকা ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আশ্রয় নিল বাৎসল্য, স্নেহ আর অসম বিকৃত প্রেমের ফাঁদে। আর ঐ 'ন্যাকামীর ফাঁদে' আটকা পড়ে থাকে সে।[৩৪] অথচ অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে পাচু ভালোবাসে একটি কিশোরীকে।

৩৪ ॥ এ প্রসঙ্গে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটির কথা আসে। 'চতুষ্কোণ (১৯৪৮) অনেকের কাছে মনে হয়েছে 'অস্বস্তিকর'। কারণ এর ভেতর মার্কসবাদী আদর্শের কোনো প্রতিফলন নেই। 'চতুষ্কোণ'-এ নায়ক রাজকুমার বলছে, "আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল (মা. গ্র., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪৩) এর আগের রচনা 'আদায়ের ইতিহাস'-এর (১৯৪৭) ত্রিস্টুপ নতুন রাজনৈতিক ছক কাটার উদ্দীপনায় বিকার এবং হতাশা থেকে মুক্ত হয়েছে। 'চতুষ্কোণ'-এর পরবর্তী উপন্যাস 'জীয়ন্ত'র পাকা যেন ঐ রাজকুমারেরই রূপান্তরিত সংস্করণ। পাকাকে উজ্জ্বলতা দিয়েছিল তার রাজনৈতিক চেতনা। রাজনীতি বিচ্ছিন্ন পাকা মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতার ফাঁদে সহজেই ধরা পড়ে থাকে।

'বেকার', আত্মীয়স্বজনের এবং সকল প্রকার দায়িত্বমুক্ত, মধ্যবিত্ত, আকর্ষণীয়, একলা এক যুবক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বিকারগ্রস্ত সমাজে রাজকুমারে পরিণত হয়। এদেরই 'একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি, বলে মানিক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসটিতে রাজনীতিহীন স্থবির ফাঁপানো সমাজের ভয়াবহ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এর অরাজনৈতিকতা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের

সে বিধবা তুকলি। কিন্তু পাঁচুর ভালোবাসায় কোনো কালিমা নেই কারণ এ ভালোবাসা বিকৃত নয়। পাঁচু বরং ভালোবেসে এগিয়ে গিয়েছে, সংগ্রামী হয়েছে ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে। সে পাকার মতো আট্‌কা পড়ে যায়নি। পাকার পরস্ত্রীকে ভালোবাসা সংগ্রামহীন বিকারগ্রস্ত ভালোবাসা। মধ্যবিত্তের ভাবালু প্রণয় ওটা —ন্যাকামী ও স্বার্থপরতার গণ্ডী দিয়ে যা ঘেরা। মধ্যবিত্ত জীবনধারার মধ্যেও পাকা একটু ভিন্ন চরিত্রের প্রায়-যুবক। নিজ শ্রেণীর নানা রকম ন্যাকামী আর ভণ্ডামীকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু তার নিজেরও একটা সীমা আছে যার বাইরে সে যেতে পারে না, তার মানসিকতা ও শ্রেণীগত অবস্থান তাকে যেতে দেয় না।

অথচ পাঁচুরা এগিয়ে চলে। তার মাটি-ঘেঁষা জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শ্যামলের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর একটা চিন্তাধারার 'বিরোধ' রয়েছে। এমন বিরোধের উৎপত্তি উভয় শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য। শ্যামল শ্রেণী-দ্বন্দ্বে আস্থা রাখে সে জন্য সে বলেছে, "নতুন যুগের বামুন, ···ঋষি চাষীজাত থেকেই উঠে এসেছে কিশোর নচিকেতা পাঁচু।" সে জানে পাঁচুরা সংগ্রামে শরিক হবে। শ্যামল পাঁচুকে শিখিয়েছে তাদের সংগ্রামের আদর্শ। পাঁচু তার গুরুর নির্দেশ ঠিক মতো মেনে চলেছে। 'মলের মতো' 'কৃমিকীটের মতো' যারা আপস করে চলে তাদের মতো পাঁচু বাঁচতে চায় না। তুকলির প্রেম তার কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনের শুরুতে এনেছে সুষমা ও আনন্দ, দিয়েছে প্রেরণা। তুকলির জন্য জমিদার পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা জ্ঞানদাসের পছন্দ হচ্ছে না। কারণ সে জানে এটা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব না হয়ে যদি হত ফসল নিয়ে লড়াই তবে বহু কৃষক এটাকে গণ্য করত তাদের নিজস্ব অধিকারের লড়াই বলে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে সহজে কেউ মাথা গলাতে চায় না। পাঁচু অবশ্য নিজেও এই সত্যটা জানে। তবু জমিদারের ছেলে যে

অন্তঃসারশূন্যতা ও অস্বাভাবিকতাকেই প্রমাণ করে। জনদরদী, সংগ্রামী চেতনার বদলে রাজকুমার এক উন্মাদিনী ধনী কন্যার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে। অবশ্য এই ত্যাগকে মহাপুরুষোচিত কাজ বলেও চিহ্নিত করা হয়নি। অথচ এমন উপাদান ভাববাদী ঔপ-ন্যাসিকের হাতে ব্যবহৃত হত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। রাজকুমারের অপরাধবোধ এবং 'নিজের সম্বন্ধে তার একটা আতঙ্ক' এই চরিত্রটিকে মানিকের সৃষ্টি বলেই চিহ্নিত করে। আরও একটা বড় সত্য এখানে নেতিবাচক উপায়ে প্রমাণিত হয়, যা মানিকই তাঁর অন্যান্য রাজ-নৈতিক রচনার মাধ্যমে ইতিবাচক উপায়ে স্পষ্ট করে বলেছেন —তা হচ্ছে সুস্থ রাজনীতিই রাজকুমারদের প্রতিষেধক।

জোর করে তুকলিকে বিয়ে করবে এমন অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তুকলিকে সে ভালোবাসে, শ্যামলেরও এ ব্যাপারে সমর্থন আছে। অন্যায়কে কোনো অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কিন্তু একটা কথা তারা দু'জনে খুব ভালো করে জানে। সে হচ্ছে যে, "জগতে যত পাপ, যত অনাচার সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনবান শক্তিমানদের সৃষ্টি"। তাই যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটা তাদের দু'জনার মতে ধনবান শক্তিমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শামিল হয়।

পাকার সঙ্গে পাঁচুর পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। একই বয়স, একই উদ্দীপনা, একই পথে চলেছে যেন দু'জনে, কিন্তু আসলে গন্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। কারণ তারা দুটো ভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছে। এই তত্ত্ব মানিকের স্বাভাবিক দক্ষতায় 'জীয়ন্ত'-এ শিল্পরূপ পেয়েছে। তত্ত্ব তার তত্ত্বমূল্য না হারিয়ে শিল্পমূল্যের উপরিপাওনা পেয়ে আরও মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

সহিংস রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে এ কথা আমাদের জানা। এ সত্য উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। একুশ সালের পর হিন্দু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালী স্তিমিত প্রাণহীন হয়েছিল। লেখক বলেছেন, আঁটুলি গাঁ-র কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলনের পর বিপ্লবী চেতনার উত্তরাধিকারী হয়েছে। এর ফলে তারা নিজেরা বলেছে যে, "দুটো চড়চাপড় চুপচাপ সয়ে যাবে তো তিনটে চড় কোনমতে আর সইবে নি" (৯৭)। মধ্যবিত্ত তরুণ যুবকরা ব্যর্থ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসের পথে ঝুঁকেছিল আর শ্রমজীবী শ্রেণীর মানসিকতা তুলে ধরা হয়েছে আপাত-নির্জীব জ্ঞানদাসের মাধ্যমে। কৃষকদের মানসিকতার অন্তর্লীন ধারাটি হচ্ছে যে, এরপর আর অত্যাচার সহ্য করা হবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর মানিক 'জীয়ন্ত' লিখেছেন। উনিশশো ত্রিশ সাল পর্যন্ত পুরনো রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির পর্যালোচনা এই উপন্যাসটিতে করা হয়েছে। বিভিন্ন ধারার আন্দোলনগুলির আবেগ, শ্রেণীগত চরিত্র ও স্বার্থ তিনি উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে এই আন্দোলনগুলির উপস্থাপনার ফলে কৃষক আন্দোলন যে অনিবার্য তাঁর এমন বক্তব্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ভদ্রলোকীয় রাজনীতির মূল ধারাটি স্বভাবতই ভুল পথে চলেছিল। শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিহার্যতা এরপর থেকে তিনি প্রায় তাঁর সব উপন্যাসেই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যেন বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে বলেই এ গ্রন্থের ভাষা আগের উপন্যাসগুলির তুলনায় শাণিত ও তীক্ষ্ণ। উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো সংশয় নেই।

মানিকের প্রথম জীবনের উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬?) নায়ক শশী পেশায় ছিল চিকিৎসক। শশী অরাজনৈতিক চরিত্র, কারণ লেখকের

নিজেরও তখন কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারণা গড়ে ওঠেনি। নিজের গ্রামে বসবাস করতে গিয়ে শশী দেখল গ্রামের মানুষ অদৃশ্য শক্তির হাতে পুতুলের মতো নাচছে। পরবর্তী জীবনে ঐ শক্তিকে মানিক চিহ্নিত করেছেন অর্থনৈতিক শক্তি রূপে যাকে অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা বর্ণনা করেন কখনো অদৃষ্ট আবার কখনো রিপু হিসাবে। শশী তার ক্ষুদ্র গ্রামের লোকদের ভালোবাসে। গ্রামের লোকদের রোগও সে দেখেছে কিন্তু এই রোগের চিকিৎসা তার শাস্ত্রে লেখা নেই।

'অহিংসা'তেও মানিক দেখেছেন জটিল রোগাক্রান্ত মানুষদের। ঐ উপন্যাসে তিনি রোগমুক্তির জন্য একটি শাস্ত্রের সাহায্য নেবার কথা উল্লেখ করেছিলেন। শশীর মতো মানিকও মানুষকে ভালোবেসেছেন গভীরভাবে। তাদের রোগ-মুক্তির জন্য তিনি ভেবেছেন। মানুষের এই রোগকে প্রথম জীবনে তিনি ফ্রয়েডীয় ধারায় দেখেছেন। পরে দেখেছেন এ রোগের চিকিৎসা করা যায় বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের দ্বারা। 'পেশা'র (১৯৫১) নায়ক কেদার ডাক্তার হয়ে মানুষের নানা রকম ব্যাধি দেখতে পেল। সেই সঙ্গে দেখল, ব্যক্তিগত উদ্যমে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করা কত দুরূহ, কতখানি অসম্ভব।

'পেশা'তে চিকিৎসা বিদ্যা অনুন্নত দেশের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে মানবতা-বোধের একটা যোগ রয়েছে। অথচ দরিদ্র দেশের দরিদ্র চিকিৎসক প্রকৃত মানবতাবোধের অধিকারী হলে নিজেই দরিদ্র থেকে যায়। কেদার চিকিৎসক হয়েছে তার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ত্যাগ স্বীকারের ফলে কেন না অনুন্নত দেশে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন বিশেষ ব্যয়বহুল ব্যাপার। বহু প্রতিষ্ঠিত ও নামী চিকিৎসকদের জীবন যাপন দেখে কেদার একটা সত্য আবিষ্কার করল যে, ঐ চিকিৎসকদের সঙ্গে মানবতাবোধের বৈরী সম্পর্ক। এ ছাড়া সে দেখেছে এই উপমহাদেশে বিদ্যার ভাবগত দিকের সঙ্গে প্রযুক্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই। শিক্ষা এ দেশে বাস্তব-বিমুখ। কেন না এ দেশে শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির একটা উপায়। অথচ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্বিক মঙ্গলের জন্য।

রোগ, মৃত্যু নিয়ে মানিক তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মতো কোনো ভাবময় জগৎ সৃষ্টি করেননি। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোনো রহস্যময় অতীন্দ্রিয়লোকের কাহিনী তিনি রচনা করেননি। জীবনকে নিয়ে তাঁর কার-বার। অকাল মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার উদ্দেশে তিনি শিল্প রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সে জন্য তিনি তারাশঙ্করের মতো মৃত্যুকে ঘিরে কোনো মহিমাপূর্ণ তত্ত্বকথা প্রচার করেননি। এটা জানা কথা যে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিন্তু 'আরোগ্য নিকেতন'-এর প্রবীণ কবিরাজ —তারাশঙ্করের মতের সঙ্গে যার মতের মিল রয়েছে সে বলে, "যত সুখ, তত দুঃখ, এ সইতেই জন্ম"; আর এই বক্তব্যের

পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে সুখী লোকদের পরিণতি চিন্তা করে সুখ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ জাগবার কথা নয়। আসলে হয়েছেও তাই। মৃত্যু, রোগ, শোক যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, সে জন্য তারাশঙ্কর ঐ নিষ্ঠুর অনিবার্য রূঢ়তা এড়াবার জন্য অধ্যাত্মবাদীর ভূমিকা নিয়ে মৃত্যুকে নির্ভয়ে গ্রহণ করবার এবং জীবনকে ত্যাগ নিরত্তির পথে চালাবার উপদেশ দিয়েছেন। মৃত্যুকে তিনি রহস্যময়ী রূপে চিত্রিত করেছেন যা এই উপমহাদেশীয় অধ্যাত্ম চিন্তার ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এই ঐতিহ্য মৃত্যুকে জীবনের শত্রু হিসাবে দেখে না, দেখে জীবনের পরিপূরক হিসাবে। চিকিৎসা শাস্ত্রকে তারাশঙ্কর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মানবজীবনে সৌরপ্রভাবে আস্থাশীল বৃদ্ধ যাদবের স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণের শ্বাসরুদ্ধকর বিবরণটি। ঘটনাটি বাইরে থেকে রহস্যময়, কিন্তু তার ভেতরের কাঠামোটি অত্যন্ত স্থূল এবং নিষ্ঠুর। যাদব ধরা পড়েছিল তার নিজের কথার কঠিন বন্ধনে। তার ইচ্ছা-মৃত্যু যে আর কিছুই নয় বরং আফিমের বিষক্রিয়ায় সৃষ্ট সেটাও মানিক জানিয়ে দিয়েছেন নিরাভরণ কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে। তারাশঙ্কর হলে হয় জানতে দিতেন না, নয়তো সেই জানানোকে মোহময় করে তুলতেন বহু কথার কোলাহলের সাহায্যে।

মানিকের উপলব্ধি একেবারে নির্মোহ, স্বচ্ছ, বাস্তব যা এক কথায় বৈজ্ঞানিক। তিনি নিজেই বলেছেন, "উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ।" কারণ "সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।"[৩৫] মানিকের আগে বাংলা উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা প্রায় অনুপস্থিত। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' জীবন-পলাতক অধ্যাত্মবাদীর সান্ধ্য-ভাষায় রচিত, যা পড়লে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় চেতনা। লেখকের ভাববাদী ধারণার প্রতিফলনে উপন্যাসের চরিত্রগুলি গ্রাস করে পাঠকের বুদ্ধিকে, ফলে দৃষ্টির স্বচ্ছতা অবলুপ্ত হয়ে যেতে চায়। জীবনমশাই প্রাচীন ভারতীয় সামন্তবাদী জীবন-ধারণা —যা তারাশঙ্করের কাম্য তারই প্রতিভূ। অনুরূপ একটি চরিত্র 'পঞ্চ-গ্রাম'-এর ন্যায়রত্ন। এই চরিত্রগুলি শক্তিশালী লেখকের শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে এমন সজীব হয়ে উঠেছে যে, পাঠককে মোহমুক্ত হয়ে বিচার করতে বেগ পেতে হয়।

'পেশা' উপন্যাসের কেদার দরিদ্রের জন্য একক প্রয়াসী দাতব্য চিকিৎসায়

৩৫ ॥ 'উপন্যাসের ধারা', 'লেখকের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

আস্থা রাখে না। "ভিক্ষা দিয়ে কি একটা দেশের দারিদ্র্য ঘোচানো যায়?"[৩৬] কেদার এ কথা জানে এবং সে ঐ দরিদ্রের মঙ্গলের জন্য কিছু করতে চাচ্ছে। সে পথ খুঁজছে প্রাণপণে। সে দেখেছে, ভদ্রশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন-গুলির মতোই আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা জনসংযোগহীন। কেদার উপলব্ধি করল যে, দরিদ্ররা চিকিৎসক ডাকতে পারে না, কারণ তাদের পয়সা নেই। ফলে তাদের অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বল্প পয়সায় চিকিৎসার নামে প্রহসন। যেমন, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিকওয়ালা, টোট্কা, মাদুলি, ঝাঁড়ফুক। সাম্রাজ্যবাদ কি করে সামন্তবাদী কুসংস্কারকে পরিপুষ্ট করে সেই তত্ত্ব সম্পর্কে কেদারের ধারণা মানিকের নিজের মতো স্বচ্ছ। অনেকটা যেন তারাশঙ্করের মতোই —দরিদ্র ব্যক্তিরা মৃত্যুকে দেখে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি রূপে। পার্থক্য যেটা আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে তারাশঙ্কর মৃত্যুর মধ্যে মহিমা ও রহস্য আরোপ করেছেন এবং তা তাঁর অধ্যাত্মবাদী চরিত্রের কর্মফল হিসাবে গণ্য করেছেন। অথচ আমরা মানিকের এই উপন্যাসে দেখেছি গরীবদের বেলায় অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী সম্পূর্ণতই অক্ষমতা ও অপারগতা এবং সেটা অর্থনৈতিক। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ তারাশঙ্করের সহানুভূতি পায়নি। এর কারণ এই নয় যে, তিনি মৃত্যুভীতিকে ভীরুতার পর্যায়ে ফেলেছেন, কারণ হচ্ছে অমন ব্যক্তিরা তাঁর মতে জীবনের প্রতি আসক্ত। এ ধরনের আসক্তি তাঁর মতানুসারে ধার্মিক লোকদেরই একমাত্র থাকে না। এই আসক্তিকে তিনি চিত্রিত করেছেন একটা লোভ রূপে।

কেদার একটা কথা জানে যা 'আরোগ্য নিকেতন'-এর জীবনমশাই একে-বারে চিন্তার মধ্যেই আনেনি, এমনকি মানিকের শশীরও অজানা ছিল। শশীর মধ্যে মানুষের প্রতি যে আগ্রহ ও বিজ্ঞানের শিক্ষা আছে সে দুটি যদি পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারত তাহলে শশী হত মার্কসবাদী। এই পারস্পরিক প্রভাবের অভাবে একদিকে সে কবি অন্যদিকে চিকিৎসক। সে এই দুটি ধারাকে এক করতে পারেনি। তাই সে মার্কসবাদী নয়।[৩৭] মানিক নিজেও তখন মার্কসবাদী হননি। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবপ্রেম তখনও একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি। শশীর সীমাবদ্ধতার কারণ যে সাম্রাজ্য-বাদী শাসন তা সে না জানলেও পরে কেদার জেনেছে। কেদার উপলব্ধি করে, "বিলাত আমার দেশটাকে রেখে দিয়েছে টোট্কা আর মাদুলির চিকিৎসার স্তরে।" সে দেশকে 'প্রকৃত স্বাধীন' করতে চায়। যথার্থ স্বাধীনতা ছাড়া

চিকিৎসা বিদ্যা বিশেষ এক সুবিধাবাদী শ্রেণীর উপকারে আসে মাত্র। দরিদ্ররা এই চিকিৎসার সুযোগ পায় না, কেন না চিকিৎসা কেনাবেচার ব্যাপার। কেদার জানে, "মানুষের দারিদ্র্য তো ঘুচে যাবে না তার চিকিৎসার সেবাব্রতে!" আসলে দারিদ্র্য একটা মস্ত ব্যাধি এবং সে জন্যই ডাক্তারী পেশার মধ্যে গলদ ও অনিয়মের জন্য ডাক্তারদের দায়ী করা চলে না। কারণ "ওটাও দেশের লোককে অন্নবস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থার ফল" (৩৭৫)। কেদার তার ব্যক্তিগত সদিচ্ছা নিয়ে কি করবে? লেখক ভেবেছেন সমস্যার সমাধানের কথা। কেদারদের মতো সচেতন যুবকরা তাঁর মতে যতটা সম্ভব জ্ঞান সঞ্চয় করবে তা সে দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক। সর্বোপরি তাদের নিজেদের এতটা ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে যাতে অন্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এরা দেশবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হবে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ। সে জন্য "এত প্রভাব অর্জন করতে হবে যাতে করতে চাইলে সত্যি কিছু করার সাধ্য হয়" (৩৮০)।

'পেশা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও বক্তব্য তথাকথিত প্রাক্স্বাধীনতা কালের। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব স্বাধীনতার পরও থেকে গেছে। কেদার যে প্রভাবের কথা বলেছে সেটা অর্জন করা কেবলমাত্র তার পেশা দিয়ে সম্ভব নয়। তেমন প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা রাজনীতির মধ্যে দিয়েই অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু এই কথাটা মানিক তাঁর এই উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলেননি। আমরা দেখেছি যে, কেদার কোনো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নয়। হয়তো সে কথাটা ভেবে দেখেনি কিন্তু পাঠকের মনে স্বভাবতই কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। বিদেশে গিয়ে যখন সে বড় ডাক্তার হয়ে ফিরবে তখনও কি সে দরিদ্র লোকদের জন্য কাজ করতে পারবে? কারণ কেদার শহুরে মধ্যবিত্ত —শশীর মতো গ্রামের লোক নয়। সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিপীড়ন দেখেছে কিন্তু সেই শক্তিকে উৎপাটন করার কথা সরাসরি বলেনি। এ সব প্রশ্ন 'পেশা'য় অমীমাংসিত থেকে গেছে। কেদারের জীবনই অমীমাংসিত —লেখক তার জীবনের জন্য স্পষ্ট কোনো সমাধান দেননি। কারণ শ্রেণীচ্যুত হয়ে সাধারণ মানুষের দিকে আসবার প্রস্তুতি বা সাহস কেদারের নিজের চরিত্রে যেমন নেই, তেমনি নেই তার পারিবারিক পটভূমিতে।

৯ মানিকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১)। তিনি বইটি উৎসর্গ করেছেন জনসাধারণকে। কারণ জনসাধারণই তাঁর কাছে মানবতার প্রতীক। একজন মধ্যবিত্ত গৃহিণী মণিমালার উপলব্ধির মাধ্যমে লেখক তৎকালীন রাজনৈতিক কার্যাবলীর মূল্য নিরূপণ করেছেন। মণিমালার চেতনার ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সুবিন্যস্ত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অভিজ্ঞতাসমূহ সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে মণিমালা হয়ে উঠেছে খাঁটি জীবনবাদী এবং

স্বচ্ছ বাস্তববোধের উত্তরাধিকারী। সে যে এমন হয়ে উঠতে পেরেছে এর একটা কারণ মেয়েদের মধ্যে শ্রেণী-চৈতন্য সঞ্চারিত হওয়াটা সহজ, "শ্রেণী সমাজে মধ্যবিত্তের ভূমিকা একদিকে যেমন শোষকের, অন্যদিকে তেমনি শোষিতের। আবার এই শোষিতদের মধ্যেও আছে আর এক দল শোষিত—তারা হল পুরুষশাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত নারী, বিশেষত ঘরের গৃহিণী। একদিকে যেমন পুরুষ-সমাজের আইডিওলজিকে অন্তঃস্থ ক'রে শোষণকে তারা কায়েমি ক'রে রাখে, অন্যদিকে তেমনি দু'দিক থেকে শোষিত বলে শ্রেণীসমাজের চেতনা তাদের মধ্যে আসতে পারে খুব তীব্রভাবে।"[৩৮]

শুরুতে মণিমালা ছিল নিতান্ত সাধারণ, অতিশয় স্বার্থপর, অগভীর, ভাবালু এবং আত্মকেন্দ্রিক। তার কাছে আত্মীয়তার মানে শুধু স্বার্থ উদ্ধার করা। সে জন্য একান্নবর্তী শ্বশুরবাড়ি থেকে সে আলাদা হয়ে গেছে স্বামী সন্তান নিয়ে। জীবন তারা কাটাচ্ছিল স্বাধীনভাবেই। কিন্তু তেমন স্বাধীনতা ভোগ করার কাল বেশীক্ষণ রইল না। সাতচল্লিশ সালের তথাকথিত স্বাধীনতালাভের আগে বাংলা এবং বিহারে নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুঠতরাজের হাঙ্গামায় ঘরে ঘরে অশান্তি যেন বন্যার জলের মতো জোর করে ঢুকে পড়ল। মণির সাজানো সংসারও বাদ পড়ল না।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও সেই মানসিকতার উৎস কি তা 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এর পাশাপাশি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যথার্থ স্বাধীনতার স্বরূপ। মণিমালা একটি চরিত্র কিন্তু উপন্যাসে এই চরিত্রটি তার নিজস্বতা রক্ষা করেও প্রতীকের রূপ ধারণ করেছে। সে যেন একটা উপলব্ধির প্রতীক। সেই সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নারীর যথার্থ স্বাধীনতার পথটিও আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, এই উপন্যাস লেখার অনেক আগে তিনি এই মার্কসীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, শ্রেণীসমূহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে একটা 'বিরাট সমাজের আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।' কেমন করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন তার বিবরণও তিনি সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, "ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদে'র গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যায় শূন্যকে মনোরম

৩৮॥ মালিনী ভট্টাচার্য, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অপ্রকাশিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতিসুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবন যুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত ; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল…।"[৩৯]

মানিক চলতি রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির শুধু সমালোচনাই করেননি সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর ধারণায় যেটি সঠিক পথ সেটিও। সে পথ হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের পথ। এ রকম একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার জন্যই মানিকের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচকও হয়ে উঠল। মানসিকতায় শুধু তিনি জনসাধারণের সন্নিকটবর্তী ছিলেন না, লোকালয়ে, মিছিলে, সভায়, সংগঠনে তিনি সাধারণের কাছের মানুষও ছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে এবং অন্য লেখকদের স্মৃতিকথায় মানিকের এই পরিচয় জানা যায়। তিনি বিচ্ছিন্ন কোনো বীরকে দেখেননি, শ্রেণী-সচেতন জনগোষ্ঠীকে একত্র করে দেখেছেন এবং সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে মুক্তির উপায় আছে বলে মনে করেছেন। 'স্বাধীনতার স্বাদ' গ্রন্থের ঘটনাবলীকে মানিক বিচার করেছেন সাময়িকতার মানদণ্ডে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। ঘটনার গ্রন্থি খুলতে খুলতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সম্বলিত নির্দেশও দিচ্ছেন সঠিক পথটির। এই উপমহাদেশের রোম্যান্টিক কাব্য-উপন্যাস পাঠকের অভ্যস্ত ভিজে স্যাঁতসেতে হৃদয়ে এ ধরনের রূঢ় বাস্তব উপন্যাসের আবেদন কম হওয়াটাই স্বাভাবিক তাই তিনি সর্বজনপ্রিয় হতে পারেননি।

সাতচল্লিশের দাঙ্গায় কলকতা হয়েছিল 'থ্রিলারের' উপাদান। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির স্রষ্টিকর্তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং তার দুই আদুরে পুত্র কংগ্রেস ও লীগ সরকার। "দুশো বছরের গদি আপসে ছেড়ে দিতে না চেয়ে ইংরেজের সাধ্য ছিল না এ রকম দাঙ্গা বাধায়।"[৪০] আপস করছে কারা? যাদের স্বার্থ রক্ষা হবে শুধু তারাই। ঔপন্যাসিকের মতে রাজনৈতিক লড়াই যে দেশে 'ধর্মের লড়াই' হয়ে ওঠে সে দেশের ভাগ্যবিড়ম্বনা স্থায়ী হতে বাধ্য। তাহলে এই পরাধীনতা কি ঘুচবে না? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লেখক ভূমিকা নিয়েছেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার।

এ জন্য তিনি প্রথমে পরাধীনতার গ্রন্থিগুলিকে নানাভাবে দেখিয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী সরকার সৃষ্ট 'ভাঁওতা' 'জীবনের রূপান্তর' ঠেকিয়ে রেখেছে।

৩৯॥ গ্রন্থ পরিচয়, মা. গ্র., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৪।
৪০॥ 'স্বাধীনতার স্বাদ', মা. গ্র., সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত লেখক তুলে ধরেছেন সুশীলের মাধ্যমে। সুশীল মণির স্বামী, সে একটি নামী সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। সুশীল একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রৈণ ছিল। সে সময়টুকু হচ্ছে সঙ্কীর্ণ আয়েশী স্বাধীনতার ক্ষণ, মণি তাকে যে সময়টুকু গণ্ডীঘেরা আরামের জীবনে আগলিয়ে রেখেছিল। দু'জনের ইচ্ছায় সে সময়ে কোনো বিরোধ ছিল না। বহুদায়গ্রস্ত একান্নবর্তী পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেদের রোজগার নিজেরা ভোগ করবে এই ছিল মণিদের শ্বশুরবাড়ি থেকে ভিন্ন হয়ে যাবার মূল অনুপ্রেরণা। কিন্তু লেখক বলেছেন, সুখ-দুঃখ আর ঘরোয়া নেই, "বাইরের বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনো-জলের মতো জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের

স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন থাকার ঐ উদ্দেশ্যটি বুর্জোয়া সুলভ। বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এক ধরনের স্বার্থপরতা ও বৃহৎ জনজীবন বিচ্ছিন্নতা যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুশীলদের চেতনা সেই বুর্জোয়া চেতনারই প্রতিভূ। সামন্তবাদী একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে সে বুর্জোয়া দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে বুর্জোয়া দাম্পতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কেন না সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকদের অত্যাচারে সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লভ্য নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে থাকে শাসকদের প্ররোচনায় এবং সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মণিমালাদের জীবনে সামাজিক নিরাপত্তা তো দূরের কথা, জীবনের নিরাপত্তাই সংশয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

নিরাপত্তার খাতিরে মণিমালারা বহুজনাকীর্ণ শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এল। সুশীল প্রবেশ করল একেবারে জোয়ারের মধ্যে। এই জোয়ারের টানে মণিমালার অনুভূতি মুহুর্মুহু বদলাচ্ছে, পাচমিশালী মধ্যবিত্ত জীবনের যে দ্রুত খরগতি জনজীবনমুখী সেই জীবনের কাছে মণি পাঠ নিচ্ছে। সে যত জ্ঞান লাভ করছে ততই দূরে সরে যাচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে। দেখা যাচ্ছে মণিমালারা সুযোগ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে তড়িৎগতিতে বদলে যায় কিন্তু সুশীলদের বদলাতে এত সময় লাগে কেন? একটি কারণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মণিদের মতো মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা নিজেরা শোষিত শ্রেণী, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে মণিদের সামান্য পুঁথিগত শিক্ষা। এ শিক্ষার ভিত্তি এমন দৃঢ় হয়নি যে জীবনের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে বাধা দেবে। উচ্চশিক্ষা সাম্রাজ্যবাদীদের একটি লোভনীয় টোপ। এ মরীচিকা শিক্ষিত ব্যক্তিদের জীবনকে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস দেয় অন্যদিকে তেমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। এই জন্যই উচ্চশিক্ষিত সুশীলরা শ্রেণীচ্যুত না হয়ে বরং উঁচুশ্রেণীতে উঠতে চেয়েছে। টাকা বাড়াবার নানা ফন্দি ফিকিরে মেতে উঠেছে এবং সর্বস্বান্তও হয়েছে। তাকে ঠকিয়েছে তার সহপাঠী

যতীন। লেখক এটাও বলেছেন, যতীনও একদিন সর্বস্ব খোয়াবে মাড়ওয়ারী পার্টনারের কাছে। কেন না সাম্রাজ্যবাদী চক্রের অর্থনৈতিক কলাকৌশল এগুলি। স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের কোনো পথ নেই এ চক্রান্তে। চোরা-গোপ্তা ব্যবসার গোড়া কাটা যায় যদি চোরাকারবারীদের রক্ষাকর্তাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়।

সুশীলের মতো নির্বিরোধ মানুষের মনে পরাধীনতার জ্বালার প্রকাশ বিচিত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী। চোরাকারবারী বন্ধুর কাছে সুশীল গিয়েছে চাল সংগ্রহ করার জন্যে। সেই বাড়ির সামনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষা করে সে অপমানিত বোধ করে। তার অপমানিত মনের জ্বালা লেখক সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। সরকারী কলেজের অধ্যাপক সুশীল ভাবছে, "শেলীর কবিতা যেভাবে পড়িয়ে আসছে এগার বছর, তার চেয়ে একটু অন্যভাবে পড়ানো যায় না এবার? ইংরেজ কবি ছাড়া জগতে কি আর কবি জন্মায়নি? ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক বলে কি তাকে শুধু ইংরেজ কবিদের কাব্য আর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করেই জীবন কাটাতে হবে?" চোরাকারবারীর কাছে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকা সুশীল ক্ষোভে জ্বলে ওঠে, "কবিতা পড়াবার ব্যাপারেও এগার বছর একটানা দাসত্ব করার কথা" —এই ব্যাপারটি ভেবে।

সুশীল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কিন্তু সে ছিল সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ। বিদেশী শাসকদের সাংস্কৃতিক উচ্চতরবর্তিতার অচেতন প্রচারক সুশীলও জাগতিক ঘটনার দৃঢ় আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে ওঠে। সুশীলের ঐ ক্ষেদোক্তির মধ্য দিয়ে মানিক যে সত্যকে তুলে ধরেছেন সেটা হচ্ছে ঔপ-নিবেশিক শিক্ষার অর্থহীন দিকটি। কারণ সুশীলের পড়ানো ইংরেজী কবিতার রোমান্টিক জগতের সঙ্গে তার নিজের জীবনের বাস্তব সত্যের কোনোপ্রকার যোগ নেই। কোনো যোগ স্থাপন করবার কথাও সে ভাবে না, "মন খারাপ হলেই ক্ষোভে দুঃখে মনের কাঁটা-বনে গড়িয়ে গড়িয়ে এইখানে এসে ঠেকে সুশীল— ইংরেজ কবিদের চিবিয়ে চিবিয়ে নিজে সে আখের ছোবড়ার মত কাঠ-কাঠ হয়ে গেছে। ছেলেরা কত রস পায়, তার শুধু দাঁতের কনকনানি।" আমরা জানি ছাত্ররাও যখন সুশীলের মতো হবে তখন আর রস পাবে না। সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এখানেই।

মণিমালা আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মতো নয়। বাংলা উপন্যাসের পরীক্ষাশালায় মুক্তিকামী নারীরা কুমারী, সধবা কিংবা বিধবা এবং নিঃসন্তান। কিন্তু মণি মা। সন্তানদের সচেতন মা। স্বামীর সঙ্গ ছিন্ন করার পথে বড় বাধা হচ্ছে সন্তানদের প্রতি মমতা। নারীমুক্তির প্রতীক মণি অন্যধারে রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রয়াসী বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তেরও। স্বার্থসিদ্ধির জন্য একদা পরিত্যক্ত শ্বশুরবাড়িতেই মণিকে স্বামীসন্তানসহ ফিরে আসতে হল।

এখানে আসবার পর সে দেখল তার ঐ আগের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের না ছিল কোনো মহৎ উদ্দেশ্য, না কোনো আনন্দ। ঐ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ভোগ করার ফলে 'জীবনের পরিধি' ছোট হয়ে যেতে বাধ্য। তখন সে বুঝেছে 'মিলেমিশে কষ্ট করাও সুখ'। মণি যেন এ দেশের এতদিনকার চলে আসা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক। সে যেমন কতকগুলি ভিত্তিহীন অভিমান ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধের কারণে সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারেনি, তেমনি পারেনি এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন উপলক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে। মাঝখান দিয়ে ফাঁক থেকে যাচ্ছে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে, যে ফাঁকের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা আদায়ে ফাঁকির সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যবিত্ত বলেই সে পরিবর্তনে 'হোঁচট' খায়, পরিবর্তনে তার ভয়।

মানিক খাঁটি মার্কসবাদীদের মতোই অসাম্প্রদায়িক। তাঁর লেখায় হিন্দু মুসলমান বলে কোনো আলাদা শ্রেণী নেই। তাঁর কাছে শ্রেণী দুটো, শোষিত আর শোষক।[৪১] একেবারে প্রথম দিকের রচনা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তাঁর এমন ধারণার প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। জেলেপাড়ার নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং অমুসলমান অধিবাসীদের ধর্ম কি, সে প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য।"[৪২]

'স্বাধীনতার স্বাদ'-এ তিনি দেখাতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষই সবার অধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিরোধী কারণ তারা অসাম্প্রদায়িক। বরং মধ্যবিত্তের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবোধ রয়েছে। এ উপন্যাসের মার্কসবাদী প্রণব মণিমালাকে বুঝিয়েছে যে, দরিদ্রশ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক যে দাঙ্গাহাঙ্গামা করছে এর কারণ ওদের দাঙ্গায় প্রলোভন দেখিয়ে নামানো হয়েছে। ভাত কাপড়ের মিথ্যা ভরসা না দিলে এরা দাঙ্গায় নামতে চাইত না। মধ্যবিত্ত নেতাদের মিথ্যা আশ্বাসে ভুলে ওরা হত্যাযজ্ঞে নেমে পড়েছে। প্রণব জানে, বাস্তব চেতনাই শ্রমজীবীদের একদিন জানিয়ে দেবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। বাস্তব বুদ্ধি জানিয়ে দেবে যে তাদের শত্রু হিন্দু বা মুসলমান নয়। তাদের মতো শ্রমজীবী শ্রেণীর মূল শত্রু হচ্ছে পরশ্রমজীবী শ্রেণী। তখন ওরা নিশ্চিতভাবে জানবে যে ওদের "বাঁচার পথের কাঁটার চাষটা শুধু ওপর তলায় হয়" (৪৪৯)। প্রণব তাই মণিমালাকে বলছে, "আশা ভরসা রাখো নীচের তলায়" কারণ

৪১ ॥ 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এর প্রধান একটি চরিত্র প্রণব মানিকের বক্তব্যই প্রকাশ করে বলেছে, "হিন্দু বা মুসলমান বলে কোন শ্রেণী নেই কিনা, তাই মিছামিছি শ্রেণীর কথা বাড়াই নি" (৪৪৮)।

৪২ ॥ 'পদ্মানদীর মাঝি', মা. গ্র., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২।

সাধারণ শ্রেণী সর্বাধিক বাস্তববাদী। এই বাস্তববাদীতাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখে এবং এই বোধই শ্রেণীশত্রু চেনাতে সাহায্য করে। ভদ্রশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামগুলি জনসাধারণের পক্ষে একান্তই বিভ্রান্তিকর। উপন্যাসের আর একটি বিপ্লবী চরিত্র দৈনিক খবরের কাগজের সহ-সম্পাদক গিরীন মণিমালার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভদ্রশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির স্বরূপ তুলে ধরেছে, "সাধারণ লোকের কাছে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্পা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন চোখ রাখে কংগ্রেস আর লীগের দিকে, কার দিকে কোন হাত বাড়ায়, কি খেলা খেলে, কি চাল চালে—এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লীগ আমার—এ জগতে কে একান্তভাবে কার জানা যেন এতই সহজ" (৪৫৭)। মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব ও বিদেশী শাসকের চালে জনসাধারণ ভদ্রশ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থপরতা সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারছে না। ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে নামলে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থ কি রক্ষিত হবে? কারণ ভদ্রশ্রেণী এ পর্যন্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থের জন্য যথার্থ সংগ্রাম করেনি। গিরীন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয় কংগ্রেস ও লীগের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক উন্মোচিত করে দেখিয়েছে। কংগ্রেস ও লীগকে ইংরেজ নিজেই গড়ে উঠতে দিয়েছে। কংগ্রেস-লীগ ইংরেজের বিপক্ষ মাত্র, শত্রুপক্ষ নয়, "ইংরেজ এদেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, কখনো শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠেছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরাজের ভরসা" (৪৫৭)। উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সঙ্গে ইংরেজের আপসকামী মনোভাব গিরীন স্পষ্ট করেই দেখিয়েছে। ভারতবাসীর যে সহনশীল ত্যাগধর্মের কথায় তারাশঙ্কর প্রশংসায় মুখর, সে ত্যাগধর্মকে মানিক ভীরু মূঢ়তা রূপে অভিহিত করেছেন। এ গ্রন্থের আর একজন বিপ্লবী গোকুল বলেছে, "আমাদের ত্যাগ ধর্ম দু'শো বছর বৃটিশের ভোগ ধর্মের রসদ জুগিয়েছে" (৫৬৫)।

প্রণবদের পাড়ায় তাদের মতো কর্মীদের প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত দাঙ্গা-বিরোধী শোভাযাত্রা বের হওয়াতে সাধারণ শ্রেণীর মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হয়ে গেল। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দরিদ্র মানুষ যাচাই করে নিল যে তাদের মূল শত্রু কারা। তাদের বঞ্চনার জন্য যারা দায়ী তাদের তারা চিনতে শুরু করেছে। আর একদিন বঞ্চিত হতে হতে খাঁটি স্বাধীনতার লড়াই কি তা তারা জেনে নেবে

উনিশশো সাতচল্লিশে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, লেখক যাকে অভিহিত করেছেন 'আপসিক স্বাধীনতা', 'মেকি স্বাধীনতা' বলে। তারাশঙ্কর অবশ্য দেশের এমন স্বাধীনতাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখে প্রণাম জানিয়েছেন সত্য

স্বাধীন-হওয়া দেশকে। তিনি কংগ্রেসকেই ইংরেজের শত্রু বলে মনে করেছেন, বিশ্বাস করেছেন জনসাধারণের বন্ধু হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। এই সত্য অবজ্ঞাত রয়ে গেছে তাঁর কাছে যে, জনসাধারণই আসলে উভয়েরই শত্রু —ইংরেজেরও বটে কংগ্রেসেরও বটে। বিপরীতপক্ষে মানিক দেখিয়েছেন, ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়েই জনসাধারণের শত্রু। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।'

সত্যকার স্বাধীনতার স্বাদ কেমন করে পাওয়া যাবে? বিপ্লবী চেতনায় ক্রমশ উত্তীর্ণ মণি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রশ্নটির উত্তর পাবার চেষ্টা করে। লেখক মণির উপলব্ধি দিয়েই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। মণি দেখল, স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যায় জনজীবনের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মিশে যাওয়ার মধ্যে—দশজনের সঙ্গে শ্রেণীচ্যুত ঐক্যে, অর্থনৈতিক মুক্তিতে আর 'সবার সামনে আদর্শ তুলে ধরায়' রয়েছে 'খাঁটি স্বাধীনতার কামনা'। এ ছাড়াও রয়েছে শ্রদ্ধা, স্নেহ আর উদারতা দিয়ে বিরোধীজনকে পক্ষে আনা। যে শ্রদ্ধা স্নেহ, আর মমতার বোধ 'প্রতিবিম্ব'-এর তারকের মধ্যে ছিল না। অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে স্বাধীনতার অঙ্গ আর শোষণমুক্ত জীবন হচ্ছে স্বাধীনতা। একদিক দিয়ে মণিমালা গোর্কীর 'মা'র সঙ্গে তুলনীয়। গোর্কীর মা আর মণি উভয়েরই একটা চেতনাগত মিল বর্তমান। এই চেতনা তারা সঞ্চয় করেছে বিপ্লবী জীবনযাত্রার শরিক হবার জন্য নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

মানিক থেমে থাকেননি, ধরা পড়েননি আপসধর্মিতার ফাঁদে। যেভাবে চললে বঞ্চিত জনসাধারণের এবং স্বার্থপর মধ্যবিত্তের মঙ্গল হবে সে সব ভাবনা ও কার্যসূচী তিনি যুক্তি সহকারে, ধৈর্যের সঙ্গে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বড় একটি অভিযোগ তিনি তাঁর সৃষ্টির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পগত দিকটি উপেক্ষা করে প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছেন। মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "যাই বলো বাস্তবের রাজত্ব ছেড়ে পিছু হটে কল্পনার ক্ষেত্রে চলে গিয়ে পিরিয়ডের রোমান্টিক কাহিনীতে কৃতিত্ব থাকতে পারে গবেষকদের, কিন্তু তাতে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যাবে না। মালমসলা যোগাড় করে ঠিকাদারের বাড়ি তৈরির মতো ইঁটের স্তূপ হবে। তার মধ্যে শিল্প নৈপুণ্য কোথায়! আশেপাশের মানুষকে ছেড়ে দিয়ে যাদের কখনো দেখিনি শুনিনি তাদের ব্যথা বেদনার কি ইতিহাস লিখবো আমরা?"[৪৩]

মানিকের সাহিত্যিক আবেদন হৃদয়াবেগের কাছে যতটা নয়, তার চেয়ে

বেশী মস্তিষ্কের কাছে। প্রথম দিকের দু'তিনটি উপন্যাসকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরলে তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই তিনি আবেগ উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধেই বলে গেছেন। আবেগ নিশ্চয়ই ছিল তাঁর, আবেগ না থাকলে লিখবেন কেন? কিন্তু আবেগকে সংযত করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দিয়ে। জনজীবনের বন্দীদশা থেকে মুক্তির উপায় সুনির্দিষ্ট সংগ্রাম এবং মানুষের জীবন তার শ্রেণীগত অবস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন বাস্তব সত্যের উন্মোচনে আবেগের স্থান কোথায়? আবেগ-চালিত উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামগুলির ব্যর্থতা ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে এদের অনুপযোগিতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐ সব আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে ধনীদের, মধ্যবিত্তদের প্রচ্ছন্ন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা এ সত্য তাঁর জানা ছিল স্পষ্টভাবে। এই উপলব্ধি এবং তার প্রচার এরপর তাঁর প্রায় সব ছোট-গল্প ও উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়। কিছু লেখা বাদে এমন প্রচার সংঘটিত হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যতটা সম্ভব শিল্পসম্মত উপায়ে। এ কথা কখনও তিনি বিস্মৃত হননি যে তিনি একজন শিল্পী। প্রচারক যেমন তত্ত্বকে সাধারণ, নির্বিশেষ সত্য হিসাবে উপস্থিত করেন, মানিক তা করেননি। তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ঘটনাসমূহের সংগঠন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

মানিকের সকল রাজনৈতিক উপন্যাসে একটি যুক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সেটি হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সৌন্দর্যলোক তা সে যাকে ভিত্তি করেই হোক না কেন থাকতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য ও শান্তি বলে কিছু হতে পারে না। 'রাজনীতির ঢেউ' শান্তির নীড়ে প্রবেশ করে বিপর্যস্ত করে তুলবেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচলিত ধারা তাঁর দেশের জনসাধারণের জন্য কোনো বড় পরিবর্তন ঘটায়নি। ফলে জনসাধারণের ক্ষোভ বেড়ে উঠেছে। সঠিক পন্থায়, সচেতন প্রচেষ্টায় সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। তাঁর মতে এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে, সচেতনতা অবশ্যই রাজনৈতিক সচেতনতা।

রাজনীতি-নিরপেক্ষতা মানিকের মতে অর্থহীন কথা। তাঁর 'পাশাপাশি' উপন্যাসের নায়কের মাধ্যমে রাজনীতি-নিরপেক্ষ কথাটার অর্থহীনতা তিনি সুস্পষ্ট করে বলেছেন। 'পাশাপাশি'র নায়ক বলছে "নিজেকে আপনি নিরপেক্ষ মনে করেন কিন্তু মনে করলেই তো সেটা সত্যি বা সম্ভব হয় না। রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনীতি বাদ দিয়ে আপনার চলতেই পারে না, আপনার জীবনে রাজনীতি এঁটে থাকবেই। আপনি একটা কাগজের মালিক কিন্তু ধরে নেওয়া যাক্ আপনি কাগজ পর্যন্ত পড়েন না। কিন্তু শোনেন তো চালের দর কোথায় উঠেছে? লোকে না খেয়ে মরছে? উদ্বাস্তরা কি রকম কষ্ট পাচ্ছে? কত মানুষ বেকার বসে আছে? সব কিছু কালোবাজারের

গ্রামে গেছে? দেশের লোকের সভায়, শোভাযাত্রায়, লাঠি-গুলি চলছে? শুনে নিশ্চয় গা জ্বালা করে আপনার। তার মানেই পক্ষ নিলেন।"[৪৪] নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য তাঁর মনোবেদনা এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু এই মনোবেদনা তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। একটা সুতীব্র জ্বালা ও প্রতিকারেচ্ছু উদ্যম তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। সকল শ্রেণীর কাছেই তাঁর আবেদন —যে যেমন পেশা বা কাজে নিয়োজিত থাকুক না কেন সচেতন হয়ে বিশাল এক শ্রেণীতে মিলে যাবার জন্য এগিয়ে আসুক। সকলের সঙ্গে এক হয়ে যাবার চেতনা তাঁর মতে সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শক্তি।

মানিকের একটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন কবি। তার সঠিক আদর্শ কি হওয়া উচিত এমন একটা প্রশ্নের সে উত্তর পাচ্ছিল না, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। জনসাধারণের জন্য এই কবি লিখেছে এবং আরও লিখতে চায়। সাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষী সে। কিন্তু সবার বোধগম্য ভাষা সে আয়ত্তে আনতে পারছে না। অবশেষে কবির চৈতন্য হল যে, অপরের হৃদয়ের ভাষা জানবার পথটি হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের জীবনযাত্রার শরিক হওয়া নয়, তাদেরকে ভালোবাসাও। 'প্রতিবিম্ব'-এর কর্মী তারক যে কথা বুঝতে পারেনি —শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে তাদের শ্রেণীর 'ফাঁক' কোথায়, সে কথাটা অবশেষে বুঝতে পারল শিল্পী। "ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না"।[৪৫] কেবলমাত্র সহানুভূতি দিয়ে শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রীতি লাভ করা যায় না। তাদেরকে শ্রদ্ধাও করতে হবে।

"জীবনে যার বিশ্বাস নেই, সে মরেও সুখ পায় না"[৪৬] মানিকের একটি বিপ্লবী চরিত্রের এটাই বিশ্বাস। মানিকের এমন প্রত্যয়ী ঘোষণা আমরা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'তেও[৪৭] দেখেছি। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁকে প্রথম জীবনে ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব ও আদর্শকে নিয়ে লিখতে দেখেছি। পরবর্তী জীবনে তিনি লিখেছেন শ্রেণী সংগ্রামের কথা। জীবনকে শ্রদ্ধা তাঁর মানুষকে শ্রদ্ধারই অন্য নাম। জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে নিজের সম্বন্ধে বলতে শুনি, "বাংলাদেশের লোক তাদের লেখকদের ভারি

৪৪॥ 'পাশাপাশি' (১৯৫২), মা. গ্র., নবম খণ্ড, পৃ. ২৪০।

৪৫॥ 'ছন্দপতন' (১৩৫৮), মা. গ্র., অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

৪৬॥ 'স্বাধীনতার স্বাদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২।

৪৭॥ শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। ...শশী তাই প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সঙ্কীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন, সমস্ত জীবনকে"। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', মা. গ্র., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

ভালবাসে"।[৪৮] তীব্র দারিদ্র্যের থাবায় ক্ষতবিক্ষত তখন এই শিল্পী কিন্তু এ ভাষা তাঁর সশ্রদ্ধ ভালোবাসার। এ বিশ্বাস জীবনবাদীর, আশাবাদীর। যাদের ভালোবাসেন তারা জড়ের মতো পড়ে থাকবে না, থাকতেই পারে না, ওরা এগোবেই, অতিক্রম করে যাবে দুঃখ দুর্দশার স্তর। ভাববাদীর ফাঁকা আশাবাদ নয় বলে এই সঙ্গে তুলে ধরেছেন সঠিক পথ চলার মানচিত্রখানিও।

বাংলা সাহিত্যের ভাবরাজ্যে মানিকের স্থান কোথায়? 'ইতিকথার পরের কথা'র[৪৯] জমিদারপুত্র কৃষক এবং জনসাধারণের জন্য কাজ করতে নেমেছিল। অর্থাৎ সে মানসিকভাবে শ্রেণীচ্যুতির প্রস্তুতি নিয়েছিল। সামন্তবাদী পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে সে পুঁজিবাদী শিল্পসংস্থা গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল। জমিদারীর প্রতি তার কোনো মোহ বা পিছুটান নেই। তার চিন্তাধারা বুর্জোয়া ভাবাপন্ন। অবশেষে সে একদিন বুঝল তার আন্তরিকতা এবং ত্যাগের দাম জনসাধারণের কাছে ত্যাগী মহাপুরুষ বা নেতা রূপে নয়। সে ওদের জন্য যতটুকু সাহায্য করবে ঠিক ততটুকুই তার মূল্য চাষী মজুর জনসাধারণের কাছে। নিজের মূল্য সম্বন্ধে মানিক অনুরূপভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতো জনসাধারণের এমন শুভার্থী ও শক্তিশালী লেখক আজ পর্যন্ত আর বাংলা সাহিত্যে জন্মায়নি। সাধারণ মানুষকে তিনি করুণা করেননি, ফাঁকা সহানুভূতি জানাননি, স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর সশ্রদ্ধ ভালোবাসার, বিশ্বাসের এবং সর্বোপরি আত্মীয়তার।

মানিকের দেখা প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ কতটুকু বাস্তব? সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতার প্রশ্ন শুধু তাঁর একার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি একটি জ্বলন্ত চেতনা আরোপ করেছেন তাঁর দেশের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী জাগরণের জন্য, যে কারণে চরিত্রগুলি বাংলাদেশের ভিজেমাটিতে কতকটা অচেনা মনে হয়। ভাববাদ যতটা সহজে অন্যের হৃদয়কে ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করে, বিপ্লব ঠিক তেমন অবলীলায় প্রজ্বলিত করতে পারে না। তাঁর চেতনা যথার্থ বিপ্লবীর চেতনা। যে বিপ্লবের কথা তিনি ভাবতেন তা বিজ্ঞানভিত্তিক এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তনকামী। সে বিপ্লব কেবল ভাবাবেগ দ্বারা সম্পন্ন হবার নয়, বরং তার প্রধান মূলধন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদিতা তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রসমূহের বক্তব্য তাই সহজে প্রবল হৃদয়ানুভূতির সৃষ্টি করতে পারে না। তদুপরি যে আন্দোলন ও প্রতিবাদের তিনি রূপকার সামাজিক জীবনে তা খুব সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল এমন নয়। ভাববাদের বাস্তবিক ভিত্তি দুর্বল হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা অতি অবশ্যই বাস্তব-নির্ভর। মানিক তাকাতে

৪৮॥ উদ্ধৃত: নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'স্মৃতি', 'মানিক বিচিত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৪৯॥ 'ইতিকথার পরের কথা' (১৩৫৯), মা. গ্র., অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৫৪৪।

চেয়েছেন সামনের দিকে, আমাদের দেশে সাহিত্য এবং সাহিত্যের পাঠকও তাকাতে ভালোবাসে পেছনের দিকে। তাই মানিকের যোগ্য জনপ্রিয়তা এখনও কিছুটা বিলম্বিত।

লেনিন মানুষের দাস মনোভাবকে এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, "A slave who is not aware of his slavery and exists in a condition of mute obedience is just a slave. A slave who has reconciled himself to his position and finds his slavish existence enjoyable is a toady and a hanger-on. But a slave who is aware of his position and has risen against it is a revolutionary"[৫০] মানিক জানেন এই সত্যটি। সে জন্য তিনি চান তাঁর আত্মীয় মানুষেরা সত্যকার বিপ্লবী হয়ে উঠুক।

'স্বাধীনতার স্বাদ'-এর প্রণব চরিত্রটি মানিকের মতানুবর্তী। সে বলছে, "সাধারণ লোকের চেতনা আজ ষড়যন্ত্র ভাওতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার বেশী রকম প্রতিকূল। এ স্বাধীনতা যারা আনছে এখনকার মত তারাই দখল করে বসেছে চেতনা। স্বাধীনতা নিয়েই সবাই মশগুল, চিন্তিত। তা ছাড়া, এ চেতনা বহুকালের জঞ্জালে আবিল হয়ে আছে। প্রাণ দিয়েও এখুনি ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করে এ চেতনাকে আরও সচেতন করার সাধ্য তোমার-আমার নেই। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এবার এক হয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা এবার নিজেরাই হিসাব-নিকাশ নিতে বসবে কি পেলাম আর কি পেলাম না—নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে যাচাই করবে। সঙ্কট বাড়বে, বঞ্চিত হতে হতে খাঁটি স্বাধীনতার কামনা দিন দিন বাড়বে। এর সঙ্গে যদি চলে চেতনাকে সাফ করা দেশ-বিদেশে ছড়ানো বজ্জাতির আসল চেহারা চিনে দেওয়া, তবে হয়তো বছরও ঘুরবে না, চল্লিশ কোটি হিন্দু মুসলমান গর্জন করে উঠবে। কিন্তু এতদিনের পরাধীন পিছনে ঠেলে রাখা দেশ, চেতনা কি দুদিনে সাফ হবে, সহজে হবে। কত অন্ধকার অলিতে গলিতে ঠেলে দিয়ে চেপে পিষে ঠেকিয়ে রাখবে দেশটার সভ্য স্বাধীন জগতে মাথা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াবার সাধ।

"গোকুল সতেজে বলে, এ সব তোমার বাজে আতঙ্ক। শ্রমিক জেগেছে, চাষী জেগেছে, মধ্যবিত্ত জেগেছে—কারও সাধ্য আছে এ বার তাদের ঠেকিয়ে রাখে? আজ সাহস করে ডাক দিলে তারা সাম্রাজ্যবাদের ধনতন্ত্রের বনিয়াদ ছারখার করে দেবে" (৫৮৩)। এটা মানিকেরও বিশ্বাস। তিনি শুধু সাহসী হতে বলেছেন শোষিতকে। শোষিত শ্রেণীর কাছে তাঁর লেখা পৌঁছায়নি এটা সত্য কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি জীবন সত্যকে উপেক্ষা করেননি।

৫০। *Collected Works*, Vol. III (Moscow), p. 53.

মধ্যবিত্তের অসঙ্গতিও যেমন দেখিয়েছেন সে সঙ্গে আরও একটি সত্য দেখেছেন নিজের শ্রেণীর চেতনা থেকেই। সে সত্য হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তির জন্য যথার্থই কিছু করতে চাচ্ছে। এই শিক্ষিত শ্রেণীর চেতনাকে উজ্জীবিত ও মানসিক খোরাক যোগানোতে তাঁর লেখার উপযোগিতা। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, "জোরালো আন্দোলনের সময় যে লেখা ঝিমিয়ে দেয় সে লেখা প্রতিক্রিয়াশীল।"[৫১]

তবু প্রশ্ন থাকে, মধ্যবিত্ত কেন শ্রেণীচ্যুত হয়ে নীচে নামতে চাইবে? শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে তার কোনো স্বার্থগত সম্পর্ক নেই। তার তো সার্বক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা ওপরে ওঠার। ব্যক্তিগত স্বার্থ যতক্ষণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে ততক্ষণ সেই বিচ্ছিন্নতা সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে তো যায়ই না তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

'হরফ' (১৯৫৪) উপন্যাসের মধ্যেও মানিক এই শ্রেণীচ্যুতির আবশ্যকতার কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে জমিদার পুত্রের কথা নয়, নিম্ন মধ্যবিত্তের কথা বলা হয়েছে। জমিদার পুত্র শ্রেণীচ্যুত হচ্ছে আদর্শের খোঁজে, নিম্ন মধ্যবিত্তের শ্রেণীচ্যুতি আবশ্যক বাঁচবার প্রয়োজনে। 'হরফ' উপন্যাসটিতে মানিক পুঁজিবাদী শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইকে একটা প্রকাশনা শিল্পের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন। এই প্রেসটি যেন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও শোষণেরই প্রতীক। এই প্রেসে শ্রমের শাসন নয়, পুঁজির শাসন প্রতিষ্ঠিত। তাই দেখা যায় পুঁজির মালিক ধনপতি তার পুঁজির সাহায্যে লেখক ও শ্রমিক--উভয়েরই শ্রম কিনে নিচ্ছে। এই প্রেসের কম্পোজিটর কালাচাঁদ যেন সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতীক। কম্পোজিটর হয়েও সে পরে লেখক হয় এবং লেখক হিসাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। সে শুধু সংগ্রামী হয় না, সংগ্রামের বাণী প্রচারেও তৎপর হয়ে ওঠে।

এই শ্রমিক ও ধনীর মধ্যে অবস্থান করছে মধ্যবিত্ত লেখক সম্প্রদায়। লেখকদের মধ্যে একজন হচ্ছে উমাকান্ত। উমাকান্ত জনপ্রিয় লেখক। যে কারণে পত্রিকার মালিক ধনপতির কাছে তার একটা মূল্য থাকার কথা। কিন্তু উমাকান্ত যখন ধনপতির কাছে ন্যায্য পাওনা টাকা চায় সে টাকা সে পায় না। ফলে তার স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কালাচাঁদের স্ত্রীও বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিবাদী মালিকের হাতে শোষিত। এ ক্ষেত্রে মুক্তির পথ একটাই, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

৫১॥ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র', 'এক্ষণ', শারদীয় সংখ্যা, (১৩৮২), পৃ. ১১৩।

অন্য একজন লেখক মানব, শ্রেণীচ্যুতির পথটাকেই সেও বেছে নিয়েছে। সে কালাচাঁদের বস্তিতে থাকে এবং বস্তিতে থাকার ফলে যে অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভ করেছে তাতে তার লেখার ক্ষমতা বিকাশিত হয়ে ওঠে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একজন মানুষের প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। তাছাড়া শ্রেণীচ্যুত না হলে নিম্ন মধ্যবিত্তের পক্ষে যেমন বড় জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়, তেমনি নিজের অভিজ্ঞতাকে বিকাশিত করবার সহায়ক ক্ষেত্র পাওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন থেকে যায়, 'ইতিকথার পরের কথা' বা 'হবক'-এ যে শ্রেণীচ্যুতির কথা রয়েছে তা কতটা বাস্তব? বাস্তব জীবনে কি জমিদারের ছেলে বা নিম্ন মধ্যবিত্ত লেখক শ্রেণীচ্যুত হয়? যদি না হয় তাহলে লেখক কি সামাজিক বাস্তবতা যে বাস্তবতা উপন্যাসের ভিত্তি তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন না? এর উত্তরে বলা চলে যে আপাতদৃষ্টিতে তাই-ই। কিন্তু সমাজের উপর-কাঠামোর অভ্যন্তরে যে আর একটি অর্থনৈতিক বাস্তবতা বর্তমান সেই অর্থনৈতিক বাস্তবতাকেই মানিক উপস্থিত করতে চেয়েছেন। আপাত বাস্তবতার অন্তরালে মানুষের মনের মধ্যে যে আদর্শ, চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব লুকানো আছে তাকে তিনি দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন। প্রথম জীবনে ঐ সামাজিক অসঙ্গতির বিশ্লেষণ তিনি করে ছিলেন ফ্রয়েডীয় ধারায়। পরে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কসীয় পদ্ধতিতে।

মানিক সমাজের চিত্র-গ্রাহক ছিলেন না। তাঁর ভূমিকা অনেকটা সত্য বিশ্লেষণের। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য এ দুয়ের মধ্যে তিনি কোনো চীনের প্রাচীর দাঁড় করাননি বরং মনে করেছেন যে বিজ্ঞান ও সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্কর যেমন আশাবাদী মানিকও তেমনি। কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সেই ভবিষ্যতের ভিত্তি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। তারাশঙ্কর সনাতন ভারতবর্ষীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে নতুন চেহারায় ফেরৎ চান। তাঁর কাম্য সমাজ গড়ে উঠবে মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে, ভাববাদী-অধ্যাত্মবাদী অনু প্রেরণায়। তারাশঙ্করের স্বপ্ন বর্ণনায় যে ওজস্বিতা, উত্তেজনা ও বর্ণ সমারোহ সেটা এসেছে তাঁর ভাববাদী অনুপ্রেরণা থেকে। বিপরীত পক্ষে মানিকের লেখার মধ্যে যে এক ধরনের সার্বক্ষণিক সরলতা ও সাময়িক প্রায়-রূঢ়তা প্রকাশ পায় তার কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুত্তেজিত, বিলাসবিহীন নিরলস বৈজ্ঞানিকতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর উপন্যাসে অনেকবার আমাদের সঙ্গে কবি চরিত্রের দেখা হয় কিন্তু উপন্যাসকে তিনি কাব্য হতে দেননি। তারাশঙ্কর কবি ছিলেন না কিন্তু তাঁর উপন্যাসকে তিনি কাব্য-মন্ময়তা দান করেছেন। মানিক আশা করেন, একটা সম্পূর্ণ নতুন সমাজ গড়ে উঠবে পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে। এ সমাজ গড়ে উঠবে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তায় নয় বরং শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং শ্রেণীচ্যুত মানুষের সাহায্যে। শ্রেণীচ্যুত মানুষরা যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একতাবদ্ধ হবে সে ঐক্যের সঙ্গে অন্য কোনো ঐক্যের তুলনাই হয় না। কারণ যারা মনে করে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং জানে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ভিন্ন মানুষের মুক্তি নেই তারা যে ঐক্য সৃষ্টি করবে সে ঐক্য যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিকদের। 'জীয়ন্ত' উপন্যাসের সংগ্রামী কিশোর পাঁচুর একটি বিশেষ উপলব্ধি তাই এ রকম, "সাধারণ বন্ধুত্ব সুযোগ সুবিধার ব্যাপার। বিপ্লব বন্ধুত্ব গড়ে অন্য রকম। নতুবা জগতে বিপ্লবী হত কে?" অর্থাৎ সংগ্রামী বন্ধুত্বই বিপ্লবীর অনুপ্রেরণা। এই বক্তব্যের পেছনে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও সমর্থন যে রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে ঠিক একই কথা বলতে চাচ্ছেন, যেমন একটি কবিতায় বলেছেন 'সবাই বাঁচুক-বিদ্রোহে'।[৫২] কিন্তু এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের কোনো সাংগঠনিক রূপ তাঁর পক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি, কেন না তেমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন তাঁর কালে ছিল না। যে মার্কসবাদী সংগঠনের তিনি সদস্য ছিলেন সে সংগঠনের সীমা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে চরিত্রসমূহের চেতনা ও স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুসংগঠিত আন্দোলনের তুলনায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী। সে জন্য সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষক যারা তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়নি। জনপ্রিয়তা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোনোটাই তিনি লাভ করেননি। তারাশঙ্করের সঙ্গে এখানেও তাঁর সুস্পষ্ট বৈপরীত্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস

এ অধ্যায়ের আলোচ্য ঔপন্যাসিকরা হচ্ছেন সতীনাথ ভাতুড়ী, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল এবং মনোজ বসু। এঁদের রচিত কয়েকটি রাজনৈতিক উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এই উপমহাদেশে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যথাযথ তথ্যের অভাবে এই বিশাল গণ-অভ্যুত্থানের সঠিক মূল্যায়ন বোধ করি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু কয়েকটি উপন্যাস এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। সতীনাথ ভাতুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫) আগস্ট আন্দোলন ভিত্তিক সাড়া-জাগানো উপন্যাস। লেখকের এটি প্রথম রচনা।

"সেই ১৯৪২-এর আগস্টের ঘটনা সমূহের পরিবেশে আমার কার্যের বিচার করিতে হইবে"[১] এই উক্তি 'জাগরী'র একটি প্রধান চরিত্র নীলুর। এখানে অবশ্য নীলু শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নয়, সে একটি দলেরও প্রতিনিধি বটে। 'জাগরী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন, "রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী।

"গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়।"[১] ভূমিকায় এই কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা অবশ্য উপন্যাসটিতে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি।

আগস্ট আন্দোলনে বন্দী হয়ে কারাগারে এসেছে একই পরিবারের তিনজন সদস্য —বাবা, মা এবং বড় ছেলে বিলু। পূর্ণিয়ায় প্রবাসী বাঙালী এরা। বাবা সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে চাকরী ছেড়ে গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ গান্ধীবাদী জীবনযাত্রা তার। আশ্রম, চরকা ও ভজনের প্রশান্ত জগতে তার বসবাস। সহধর্মিণী বিলুর মা সরল এবং নিষ্ঠা সহকারে স্বামীর কাজকর্মে সাহায্য করে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আশ্রম চালানোর জন্যে আরও অনেকের সঙ্গে আশ্রমের মধ্যেই বাস করে গান্ধীবাদী বাবার দুই ছেলে বিলু ও নীলু। বাবা নিজের যৎসামান্য সঞ্চয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক আগেই নিঃশেষ করে ফেলেছে। গান্ধীর ব্যক্তিগত স্নেহধন্য মাস্টার সাহেব আশ্রম

চালানোর জন্য স্বদেশী শিল্প-চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার জীবনযাত্রা প্রায় কৃচ্ছসাধনার পর্যায়ের —যেমন আহার তেমনিই থাকা।

বিলুদের রাজনৈতিক পরিবার জেল খেটেছে বারবার। আশ্রমের মধ্যেই যতটা সম্ভব সন্তানদের সান্নিধ্যে আসে তার বাবা মা। দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত পরিবারটির মধ্যে বিশেষভাবে বিলুর জন্য চিন্তাভাবনা বা উৎকণ্ঠার কারণ এর আগে এমনভাবে ঘটেনি। বিয়াল্লিশের আগস্টে রেল লাইন তুলে ফেলার অভিযোগ ও অপরাধের বিচারে বিলুর ফাঁসির হুকুম হয়। এতেই তাকে কেন্দ্র করে পরিবারের অন্যদের এবং বিলুর নিজেরও একটা বিশেষ ভাবনা-চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। কারণ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই বিলুর ফাঁসি হবে। বাবা, মা, নীলুর চোখ ছাড়াও বিলুকে দেখছে বিলু নিজেও। চারটি প্রাণ তোলপাড়-করা এই অবলোকনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ফেলে আসা স্মৃতিমুখর সময়।

মহাত্মভব বাবার যোগ্য ছেলে বিলু। সে সবার চোখে ভালো, শুধুমাত্র নীলুই তাকে বাঁকা চোখে দেখছে রাজনৈতিক কারণে। অথচ নীলু অনেকদিন পর্যন্ত বড়ভাই বিলুর অনুগত ছিল —প্রায় ছায়ার মতো। দু'ভাই এক সঙ্গেই গান্ধীবাদী হয়েছিল —তারপর দু'ভাই যোগ দিয়েছিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলে। এরপর আর বাবার ভজনের আসরে তারা শরিক হয় না। নীলু তে চরমে ওঠে। শুরু হল সংঘর্ষ দু'ভাইয়ের মধ্যে। দু'ভাইয়ের এই বিরোধিতা অবশ্যই রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। নীলুর দলের পরিচয় লেখক এ ভাবে দিচ্ছেন, "১৯৪২ আন্দোলনের সময় যে সব রাজনৈতিক দল মনে করেছিল যে, সে সময়ে আন্দোলন করার অর্থ পরোক্ষে ফ্যাসি শক্তিকে মজবুত করা, তাদেরই একটি দলের মেম্বর নীলু।"[৩] নীলু তার আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় সরকারী সাক্ষ্য হয়েছিল। একমাত্র তারই সাক্ষ্যতে বিলুর ফাঁসি হবে।

নীলু সত্যসন্ধ না বিশ্বাসঘাতক? নীলুর সত্যনিষ্ঠার পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায় না। অন্যদের মনোভাব থেকে তার যে একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় তা আদৌ প্রীতিকর নয়। বইয়ের প্রায় আরম্ভেই বিলু নীলুর সম্পর্কে বলেছে, "উহার ভাবিতে সময়ও লাগে না। সব বিষয়েই উহার স্থির মত আছে। সে মতের সহজে নড়চড়ও হয় না।" অথচ আমরা দেখছি বিলুর তুলনায় নীলুর অন্তত রাজনৈতিক মতবাদ পরিবর্তনের সচলতা বেশী। কারণ সে বিলুর কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল ছেড়ে কম্যুনিস্ট দলের সদস্য হয়েছে। বিলুর জীবন তার নিজের দৃষ্টিতেই "কৃচ্ছসাধনের আদর্শে গড়িয়া তোলা"। অসহযোগ আন্দোলনের সহযোগিতা করতে গিয়ে হেডমাস্টার সাহেব বিলুকে দিয়েছে কাশীর বিদ্যাপীঠে

৩॥ 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮

বিদ্যাপীঠের 'শাস্ত্রী' উপাধিধারী বিলু। তার বাবার ধারণা এতে বিলুর একটা হীনতাভাব গড়ে উঠেছে। বিলু কিন্তু ওদিকে নীলুকে ইংরেজী কলেজে পড়াবার খরচ যুগিয়েছে। আর্থকোয়েক ফাণ্ড-এর কর্মী হিসেবে তার প্রাপ্য ত্রিশ টাকার সবটাই সে ঢেলেছে নীলুর পেছনে।

বিলু কি নীলুর স্বভাব জানত না? নিশ্চয়ই জানত। সে খুব ভালো করেই জানে যে নীলু 'চিরকাল স্পষ্ট বক্তা', 'মন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল', 'নিষ্করুণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ', 'কলম তুলিকা তাহার জন্য নয়।' নীলুর কথাবার্তা ও আচরণে নিষ্ঠুরতা ও অবিবেচনার ছাপ আছে সে কথা তার জানা। যেন এ সব কারণেই নীলুর পক্ষে কম্যুনিস্ট হওয়া সহজ হয়েছে বলে পাঠকের ধারণা জন্মে। নীলুর বিরুদ্ধে জনগণ, পাড়াপড়শী সবাই বলাবলি করেছে। "এত ঘৃণা পরিবর্তন হইয়াছে তাহার মনের"(১৭) বিলুর এমন ধরনের উক্তি যুক্তিপূর্ণ না হয়েও মনস্তাত্ত্বিক বোধ হয়। কারণ কোথাও সে নীলুকে সৎচরিত্র হিসেবে দেখেছে কিনা জানা না গেলেও বিলু যে তাকে স্নেহ করে সেটা বোঝা যায়। বিলুর অভিযোগ এই যে, নীলু তার পার্টির প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ সুগম করে দিয়েছে। বিলু এর আগেও একবার সন্দেহক্রমে রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ডে অভিযোগে ধরা পড়েছিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে সে বার ছাড়া পায়। এ বার রেল লাইন তুলে নেবার সাক্ষ্যটা নীলু দিয়েছে। নীলুর এ ব্যাপারে অবশ্য একটা বক্তব্য রয়েছে। তার ধারণা সে সাক্ষ্য না দিলে অন্য কেউ লোভে পড়েই কাজটা সম্পন্ন করত।

বিলুর আসন্ন ফাঁসি এবং নীলুর সাক্ষ্যদান 'জাগরী'র প্রধান দুটি ঘটনা। নীলু তার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিতে গেল এ প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই আসে। এ বিষয়ে বিলুর অভিযোগ সুস্পষ্ট। সে বলছে, "নিজের পার্টির প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ সুগম করিয়া দেওয়া হৃদয়ের সততার প্রমাণ, না রুগ্ন মনের শুচিবাইয়ের পরিচয়" (৩৪)?

তাদের বাবার ধারণা, "নীলু, তোমার নিজের দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার মর্ম আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমার পার্টি আদেশ করিয়া থাকিলে আমার বলিবার কিছু নাই। ...নীলু ও বিলুর উভয় দলের লক্ষ্য এক —কার্যক্রমে হয়তো একটু পার্থক্য হইয়া গিয়াছে।[৪] ইহার ফল কি এতদূর গড়াইতে পারে! গণ-

৪। বাবার এই মূল্যায়ন চরিত্রানুগ হতে পারে কিন্তু যথার্থ তথ্যভিত্তিক নয়। কেন না কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শে হয়তো বাইরের দিক দিয়ে কিছুটা মিল দেখা যায় কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির রীতিনীতি ভিন্ন প্রকারের। একজন

মতের উপর যে পার্টি নির্ভর করে, তাহার তো একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত জনগণকে অন্য দলের ভুলের কথা বুঝানো আর বুঝাইয়া ভ্রান্তপথে চালিত জনতাকে নিজের দিকে করা" (৭৭)। নীলুর নিজের যুক্তি অনেকটা পরস্পর বিরোধী। যদিও সে বলেছে, "রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি নীলু, আর সে দাদা নয়। এখানে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া, যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কার্যপদ্ধতি যাচাই করিতে হইবে, আমার পার্টির দৃষ্টিকোণ দিয়া সকল ধর্ম বিচার করিতে হইবে" (১৪৩)। অথচ এর আগে নীলু স্বীকার করেছে যে, "মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় নিজের রাজনৈতিক principle একটু নমনীয় করিয়া লইলে কী লোকসান হইত? ...রাজনৈতিক মতবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বোধহয় আমার ব্যক্তিগত জিদের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল" (১২৮)। নীলু নিজেকে রাজনৈতিক কর্মী রূপে বিচার করতে গিয়ে বলছে, "পার্টির বাহিরের অস্তিত্ব ...একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে" (১৪৪)। কিন্তু পার্টির আচরণে নীলুর যুক্তি ও পার্টি-নিষ্ঠা দুই-ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কারণ নীলু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে জানাচ্ছে, "আমার নিজের পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বরদের মত যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া আমার ঠিক হয় নাই। ...আমার পার্টির লোকের আমার কার্য সম্বন্ধে এই মত —ইহাই unkindest cut of all" (১৫৪)। পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বাররা নীলুর গান্ধীবাদী বাবার অনুরূপ চিন্তাভাবনা করে। কেন না নীলুর কাছে তারাও বলেছে যে, "আমাদের কর্তব্য দেশের লোককে তাহাদের ভ্রম চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া, তাহাদের বুঝানো। তাহাদের পুলিশে ধরাইয়া দেওয়া .. আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়" (১৫৪)। দেখা যাচ্ছে, এই পরস্পর-বিরোধিতার ব্যাখ্যা কেবল মনস্তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব।

> সমালোচকের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "...although the C. S. P. was made up of two major ideological streams Marxism and Democratic Socialism, its leaders could never shake off the influence of Gandhism. And in their effort to reconcile these two ideological streams and to remain 'equidistant' both from the Congress and the Communists, the Socialists had to make frequent shifts in their posture as a result of which they were always in a dilemma as to their proper place in the Indian political development."
> —Satyabrata Rai Chowdhuri, *Leftist Movements in India : 1917-1947,"* pp. 255-56.

নীলুর মনের মধ্যে দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে। সে একাকী এবং সে নিশ্চিত নয় তার কাজটি ঠিক হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে।

নীলুর কথায় দেখা যাচ্ছে পার্টির স্থানীয় শাখার সদস্যরা নীলুকে সাক্ষ্যদানে অনুপ্রাণিত করেনি। কিন্তু নীলু যে সেই দলের সদস্য এবং অনুগত কর্মী এ কথা ভুললে চলবে না। তাহলে সে কি শুধুমাত্র একার আদর্শে এমন কাজ করল? বিলুর ফাঁসির সময় ঘনিয়ে এলে জেল গেটে বসে নীলু ভাবছে যে এরপর তার পক্ষে পূর্ণিয়ায় থাকা অসম্ভব। "মার্কস্‌বাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়তো আমি ঠিক বুঝি না" (১৫৪) —এমন অকপট স্বীকারোক্তির পরও যখন নীলু পূর্ণিয়া থেকে পালিয়ে, "পরের ট্রেনে পাটনায় কিংবা বোম্বাইয়ে চলিয়া গেলে কেমন হয়? আমার দলের intellectual কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করা বড়ই প্রয়োজন" (১৬৩) —বলে অস্থির মনের সান্ত্বনা খোঁজে তখন তার সাক্ষ্য প্রদানের পেছনের একটা কারণ অন্তত আমাদের সামনে কিছুটা স্পষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় পার্টির নির্দেশের সঙ্গে 'ব্যক্তিগত জিদ' যুক্ত হয়ে তাকে সাক্ষ্যদানে উদ্বুদ্ধ করেছে। "আমি কিছুতেই অন্যায় করি নাই। আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। আর আমি সাক্ষ্য না দিলেও অন্য লোক দিত। ...আমি দিয়াছি নিজের রাজনীতিক সিদ্ধান্তের জন্য ও কর্তব্যের খাতিরে" (১৫৬) —নীলুর বক্তব্যের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় থাকলেও কি যে তার কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত না হওয়াতে তা আত্মপ্রবঞ্চনার পর্যায়ে চলে যায়।

এই পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের কোনোটাই এ গ্রন্থে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে নীলুর ব্যক্তিসত্তা ও পার্টিসত্তা পরস্পর বিরোধিতা করছে। লেখক নীলুকে এমন কোনো মানবিক গুণে ভূষিত করেননি যাতে আমরা তাকে মানবিক দৃষ্টিতে বিচার করতে পারি। এ কারণে তার ঐ পারিবারিক অবস্থানে একটা অবিশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের মনে জাগে।

নীলুর পার্টির স্থানীয় সদস্যরা জনগণকে বিভ্রান্তির ফাঁদ থেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কথা বলেছিল। নীলু নিজে আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে এভাবে দেখেছে, "সম্পূর্ণ অরাজকতা—ফ্যাসিস্তদের রাজত্ব—জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয়—অসংহত, বিশৃঙ্খল, অদূরদর্শী—অথচ দুর্লভ নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমায় মহীয়ান" (১৫৬)। বিলু ও নীলু দু'জনেই জনগণের আচরণকে 'নেশাগ্রস্ত' বলে আখ্যা দিয়েছে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের স্থানীয় শাখার প্রভাবশালী নেতা বিলু 'জনশক্তির প্রকৃত স্বরূপ—গত আগস্ট মাসে যাহা দেখিয়াছি' তাকে একবার বলছে 'সুপ্ত শক্তি' আবার অভিহিত করছে 'ভূতাবিষ্ট' বলে। 'উদভ্রান্ত জনতার অবধারিত লক্ষ্যের দিকে চলা' —বলে যদিও বিলু রেল লাইন তোলা ও টেলিগ্রাফের তার কাটা এবং থানা জ্বালানোর উদ্দীপনাকে সমর্থন করছে, তবু সেই 'অবধারিত লক্ষ্যে'র কোনো চিত্র কিন্তু

'জাগরী'তে নেই। বিলু তার নিজের আদর্শ অনুসারে ভেবেছে যে, সে যদি হঠাৎ লটারিতে অনেক টাকা লাভ করত তাহলে উইল করে তা দিয়ে 'মার্কস্‌বাদের প্রচার'[৫] (৪২) করার কাজ ছাড়াও 'ভারতের প্রতি গ্রামে রুশের বালক ও কিশোরদের ন্যায় দলের সংগঠন হইতে পারিত' (৪২)। আর যদি বিলুর দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়ে যেত তাহলে দেখিয়ে দিত 'দশ বৎসরের মধ্যে দেশের কী করা যায়' (৪২)। বিলুর চেতনা সাম্যবাদী। কিন্তু তার চিন্তার মধ্যে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। চলমান বিদ্রোহী জনতার আগে আগে চলতে গিয়ে সে দেখেছে এই উপমহাদেশের সামন্তবাদী শক্তির শক্ত ভিত্তিটাকে। অতি দরিদ্র 'বাহরগামিয়া'দের ছোঁয়া জল খাবার মতো 'বাহাদুরি এবং 'অনাসৃষ্টি কাণ্ড' বিলুর নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা 'হঠাৎ' দেখাতে পেরেছে, যদিও এদের অর্থ-নৈতিক মুক্তির কথা কাশীর বিদ্যাপীঠের ছাত্র 'ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম' পড়া 'ইন্‌টেলেকচুয়াল' বিলু কখনও ভাবেনি। আসলে বিলুর সাম্যবাদী চিন্তা বস্তুগত ধারণাহীন। যুক্তির চেয়ে এখানে উচ্ছ্বাস ও আবেগই প্রবল। এই

৫॥ বিলু যেহেতু একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে তার ভাবনায় যে ভ্রান্তি তাও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভ্রান্তি বলেই ধরে নিতে হবে। বিলুদের এমন ভাবনার অতিশয়োক্তি এসেছে নীলুর দলকে খাটো করে দেখা-বার ঝোঁক থেকে। ভাবখানা এই যে, নীলুর দলের চাইতেও কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা বেশী মার্কসীয় রীতিনীতির অনুসারী। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের সমালোচনা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য, "They did not…blindly admire everything that happened in the Soviet Union. Thus so far as civil rights and liberties were concerned, they were more attracted by Western liberalism than by the Marxian doctrine of prole-tarian dictatorship" --(Satyabrata Rai Chowdhuri, *Op cit*, p. 34)। এ ছাড়া একমাত্র মার্কসীয় ধারার প্রতিই বিলুদের কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের আনুগত্য এমন ধারণাও ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে, "Drawing its inspiration mainly from western liberalism and Fabian socialism and to a lesser extent from Marxism, Congress Socialism had emerged by responding to the problems and require-ments of the peculiar Indian situation" (*Ibid*, pp. 34-35)

উচ্ছ্বসিত আবেগের বিরোধিতা করতে গিয়ে নীলু হয়েছে শত্রুপক্ষ। বিলুকে লেখক সেকালের তরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি করে দেখাতে চেয়েছেন। ফলে তার ভাববাদী চিন্তায় শ্রেণীগত ভ্রান্তিই ফুটে উঠেছে।

'জাগরী'তে লেখকের সবচেয়ে প্রিয় ও আপনজন এবং সুঅঙ্কিত চরিত্রটি হচ্ছে গান্ধীবাদী বাবার। লেখকের সমর্থন এবং শ্রদ্ধা পেয়ে চরিত্রটি স্বয়ং গান্ধীতুল্য হয়ে উঠেছে। সামন্তবাদী জীবন যাপনে অর্থাৎ আশ্রম, ভজন ও চরকায় বিশ্বাসী এবং আস্থাবান ব্যক্তিটি 'বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে' পড়েনি। বিলুর বাবা অকপটে স্বীকার করেছে যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বড়কে গুরু ও ছোটকে শিষ্যের দৃষ্টিতে দেখা তার অভ্যাস। ফলে কোনোদিন তারপক্ষে 'কমরেড' হওয়া সম্ভব হবে না। সন্ন্যাসীতুল্য ব্যক্তিটি নিজের সন্তান নীলুর কাজকে মনে মনে যাচাই করে এভাবে, "কোনো রাজনৈতিক পার্টি কি এরূপ আদেশ দিতে পারে" (৭৭)? নীলুদের 'ফর্মুলায় ফেলা যুক্তি' তার বাবা বুঝে উঠতে পারে না। তাই 'গণমতের উপর যে পার্টি নির্ভর করে' তার গণবিরোধী ভূমিকা দেখে কংগ্রেসী বাবা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। একপর্যায়ে ছেলেকে অভিশাপ দিতে উদ্যত বাবা নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলে, "না নীলু, ভগবান করুন তুমি কোনোদিন যেন তোমার ভুল না বোঝ। তুমি তোমার পার্টির আদেশ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছ তাহাই যেন ঠিক হয়. কেন না উহার উপর ভর দিয়াই তুমি এখনও দাঁড়াইয়া আছ" (৭৭)।

দেখা যাচ্ছে বাবার চোখে নীলুর পার্টিই দোষী। বাবা অনেকবারই নীলু ও বিলুর পার্টিকে এক করে দেখেছে। যেমন, 'নীলু বিলুদের দলের প্রোগ্রামের ভিত্তি, মানুষের মন আজ যেমন আছে তাহারই উপর' অথবা 'নীলুর বিলুর দলগুলি যাহা বলে তার সবই ভুল নয়', কিংবা 'সাম্যবাদী দলে যোগদান না করিলেও হয়তো বিলুকে বাঁচাইতে পারিতাম না', অথবা 'নীলুর ও বিলুর উভয় দলেরই লক্ষ্য এক —কার্যক্রমে হয়তো একটু পার্থক্য হইয়া গিয়াছে' প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলির মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্ট পার্টিকে প্রায় একই আদর্শের ধারক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। গান্ধীবাদী বাবার এই ধারণার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার বাইরে এর ভ্রান্তি অস্পষ্ট নয়। খুব অল্প সময়ের জন্য দুটো দল একে অন্যের সঙ্গে আপস করে কিছুকাল চলেছিল। তারপর বিরোধ দেখা দিতেই সেই আপসধর্মিতার সূত্রটি গেল ছিন্ন হয়ে। এই দুটি দলের আদর্শ ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে ৪ ও ৫ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লেখিত সমালোচকের সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "The most meaningful check to Communism in India came from democratic socialism as represented by the Congreess Left Wing"। কংগ্রেসের বামপন্থীরা উনিশ

শতকীয় উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এবং সমন্বয়পন্থী।[৬] সর্বোপরি শ্রেণী বিপ্লবে অবিশ্বাসী।[৭] 'জাগরী'তে তেলী বৌয়ের নিপীড়নে নীলুর বিক্ষোভ, বিলুর নিষ্ক্রিয়তা এবং গান্ধীবাদী বাবার ঔদাসীন্য যে লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি

৬॥ "·· their idea of Socialism was mainly based on the liberal experience of the 19th century In contrast to Marxism, as interpreted by Lenin, which rejected the idea of gradualism and reform they believed in the evolutionery transformation of society into a socialistic pattern. Their faith in gradualism and piece-meal social engineering was influenced by the study of British constitutional history, the achievements of the Socialist movement in Britain and above all, the lessons of Fabianism." (*Ibid*, pp. 33-34)।

৭॥ "১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ ঘোষণার পর বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে দেশের রাজনীতির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির (সি. এস পি.) মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। ···সি. এস. পি. অন্তত বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ করে ফেলে।

"সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মীরা এখানকার সক্রিয় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ কোনো দিনই রাখেননি, তাঁদের যোগাযোগ অনেকটা পোশাকী ব্যাপারের মতো ছিল। বিহার বা যুক্তপ্রদেশে বরং কৃষক সভার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অনেক বেশি ছিল। কিন্তু সেখানেও সারা ভারত কৃষক সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কৃষকদের শ্রেণী বিপ্লবের নজরে তাকে দেখেছিলেন কিনা সন্দেহ" —(আবদুল্লাহ্ রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২)। বিভাগোত্তর ভারতেও কৃষিজীবীদের অবস্থা এবং ভূমি সমস্যাকে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী আমলই দিতে চাইত না। জমির মালিকানা প্রশ্নে কৃষকদের দাবী বা অধিকারকে তারা গুরুত্বই দেয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই এমন মন্তব্য যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, "ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ছিল সাম্রাজ্যবাদী। সামন্তবাদী শোষক শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাখবার ও তার স্বার্থ রক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল তার, তাতে দেশের দুরবস্থা যতই বৃদ্ধি পাক। কিন্তু স্বাধীন ভারতের 'স্বদেশী ও দেশপ্রেমিক' শাসকগোষ্ঠীর নীতি

সেটা তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয়বহ। সে কালের রাজনীতিতে ঐ তিন ধারাই সত্য ছিল। জমিদার, ধনী কিষাণ যে কংগ্রেসের ছায়ায় অন্যায় করে যাচ্ছে সেটাও সতীনাথ ভাদুড়ীর সমালোচনার বিষয় হয়েছে। তবে এ সব মামুলি বিশ্বাসঘাতকতার কথা বাদ যাক। সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকটিকে কিন্তু লেখক ক্ষমা করেননি। সে হল নীলু তথা '৪২-এর পটভূমিতে কম্যুনিস্ট পার্টি। 'জাগরী'তে বিলুর ফাঁসি শেষ পর্যন্ত হয়নি। অপ্রত্যক্ষে অবশ্য সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রদের সাক্ষ্যে অন্য একজনের অদৃশ্য ফাঁসির দড়ি তৈরী হয়ে যায়। সে নীলু, —রাষ্ট্র, পরিবার এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এক হঠকারী চরিত্র সে। বিলুর ফাঁসির জন্য প্রথম থেকে একটা চরম নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত বিলুর ফাঁসি হচ্ছে না। এ জন্য যথাযথ পরিবেশ ও যৌক্তিক সমাধান দেখানোর জন্য অবশেষে সত্যি সত্যিই একজনের ফাঁসি দেখাতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে সেই চরিত্রটির পরিচয়ে অহেতুকতা দেখা যায়নি, "তিন নম্বরে থাকে একটা খুনী আসামী। ভাইকে খুন করিয়াছে। সে এক অতি কুৎসিত কাহিনী" (১১)। বিলুর সম্ভাব্য ফাঁসির বদলে ভ্রাতৃহন্তা আসামীর ফাঁসির উল্লেখ তাই এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়।

'জাগরী' মনস্তাত্ত্বিক রাজনৈতিক উপন্যাস। অতীতচারী স্মৃতিময় মনো বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত সংবেদনশীল রচনা আলোচ্য উপন্যাসটি। ফাঁসি হবার আগে একজন নিরপরাধ দেশ প্রেমিক যুবকের জীবনের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে ফিরে ফিরে দেখার মধ্যে যে বেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে তা অতুলনীয়। 'জাগরী' আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসী লেখকের হাতে 'কংগ্রেস জীবনের একটি সার্থক চিত্র আমরা বাংলা কথা সাহিত্যে পেলাম'।[৮] শুধু তাই নয় লেখক সুকৌশলে ও অভিনব পদ্ধতিতে নীলুকে হেয় এবং বিলুকে মহান্ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নীচমনা বিশ্বাসঘাতক নীলুর দলের পরাজয় ঘটে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী বিলুর কাছে। এই পরাভব লেখকের অভিপ্রেত। ফলে নীলু ও তার দলের ওপর বর্ষিত হয়েছে রূঢ় সমালোচনা, বিপরীতে গান্ধীবাদী নিষ্ঠাবান বাবা এবং তার যোগ্য সন্তান বিলুর (একমাত্র রেল লাইন উঠিয়ে ফেলার কাজে নিয়োজিত হওয়া ছাড়া অন্য সব জায়গাতেই বিলুকে আমরা পাই অহিংস —'নন-মিলিট্যাণ্ট' রূপে) জন্য রয়েছে আন্তরিক সমবেদনা। আর এই আন্তরিকতার ভিত্তিতেই

সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অনুরূপ হল কেন? এখানে স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে স্বদেশী-বিদেশী প্রশ্ন নয়, শ্রেণী স্বার্থের প্রশ্ন" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮)।

৮॥ গোপাল হালদার, 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩।

কংগ্রেসী সতীনাথ ভাদুড়ীর[৯] নম্র ভদ্র প্রধান দুটি চরিত্র সজীব ও প্রবল হয়ে উঠেছে। বিপরীতে নীলু তার উগ্রতা, স্পষ্টবাদিতা এবং অশিষ্ট আচরণ নিয়েও অমন প্রবলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। উভয় ধরনের চরিত্র একটা ভারসাম্য পায়নি। এর কারণ লেখক তাঁর মতানুযায়ী বিশ্বাসভাজন ও বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। লেখকের সহানুভূতি না পেয়ে নীলু বিদ্বেষ দিয়ে তৈরী একটি পুতুলে পরিণত হয়েছে। বিরূপ ধারণার প্রতিমূর্তি সে। এ বিচার অবশ্যই নিরপেক্ষ হয়নি। কারণ 'জাগরী'তে আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এমন প্রয়াস তা সে যতই রসোত্তীর্ণ হোক না কেন খণ্ডিত হতে বাধ্য। উপন্যাসটি প্রকাশের সময়ে এ দেশের নিপীড়িতদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। রাজনৈতিক উপন্যাসের রাজনীতি সচেতন পাঠকের কাছে 'জাগরী' তাই পক্ষপাতহীন উপন্যাস রূপে গৃহীত হয় না। আগস্ট আন্দোলন কংগ্রেসের সমর্থক সতীনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সন্দেহ নেই। কেন না কংগ্রেসের রাজনীতিতে আগস্ট আন্দোলনের অনুরূপ অন্য কোনো গণবিক্ষোভের দৃষ্টান্তের অভাবে তিনি দ্বিতীয় 'জাগরী' সৃষ্টি করতে পারেননি। লেখকের প্রথম রচনাই শ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য হয়েছে।

* * *

'১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের পর যে উগ্র জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশকে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী করে তোলে সেই জাতীয়তাবাদই জন্ম দেয় এক ধরনের বিকৃত সাহিত্যের"[১০] —এ ধরনের মন্তব্যে সত্য থাকলেও তা সোচ্চার নয়। শুধুমাত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ নয় শ্রেণীস্বার্থই যে এমন বিদ্বেষের কারণ তা বনফুলের 'অগ্নি' পড়লে বোঝা যায়, অথবা বলা যায় শ্রেণীস্বার্থই মোড়ক নিয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদের। শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে যত্নশীল লেখক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী দলকে অতিশয় কুৎসিত করে চিত্রিত করেছেন। অসন্তোষের তুলনায় ভীত লেখককেই যেন এমন রচনা তুলে ধরে। এখন এই ভীতির স্বরূপটা বিশ্লেষণ করা যাক।

"আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সর্বত্রই সন্ধানী আলোকপাত করিবার দিকে আমার প্রবণতা"[১১] —বনফুল নিজের সম্বন্ধে নিজেই এ কথা বলেছেন। অথচ মার্কসবাদ যে শুধু অসার ও অপ্রয়োজনীয় নয় বরং ক্ষতিকর তা প্রচার করতেই তিনি লিখেছেন 'অগ্নি' (১৩৫৩)। মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিকতা তিনি স্বীকার করেন না।

'অগ্নি'র নায়ক অংশুমান আলোক-সন্ধানী। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে ডেপুটিকে পুড়িয়ে মারবার অভিযোগে অংশুমানকে জেলে আনা হয়েছে। সে বিচারাধীন। অংশুমান নীহারের স্ত্রী অন্তরাকে ভালোবাসে। তার ধারণা অন্তরার চোখে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করবার জন্য সে 'পাশবিক ঘূর্ণাবর্তে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বহুকাল আগে প্রয়াত বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানীরা তাকে একের পর এক কারাগারে এসে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে, আসলে অন্তরা নয়, দেশই অংশুমানের মূল প্রেরণার বস্তু।

কেরানীর ছেলে অংশুমান বাবার বুকের রক্ত জল করা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছে। তার মনে হয় এর বিনিময়ে সে তার বাবাকে কিছুই দেয়নি। স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলাফল নিয়ে কখনো কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয় কংগ্রেসী অংশুমান। তার প্রেমিকা অন্তরা এক সময়ে কম্যুনিস্ট দলের সদস্যা ছিল। নিজের পার্টিকে অন্তরা পরে আখ্যা দিয়েছে 'আড্ডাখানা' বলে। পার্টির কাজ-কর্মকে সে আগে কখনো এমন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেনি। পরে বাঁকা চোখে দেখেছে কেন না সে তার পার্টির পাশাপাশি সমুন্নত এক বীর ও আদর্শ-বান পুরুষকে তুলনা করবার জন্য পেয়েছে, সে হচ্ছে ঐ কংগ্রেসী অংশুমান।

আড্ডাখানা থেকেই অন্তরা কমরেড নীহারকে বেছে নিয়ে স্বামী রূপে বরণ করেছে। কমরেড স্বামীর কিন্তু ক্যাপিটালিস্ট সরকারের অধীনে চাকরি নিতে একটুও বাধেনি। আগস্ট আন্দোলনের সময় সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ দমন করার পুরস্কার স্বরূপ রায়সাহেব খেতাবও পেয়ে যায় নীহার। প্রাক্তন কমরেড স্বামীর ক্ষুদ্রতা ও নীচতায় অন্তরার যখন মাথা কাটা যাচ্ছে তখনই অংশুমানের সঙ্গে তার পরিচয়। মুখচোরা কংগ্রেসী অংশুমান প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ঘোষণা করে অন্তরাকে হতবাক করে দিল। এ সময়ে অন্তরা অংশুমানের চোখে মুখে 'অপূর্ব দিব্য জ্যোতি' ফুটে উঠতে দেখে। আগস্টে নিরীহ অংশুমানের অগ্নিময় রূপ দেখে আত্মপ্রেমিক অন্তরার ধারণা বদলে যায়। এতকাল তার মনে হত যে, কম্যুনিস্টরাই বুঝি সব কিছু করছে। এই ভুলের মাশুল দিয়েছে সে নিজের প্রিয়তম সম্পত্তি জড়োয়া গয়নাগুলি অংশুমানদের সাহায্যের জন্য দান করে। আর এই গয়না দেওয়াটাকে সে নিজের জীবনে শ্রেষ্ঠকীর্তি বলে মানে। এক অংশুমানের অগ্নিরূপ দেখেই যেন কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে তার ধারণা পাল্টে ফেলল অন্তরা। এক প্রাক্তন কমরেডকে সে বলা নেই কওয়া নেই সুদীর্ঘ এক চিঠি লিখে ফেলে। অথচ ঐ কমরেড মীনা দত্তের সঙ্গে অন্তরার অন্তরঙ্গতার কোনো বিবরণ 'অগ্নি'তে নেই, যাতে তার চিঠি লেখার আগ্রহের কারণ স্পষ্ট করে বোঝা যায়। তবে চিঠির বিষয়বস্তুতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্তরা তথা অন্তরার নামে লেখকের বক্তব্য। কম্যুনিস্টদের অন্তরা সহসা

হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে, "অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করেনি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছদন জোটাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। বাবা, দাদা বা ওই জাতীয় কারও ঘাড়ে চ'ড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদ্গীরণ ক'রে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে কমিউনিজমের ঢক্কানিনাদে" (৫৩-৫৪)।

অন্তরার এ ধরনের কম্যুনিস্ট বিদ্বেষের জোরালো কোনো কারণ 'অগ্নি'তে খুঁজে না পাওয়াতে তার বক্তব্য যে আরোপিত তা ধরা পড়ে যায়। কম্যুনিস্ট দুষ্কৃতকারীদের পাশে মহিমান্বিত কংগ্রেসী চরিত্র লেখকের জোর করে চাপানো বক্তব্যের বিষয়ে যেন আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেয়।

আরও একজন অন্তরার কাছে আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। সে হল তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বিধবা দুর্গা দিদি। দুর্গার জীবন যাপন প্রণালী এমন— "এক বেলা আহার, পরনে থান, কখন ঘুমোন কখন জাগেন—কেউ জানতে পারে না" (৭৯)। তাছাড়া নিরক্ষর এই মহিলার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আর এ জন্যই বোধকরি তার চার পাশ সুরভিত হয়ে থাকে বলে অন্তরার ধারণা।

স্বামী নীহার সেন অন্তরার চোখে আদর্শহীন পদলোভী এক পুরুষ। লেখক তাকে শুধুমাত্র তার স্ত্রীর চোখ দিয়ে বিচার করে সন্তুষ্ট থাকেননি। শিল্পের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেও সরাসরি আঘাত করেছেন, তদুপরি নীহারের ভাবনা-চিন্তাতেও নীহার ক্ষুদ্রমতি হীনমন্য চরিত্র রূপে ধরা পড়েছে। 'আগস্ট ডিস্টারবেন্স'কে নীহার শক্ত হাতে দমন করেছে এই ভেবে যে, "...ঠিক এই মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসন-বিভাগে চাকরি নেওয়াটা প্রয়োজনও। আগস্ট ডিস্টারবেন্সের অর্থ তো পরিষ্কার। ফাসিস্ট জাপানকে আমন্ত্রণ। সেটা তো মারাত্মক" (৮৪)। রূঢ় কর্তব্যপরায়ণ এবং 'মনে প্রাণে কমিউনিস্ট' নীহার শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অমহৎ কাজ করতে পেছপা নয়। কারণ তার জানা আছে, "লেনিন মানব-প্রেমিক ছিলেন, মনে মনে তিনি যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন, তা প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবে মূর্ত করতে গিয়ে নরহত্যায় পশ্চাৎপদ হননি তিনি। হ'লে চলে না। লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না" (৯২)।

এত ভাবনার পরও বিবেকের তাড়নায় পীড়িত বোধ করে নীহার। অন্তরা যখন তাকে সব ছেড়ে চলে যাবার জন্য বলে তখন তার লঘু হাসিতে উড়ে যায় শুভার্থিণীর প্রার্থনা। ক্ষুব্ধ চিত্তে অন্তরা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেল কিন্তু সে খপ্পরে পড়ল পুলিশের। অংশুমানকে নিজের গয়না দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারটা অন্তরা মীনা দত্তের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছিল। পুলিশ অফিসার সেই চিঠিটা প্রমাণ স্বরূপ পেয়ে গেছে। অন্তরা চলন্ত ট্রেন

থেকে দুর্বৃত্ত অফিসারটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এই খুনের অপরাধে তার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল।

অহিংস-কংগ্রেসী অংশুমান অনুতপ্ত চিত্তে ভাবে যে, 'পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালনে' অংশ নিয়ে সে 'ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার' থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হঠাৎ একটা 'আধ্যাত্মিক সত্য'-এর অনুভূতি জাগতেই সে ডেপুটি নীহার সেনের কাছে ডেপুটি পোড়ানোর ষড়যন্ত্রের কথাটা স্বীকার করে ফেলে। চুপ করে থেকে এতকাল নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে বলেই যেন সে বিশেষভাবে অনুতপ্ত।

বিচারে ফাঁসি হচ্ছে অংশুমানের। অন্তরারও ঐ একই সঙ্গে ফাঁসি হবে। অন্তরার মনে কি ভাব উদিত হয়েছে লেখক তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্তরাও যে তার সঙ্গে ফাঁসিতে যাচ্ছে এবং পাশেই দাঁড়িয়ে এ কথা জেনে ও ভেবে অংশুমানের মনে হয় যেন চরাচরব্যাপী কেবল সৌন্দর্য। একাকীই সে সেই স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করে। ফাঁসির কথা তার মনেও থাকে না। "আত্মিক শক্তি—মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান···সে শক্তির চর্চা তো সে করেনি কোনদিন" (১০৩) —এ কথা ভেবেই যেন অংশুমান অহিংস 'আত্মিক শক্তি'র সন্ধানে নিজের বিচার নিজে করে জবানবন্দী দেয় এবং হিংস্র হবার অপরাধ মোচন করতে 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দের তুলনাতেও উৎকৃষ্ট সহনশক্তির পরিচয় দিয়ে ফাঁসিতে যায়।

বিধবা দুর্গাদিদির আদর্শ অন্তরা জীবনে গ্রহণ করবার সুযোগই পেল না। কিন্তু কম্যুনিস্টদের পতন-স্খলনের সব দায় নিয়ে, কংগ্রেসী বীর অংশুমানকে অর্থ-সাহায্য করে ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে গেল অন্তরা। কী আশ্চর্য! তার মনেও অংশুমানের মতো আনন্দ হচ্ছিল কিনা তা কিন্তু লেখক বলেননি। অন্তরা কি তবে মানুষ নয়? না-কি একবার কম্যুনিস্ট হয়েছিল বলে সে মানুষের মর্যাদা পাবার দাবি হারিয়েছে। নইলে ফাঁসির আসন্ন মুহূর্তে তার মনোভাব এতটুকু জানতে দেননি কেন লেখক? নিশ্চয়ই তার মনে অনেক কথাই জেগেছিল।

'অগ্নি'র তুলনায় 'জাগরী' যে অনেক শক্তিশালী রচনা তা নানা কারণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিলুর সম্ভাব্য মৃত্যুর কল্পনায় পরিবার প্রতিবেশে যে মর্মস্পর্শী বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে তার একটা আন্তরিক বিবরণ দিয়েছেন সতীনাথ। বিলু চরিত্রের মতবাদ ও আদর্শ বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে তাকে বর্মের মতো ঘিরে রাখেনি। সে হয়ে উঠেছে মানবিক। অপরপক্ষে আরোপিত আদর্শ-বাদে এবং 'ভারতীয় মনুষ্যত্ববোধে' ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে অংশুমান। তথা-কথিত আলোকাভিসারী এই চরিত্রটি এক সময়ে অনুভব করে, সে আলো নয় বরং তার মধ্যেই রয়েছে আগুন। কিন্তু অংশুমানের অনুভূত সত্য তার

চরিত্রটিকে আদপেই অগ্নিদীপ্ত করে তোলেনি। অংশুমান বনফুলের কম্যুনিস্টদের প্রতি ভীতি ও ক্রোধাগ্নির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে মাত্র। 'অগ্নি'তে বিধৃত কম্যুনিস্টদের কুৎসা কিন্তু কংগ্রেসী মাহাত্ম্যকেও বাস্তব করতে সক্ষম হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি বক্তৃতায় বনফুল বাস্তবতার অজুহাতে যাঁরা সাহিত্যকে কলুষিত করেছেন তাঁদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, "সমাজে কুৎসিত চিত্র অনেক আছে, তাহারা সাহিত্যের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া কেহ যদি সেইগুলিকে কাব্যে স্থান দিয়ে উগ্র বর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত করিতে থাকেন, তখন সন্দেহ হয়, লেখকের শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে অন্য মতলব আছে।"[১২] হাস্যরসিক লেখক এখানে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। খেয়াল করেননি 'অগ্নি'তে. তিনি ঠিক ঐ কাজটিই করেছেন। তাঁর নির্দেশিত কারণেই 'অগ্নি' প্রচারধর্মী এবং 'মতলব'-এর শিল্প প্রচেষ্টা রূপে গৃহীত হয়।

'অগ্নি'তে বনফুল আগস্ট আন্দোলনে ইংরেজ শাসনের নির্মমতাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তিনিই যখন প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, "সাহিত্যই আমাদের একমাত্র পথ, একমাত্র পথ প্রদর্শক। আধুনিক ভারতের নবজাগরণের মূলে ছিল এই সাহিত্য"[১৩] এবং আরও বিস্তারিত করে বলেন, "ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে দেখি, বাঙালী সমস্ত ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করিয়াছে, তাহারও একমাত্র কারণ, ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে বাঙালীরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল"[১৪] তখন তাঁর এই ইংরেজ প্রশস্তিতে ধরা পড়ে যায় শ্রেণীস্বার্থের স্বরূপটি। ইংরেজ পরের যুগে বাঙালীদের 'সুখে-স্বচ্ছন্দে' রাখলে বাঙালীর প্রতিভা যে ইংরেজের বিরোধিতা করতে যেত না তাঁর উক্তিতেই সেটা ধরা পড়ে। বাঙালী বলতে তিনি অবশ্য নিজের শ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন —'বঙ্গদেশের কৃষক' সাক্ষ্য দেবে যে কৃষক পূর্ববর্তী যুগেও সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল না।

'অগ্নি'র অংশুমান শেষ পর্যন্ত একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতির আশ্রয়ে শান্তি পায়। এই আধ্যাত্মিক পশ্চাদ্মুখিনতা এসেছে আসলে এক ধরনের ভীতি থেকে। সে ভীতির মূল কথা নিপীড়িত শ্রেণীর সচেতন হবার ভীতি। বনফুল তাঁর অন্য একটি লেখায় বলেছেন, "যে জনসাধারণের দারিদ্র্যের অজুহাতে তোমরা বিদ্রোহের 'ঝাণ্ডা' উড়িয়েছ, সেই দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করেছ কি ভাল ক'রে? করলে একটা জিনিস দেখতে পেতে—

তারা আমাদের চেয়ে সুখী, আমাদের চেয়ে ভালো। ...তারা যদিও দারিদ্র্য-জীর্ণ তবু তারা সুখে আছে। তাদের মধ্যে অসুখের বীজ আমরাই বপন করেছি পরশ্রীকাতরতার বিষ ছড়িয়ে।"[১৫] অনুরূপ কথাই অন্তরা 'অগ্নি'তে বলেছে। কিন্তু নিজেদের অবস্থান ঐ দারিদ্র্যে জীর্ণশীর্ণ লোকদের সঙ্গে বদলে নেবার ইচ্ছা আছে কিনা সে কথা অন্তরা বা লেখক কেউই উল্লেখ করেননি।

এক শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধিতে অন্যের মনে পাছে ঈর্ষা জন্মায় তেমন ভীতিই পথ-নির্দেশ করে আধ্যাত্মিক লোকের দিকে। বেকার অংশুমান তাই সহসা আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পেয়ে গেছে। কংগ্রেসের অহিংস পথকেই লেখক শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। অংশুমানও নিজের হিংস্র হওয়াটাকে ক্ষমা করেনি। ফাঁসিতে গিয়ে হিংস্র হবার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বেকার যুবকরা যদি শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করে তাহলে সেটা বনফুলের মতে পরশ্রী-কাতরতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বেকার কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে বেকার অংশুমানের আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বনফুলকে 'অগ্নি'র একশো কুড়ি পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রায় পঞ্চাশ জন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং পৌরাণিক চরিত্রের মৌখিক আশ্বাস আদায় করে নিতে হয়েছে। এঁরা সকলেই অংশুমানের কল্পনায় সশরীরে সামনে দাঁড়িয়ে সঠিক আলোকিত পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। অবশেষে জীবিত গান্ধীবাদী কর্মী হারজতের উপদেশ শুনে নির্ভুল পথটির সন্ধান পেয়ে যায় অংশুমান। সে পথ আধ্যাত্মিক, অহিংস এবং নির্বিকার। 'অগ্নি'তে সঠিক পথ নির্দেশের তুলনায় বরং লেখক সাম্যবাদের ঈর্ষাকাতর সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলিপথটার সমালোচনায় অধিক সফল হয়েছেন। শুভর চেয়ে অশুভকেই তিনি স্পষ্ট করতে পেরেছেন বেশী করে। এর কারণ স্বচ্ছ। ভূতের গল্পে ভয় পাওয়া মানুষটার চাইতে বরং ভূতটাই বেশী সত্য, এখানেও তাই ঘটেছে। সেই ভূত শ্রেণী-সংগ্রামের।

* * *

সাম্যবাদের ধারণা এবং সাম্যবাদীদের ধারালো বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনেক অরাজনৈতিক ঔপন্যাসিকেরও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছন্দায়িত কাব্য-লোকে, স্নেহ প্রেম রোমান্টিকতার পরিবেশের মধ্যে কম্যুনিস্টরা যে কতটা ছন্দ-পতন ঘটাতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর'-এ (১৯৪৯)। অসামান্য রচনাকুশলতায় উজ্জ্বল এই উপন্যাসটি পড়লে রোমান্টিক সুখ-দুঃখের, প্রেম-প্রীতির একটা চেনা জগৎ অচেনার নতুনত্ব নিয়ে পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। চেনা এ জন্য যে, এর চরিত্ররা সবাই পরিচিত মধ্যবিত্ত। অচেনা মনে হওয়ার কারণ এদের ওপর লেখকের আরোপিত

১৫॥ 'বেকার সমস্যা', 'উত্তর', (১৩৬০), পৃ. ৩৫

অসাধারণত্ব। কাব্যিক ভাষায় আলোর খেলা, নরম মৃদু অনুভূতি এবং সুন্দরী মেয়েদের বর্ণনায় 'তিথিডোর' অজানা বিদেশী রাগিনীর মতো মনে দোলা দিয়ে যায়। 'শেষের কবিতা'র পরেই স্নিগ্ধ রোমান্টিক উপন্যাস হিসেবে 'তিথি-ডোর'-এর স্থান। 'তিথিডোর'-এর সব কিছু সুন্দর। অসুখ, কান্না, মৃত্যু, মান-অভিমান এবং প্রেম গ্রীষ্মের মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়ার মতো ঐ সব অভিজ্ঞতা ছুঁয়ে যায় পাঠকের অনুভূতিতে। অথচ কাব্যিকতা সরিয়ে নিলে, এই উপন্যাসের ভাবময়তা সরে গিয়ে অতি সাধারণ এক চেনা গল্প বেরিয়ে আসে।

'তিথিডোর'-এর নায়ক সত্যেন রায় গরীবের ছেলে। ছাত্র জীবনে টিউসনি করে শুধু নিজের খরচই চালায়নি, বাবাকেও টিউসনির টাকা পাঠিয়েছে। হতে পারে সে অন্য ছাত্রদের চেয়ে গরীব, কিন্তু তার নিজের কোনো অভাববোধ নেই। অভাববোধ সম্ভবত জাগেনি বই পড়ার কারণে এবং ঢাকা পড়েছে বই কেনার নেশার আবরণে। ইংরেজীর তরুণ এই দরিদ্র অধ্যাপক ছুটিছাটায় 'শেষের কবিতা'র অমিট রে-র মতো সমুদ্র পাহাড় দেখতে ছোটে। দু'জনের মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে অমিটের পায়ের নীচের মাটি পাথরের মতো শক্ত, কারণ তার বিত্ত অঢেল। সত্যেনের মানসিকতায় অমিট এবং 'পথের পাঁচালী'র অপুর সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে অপু অমিট রে হতে চাইলে যে বিড়ম্বনা দেখা দেবে সত্যেনের বেলায়ও তেমনটি হত, কিন্তু তেমন সম্ভাবনা থেকে তাকে রক্ষা করেছে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যময় লিপিকুশলতা এবং অতীব মধুর রোমান্টিক প্রণয় পর্ব। এমন রোমান্টিকতা সমগ্র লেখা জুড়ে। ফলে আভিজাত্যহীন অলিগলিময় পাড়ার নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত অধিবাসীরা যেন কবিতার মসৃণ পথ ধরে মানসিক স্বপ্ন ও কল্পলোকে যাতায়াত ও বসবাস করে। যেন তপ্ত সূর্যালোক নেই এখানে। সবটাই চাঁদনী রাতের মায়ায় মন-ভোলা, আপন-ভোলা চরিত্র সবাই।

কিন্তু মাঝে মাঝে কর্কশ, ভদ্র, সৌজন্যবোধহীন, বিদেশে লেখাপড়া শেখা এক কম্যুনিস্ট চাঁদনী রাতের মোহ ভেঙে দিয়ে, তার সমস্ত নির্মম যুক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে যায়, 'ও সব মিথ্যে'। যেন নতুন মেহের আলী লোকটা। অথচ মেহের আলীর মতো পুরোপুরি পাগলও নয় আবার। বুদ্ধদেব বসুর ভাষা পাহারা দেয়, নইলে বলা যেত লোকটি **half idiot**। অজস্র অপচয়ে আনন্দিত ছোটখাট জমিদার, রেঙ্গুনের কাঠখোট্টা কাঠ ব্যবসায়ী, ডাক্তার —সব চরিত্রের তুলনায় খারাপ হল কম্যুনিস্ট হারীত। হারীতের মস্ত অপরাধ, সে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে পাশ করে কিনা সত্যেনের (এ দেশীয় ইংরেজীর অধ্যাপক) সঙ্গে তর্ক করতে যায়। তাদের তর্কের কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক—

> 'খাওয়াতে আর খাওয়ানোতে এত সময় যায় বাঙালির যে কাজ করবে কখন।' হারীত তাকাল সত্যেন রায়ের

দিকে, ঠিক বোঝা গেল না, সমর্থনের আশায়, না ভালো-মানুষ চেহারার শিক্ষকটিকে শিক্ষিত করতে।

'চিনেদের শুনেছি আরো বেশি', সত্যেন রায় বললো।

'সে-জন্যই তো এই অবস্থা চিনের। জাপান ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে! তা মার খেয়ে বুদ্ধি খুলেছে এতদিনে, যুদ্ধ করতেও শিখেছে।'

... ...

'চিনেরা যখন ছ-ঘণ্টা ধ'রে রাঁধতো আর দু'ঘণ্টা ধ'রে খেতো', সত্যেন মৃদুস্বরে বললো, 'তখন কিন্তু কবিতা লিখতো খুব ভালো'। 'কবিতা!' সঙ্গে সঙ্গে হারীত ঘোড়ার মতো টগবগ ক'রে উঠলো। 'পায়ে পা তুলে ব'সে একটু একটু ক'রে চিনে কবিতা চাখতে মন্দ লাগে না, কিন্তু চিনকে, চিনের কোটি-কোটি মানুষকে কি তা বাঁচাতে পারলো?'[১৬]

হারীতের এমন সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলার ফলাফল যে প্রীতিকর হবে না তা সহজেই অনুমান করা যায়। সত্যেনের নিম্ন মধ্যবিত্ত সামাজিক অবস্থানে আভিজাত্যের সুর এনে দিয়েছে —বিদেশী রাজার ভাষায় শিক্ষকতার জীবিকা, কবিতা পড়া, কবিতার সপক্ষে বলা ও বিত্ত-ঔদাসীন্য। রোমান্টিক এক কল্পলোকের বাসিন্দা সে। আর পাষণ্ড হারীত কিনা কথায় কথায় কর্কশ স্বরে জানাতে চায় যে কবিতার বদলে মার্কস পড়া উচিত, এমন কি প্রেমে পড়লেও। যখন তখন সে রূঢ়ভাবে সত্যেনদের কষ্ট করে সাজানো স্বপ্নগুলোকে ভেঙে দিতে চায়। এ হেন হারীতের জন্য লেখকের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই, ফলে পাঠকের সঙ্গেও কোনো হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তাহলে সত্য কোনটি? সত্যেনরা খুব ভালো আর হারীতরা নিকষ কালো? সত্যেনদের দারিদ্র্য-ভোলা সৌন্দর্য-পিপাসু মানসিকতা, না-কি হারীতদের অমার্জিত সমাজ বদলের ধারণা? 'তিথিডোর'-এর রূঢ় চরিত্র হারীত যখন স্বাতী বা সত্যেনের কবিতার মনোরম জগতে তীব্র কোলাহল করে ওঠে তখন তাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে ধরে নিতে হয়। রাজেনবাবুর 'নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতা'য় ভরা স্বপ্নের সংসারেও যখন হারীত মেয়ের জামাই হয়ে ঢুকে পড়ে, তখন কম্যুনিস্টরা সে সময়ে যে কত প্রবল এবং কারুর কারুর মনে কত বিরূপ ধারণার জন্ম দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। হারীতের দাম্ভিক চরিত্রটি একটি অরাজনৈতিক শান্তিপ্রিয় পরিবারে রাজনীতির উগ্র স্পর্শ এনে দেয়, তাকে এতটুকু রোমান্টিক ছোঁয়া দেননি লেখক। আর এতেই প্রকাশিত হয়েছে কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী বুদ্ধদেব বসুর পরিচয়।

১৬॥ 'তিথিডোর', (১৯৪৯), পৃ. ২৩৮।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের কম্যুনিস্টরাই কেবলমাত্র একা নয় তার আগের ও পরের ('তিথিডোর'-এর ঘটনার সময় '৪২-এর আগের এবং রচনাকাল ৪৬ থেকে ৪৯ সালের মধ্যে) কম্যুনিস্টরাও বিরাগভাজন হয়েছে তথাকথিত অরাজনৈতিক লেখকদের কাছেও। আর তখনই সন্দেহ হয় —অরাজনৈতিক লেখক বলে আসলে বুঝি কেউ নেই, বিশেষ করে একে শ্রেণী-বিভক্ত তায় আবার পরাধীন দেশে। আগস্ট আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের ভূমিকা তাহলে বিরূপতার একমাত্র কারণ নয়, যদিও এই ভূমিকার জন্য তাদের জুটেছে বাড়তি লাঞ্ছনা। শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণশীল লেখকদের দ্বারা কম্যুনিস্টদের চিত্রিত চরিত্র সব সময়েই উগ্র এবং অহঙ্কারী, সর্বোপরি দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে ভণ্ডও। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের এমন বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও কুৎসার কারণেই কম্যুনিস্ট আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশে আজও যথাযথ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

* * *

বনফুলের 'অগ্নি'তে গণ-জাগরণকে 'অন্ধশক্তি' বলে আখ্যায়িত করেছে অংশুমান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন্ত্র-মুখর' (১৩৫২) আগস্ট-আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস। এখানে আন্দোলনে জনগণের ভূমিকাকে অনেকটা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এই আন্দোলনকে নিপীড়িত জনগণের জাগরণ রূপে দেখেছেন লেখক। কংগ্রেসী নেতাদের কারারুদ্ধ হবার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা পরিণত হয়েছে শ্রেণী-আন্দোলনের প্রতিবাদী হিংস্র মানুষ রূপে। এরপর 'মন্ত্র-মুখর'-এ দেখা যাচ্ছে নির্মম দমন প্রচেষ্টা চলছে সরকারের তরফ থেকে। চারদিকে হতাশা।[১৭] কিন্তু এরই মধ্যে সঠিক পথে হতাশাগ্রস্ত জনগণকে জাগাতে এসেছে প্রভাস।

১৭॥ কংগ্রেস এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ গৌরব দাবী করে। কিন্তু এই আন্দোলন দমনের ভয়াবহ পরিণতি যা সাধারণ মানুষকেই ভোগ করতে হয়েছে সে বিষয়ে 'জাগরী'তে উল্লেখ নেই। 'অগ্নি'তে কিছুটা বর্ণনা রয়েছে তবে তা জনগণের অনুভূত ভাষায় নয়, বর্ণিত হয়েছে এক পাষণ্ড পুলিশ অফিসারের ভাষায়। আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজেই জনগণের প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, "After they had completely destroyed the British Raj in their areas, the people considered their task fulfilled, and went back to their homes not knowing what more to do. Nor was it their fault. Tne failure was ours, we should have supplied them with a programme for the

এই মধ্যবিত্ত নেতা সংগ্রামী মনোভাব হারায়নি। অত্যাচারিত, অপমানিত, অবদমিত অথচ হিংস্র মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলতে প্রভাস বদ্ধপরিকর। সে তাদের 'বৈজ্ঞানিক পথ'-এ চলবার অনুপ্রেরণা যোগাবে। 'উচ্ছ্বাস'কে পরিণত করবে যুক্তিতে। কিন্তু প্রভাসের এমন দৃঢ় মনোভাবের এবং কর্মদক্ষতার যোগ্য পটভূমি সৃষ্টি না হওয়াতে তার আশা তেমন জোরাল ভিত্তি পায় না। প্রভাসের কথাতেও 'যুক্তি'র বদলে 'উচ্ছ্বাস'ই বরং বেশী প্রতিধ্বনিত। তবে তার বিশ্বাস যে-অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেটা শ্রেণী আন্দোলনের কারণেই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাম্যবাদে আস্থা রাখেন, কিন্তু তাঁর মধ্যেও একটা দ্বিধা দেখা যায়। যে জন্য তিনি অমার্কসীয় মন্তব্য করেন, "এখনো আমাদের দেশে মধ্যবিত্তই বিপ্লবের মশালচী।" তাই তাঁর মতে "সাহিত্য যদি বিশেষ

next phase" —(Quoted in Satyabrata Rai Chowdhuri, *op. cit.*, pp. 182-83)।

শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেছেন যে, বেশ কিছু প্রভাবশালী কংগ্রেসী "failed to attune their mental attitude to the spirit of this last fight for freedom" (*Ibid*), এই মন্তব্যে দুটো সত্য স্পষ্ট হয় —জনগণের প্রতি অনেক কংগ্রেসী নেতাদের মনোভাব ; দুই, জয়প্রকাশের 'শেষযুদ্ধ' সম্বন্ধে অমার্কসীয় ধারণা। দুটো কারণ মিলে মিশে আগস্টের অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানকে সঠিক পথে চলতে দেয়নি। জয়প্রকাশ নারায়ণের বর্ণিত প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতাদের আন্দোলনের প্রতি ঔদাসীন্যের কিছু কারণ নীচের বক্তব্যে রয়েছে (এ ছাড়াও জনগণের শক্তি ও স্বরূপ দেখেও তাঁরা ভীত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই), "The British Government however, did not trust the Communists as is evident from the letter dated 4 May, 1942, from Sir Roger, Governor of Bombay, to Linlithgow. The Governor felt on the basis of some evidence with him that the 'Communists would try and establish themselves in the Army and the Police so as to use them for their own purposes at a suitable moment'. He feared that subsequently there 'would be something like consternation among the employers and capitalist classes. They would work up an

করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয় তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না"[১৮]. —আর এমন বোধের জন্যই তাঁর মধ্যবিত্ত নেতারা জনগণের কাছে যেতে চাইলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রদের মতো মানসিকতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতাদের নেই। এমনটা হতে পেরেছে সম্ভবত তাঁর দলগত কোনো অঙ্গীকার না থাকার দরুণ। তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাস করেছেন, সাম্যবাদী দলে নয়। দলের সঙ্গে মিলেছেন, কিন্তু দলের একজন হয়ে নয়। ফলে তাঁর বিপ্লবী চরিত্ররা খাঁটি বিপ্লবী চরিত্র হয়ে ওঠেনি। তিনি যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তা তাঁর আর একটি লেখা থেকেও স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন, "জীবন আর দর্শনের মূল্যমান যখন একটা পরিপূর্ণ বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়ায়—তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় বুদ্ধিজীবীর। ...এই দ্বিধা তাকে এগোতে দেয় না—কিছুক্ষণ পথ খুঁজে মরতেই হবে—উপায় নেই।"[১৯]

এই দ্বিধা থেকে মুক্তির পথ তাঁর মতে, "রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাটা যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, লেখকের লক্ষ্য ততই স্থির হয়ে আসবে। সে ঠিক বুঝতে

agitation about wages and might not be able to control the workers, and strikes would result. Apart from the employers the wealthy middle-classes would be alarmed. They would see in Government's recognition of co-operation with Communist Party the beginning of the rise of Labour'. He, however, thought that 'this was bound to come sooner or later'. He referred to the repercussions on the Congress which 'dominated as it was by the Bania classes, might also be forced to reconsider its attitude to the Government in view of the rise of the Communist Party" (*Quit India Movement*, 'Editor's Introduction', edited by P. N. Chopra, Haryana, 1976, p. 9).

কংগ্রেস শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল তার প্রমাণ কোথাও নেই। কেন না ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের দমননীতির শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে বহু শ্রমজীবী মানুষ (আবদুল্লাহ্‌ রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯)।

১৮ ॥ 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,' প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. একানব্বই।

১৯ ॥ 'সাগরিক', (?), পৃ. ৬৪-৬৫।

পারবে কাদের জন্যে সে লিখছে—কী সে লিখছে। কোনো একটা তরল ভিত্তির ওপর পাকা গাঁথুনীর বনিয়াদ দাঁড়াতে পারে না"।[২০] অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর বিশ্বাস, আস্থা এবং ভালোবাসা থেকে যে পাকা ভিত্তি রচনা করেছেন সেটা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রতিভার তারতম্যের কথা বাদ দিলেও এর একটা প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে মানিক ছিলেন খাঁটি মার্কসবাদী সাহিত্যিক।

মার্কসবাদে ভাববাদী ধারণা অনুপ্রবেশের জন্যই লেখকের আর একটি শক্তিশালী উপন্যাস 'লালমাটি'র (১৩৫৮) সংগ্রামী চিত্র অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাস্য কোনো জয়ের পথ সেখানে দেখানো হয়নি। প্রজাদের ওপর জমিদারের উৎপীড়ন এবং উৎপীড়িতদের প্রতিবাদ এর বিষয়বস্তু। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নও এসেছে। হিন্দু প্রজাদের মধ্যবিত্ত নেতা রঞ্জন ও নগেন। অন্যদিকে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আদর্শবাদী মাস্টার আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিন একটি বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। সকল সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষের জন্য একাগ্র মঙ্গল কামনা করে সে। কিন্তু নগেনদের সঙ্গে তার লক্ষ্যে মিলছে না। কংগ্রেসের হয়ে জেল-খাটা অসাম্প্রদায়িক আলিমুদ্দিন এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক হিন্দুর মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ দেখে নিজের এতদিনকার মেনে নেওয়া মত পরিবর্তন করেছে। ধীরে ধীরে সে আঁকড়ে ধরেছে মুসলিম লীগের খুঁটি। তার শেষের কথা, "এই তো আমার আজাদ পাকিস্তান। বড়লোকের নয়। গরীব মুসলমানের—গরীব হিন্দুর", কিংবা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আলিমুদ্দিন যখন উত্তমাকে বলে, "...তোমার ভাইফোঁটা নেব আজাদ পাকিস্তানে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ" তখন আমরা উদারনৈতিক লেখককেই খুঁজে পাই।

অসাম্প্রদায়িকতার এবং সংগ্রামী চেতনার মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে 'লালমাটি'তে। বরেন্দ্রভূমির লালমাটিতে বিপ্লবের যে রক্তাক্ত অধ্যায় সংঘটিত হয়ে গেল মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে, তার মধ্যেও ভাববাদের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি শোষিতের মনোভাব অনুভব করেন তীব্রভাবেই। কিন্তু সংগ্রাম ও প্রতিরোধের কথা বললেও নেতৃত্ব তুলে দেন মধ্যবিত্তের হাতে। অথচ নেতৃত্বে থাকা উচিত ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর। তবে তাঁর লেখায় দেখা যায় প্রতিবাদী পক্ষ বাধা বিপত্তিতে হতাশ হয় না, যেহেতু তিনি উদারনৈতিক, আশাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক লেখক।

শেষ পর্যন্ত তাঁর এক কবি চরিত্র সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে লেনিনের আদর্শকে গ্রহণ করে। 'শিলালিপি'র (১৩৬১) রঞ্জনকে প্রথমে দেখা যায় সন্ত্রাসবাদী রূপে। পরে তার উত্তরণ ঘটে মার্কসীয় চিন্তাধারায়। কিন্তু রঞ্জনের মার্কসীয় উত্তরণপর্ব

২০ ॥ 'সাগরিক', (?), পৃ. ৬৪-৬৫।

এই গ্রন্থে দেখানো হয়নি, শুধু প্রতিজ্ঞাটুকু আছে, "এরপর তো একা রঞ্জন আর কোথাও নেই। আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী,···এরপর সে সকলের।" যথেষ্ট ভাবালুতা সত্ত্বেও আত্মসর্বস্ব কবির এমন আত্মমুক্তি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল।

* * *

কংগ্রেস, জনগণ, বিরোধী দল, শত্রু-মিত্র সবাইকে এক উদার সমন্বয়বাদী দৃষ্টিতে দেখেন মনোজ বসু। ১৯১৯-এর পর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় ফাঁসির দড়ি কবিত্বময় হতে দেখেন তিনি। তাঁর 'আগস্ট ১৯৪২'-এ (১৯৪৭) একটি রোমান্টিক প্রেম কাহিনীকে '৪২-এর পটভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে। অসাধারণ, প্রায়-মহাপুরুষ চরিত্র মহীন রায়। মহীনের বাবা ছিল কট্টর সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু বাবার পথটিকে ছেলের মনে হয়েছে ভুল পথ বলে। কেন না সন্ত্রাসবাদীরা ছিল বিচ্ছিন্ন। মহীন গান্ধীবাদী। এই উপন্যাসে 'অগ্নি'র অন্তরার মতো চন্দ্রা আছে। তবে সে কংগ্রেসী এবং শেষ পর্যন্ত তার পরোপকারী ভালোমানুষ হাকিম স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় বাংলার প্রত্যন্ত স্বাধীন অঞ্চল মণিপুরে দেশের জন্য কাজ করবে বলে।

অত্যন্ত অহিংস গান্ধীবাদী মহীনের চেষ্টায় আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় নায়িকা যূথীর বাবা শশিশেখর। আন্দোলনের সময় লোকজন মিলিটারি ছাউনি জ্বালিয়ে দিলে শশিশেখরের গায়ে আগুন লেগে যায়। সে ছিল মিলিটারি ঠিকাদার। এই ছাউনি পোড়ানোর অভিযোগে মহীন ধরা পড়ে। বিচারে তার কিন্তু তেমন কিছু একটা শাস্তি হল না। কারণ প্রমাণাভাব, "লোকে বড্ড ভালবাসে শ্রদ্ধা করে" মহীনকে। লেখকের কাছে সবাই ভালো। তাই 'জাগরী'র নীলুর মতো কোনো সরকারী সাক্ষীও পাওয়া গেল না।

এমন ভালোমানুষ মহীন বিয়ে করল বিবেকহীন শশিশেখরের মেয়ে যূথীকে। যূথীর বাবা হঠাৎ ধনী হয়ে জমিদার সেজে বসেছে। মহীন নিরুপায়। যূথী মহীনের জন্য পাগলিনী প্রায়। বিলুর চেয়ে গুরুতর অপরাধে ধরা পড়েও মহীন কারাগারে খুব একটা মন্দ অবস্থায় ছিল না। কারণ বাসর রাতে রূপসী স্ত্রীকে মহীন বলছে, "গেল মাসের এই সাতাশে জেলের মধ্যে এতক্ষণ কম্বল মাথায় নাক ডাকাচ্ছি। তখন কি জানি, একটা মাস পরে আমার ভাগ্যে"··· এটি যদি হত সদ্য বিবাহিত যুবকের আবেগ মথিত উক্তি তাহলে একটা মানে করা যেত। কিন্তু লেখক তো মহীনকে সেভাবে উপস্থাপিত করেননি!

'৪২-এর আগস্টের অগ্নিরূপ যে বইয়ের সম্ভাব্য উপসংহার হওয়া উচিত ছিল তা না হয়ে উপন্যাস শেষ হল মহীন ও যূথীর প্রসন্ন মিলনে। ঐ সঙ্গে অবশ্য একটা ভবিষ্যৎ চিন্তাও সংযোজিত হয়েছে। লেখক বলেছেন ভবিষ্যতে মহীনরা পৃথিবীর রূপ বদলে দেবে অহিংসা দিয়ে। লেখকের কথায়, "খাণ্ডবদাহী আগুন এরা ঢেকে রেখেছে শ্বেত শুদ্ধ খদ্দরের নিচে। ···আত্মার প্রদীপ্ত আলোয় কোটি

কোটকে এরা উদ্বুদ্ধ করবে গ্রামে গ্রামে। সত্যের আগ্রহে বেয়নেট ভোঁতা করে দেবে।" গান্ধীবাদী অহিংস বলেই নায়ক আগুন লাগিয়ে আবার তার মধ্য থেকে নিজে পুড়ে গিয়েও বাঁচায় শশিশেখরকে। অহিংসার শক্তিকে লেখক অভিহিত করেছেন 'এ্যাটম বোমার চেয়ে ভীষণতর অস্ত্র' হিসেবে। আর এই উপসংহার দিয়েই শেষ করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাসটি। অহিংসা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এটাই যেন বলতে লিখছেন 'আগস্ট ১৯৪২'।

এই প্রসঙ্গে মনোজ বসুর অসামান্য জনপ্রিয় রচনা 'ভুলি নাই' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। লেখক অহিংস গান্ধীবাদী, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে লিখেছেন 'ভুলি নাই' (১৩৫০)। সন্ত্রাসবাদী কুন্তলদের উদ্দেশ্য করে লেখক বলেছেন, "স্বাধীনতার আজ অপরূপ সংজ্ঞা পেয়েছি। পন্থাও নতুনতম। তবু কি ভুলতে পারি?" এই বইয়ের নায়ক কুন্তল সন্ত্রাসবাদী। তার কাজকর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অথচ এটা জানা যাচ্ছে, যে-কোনো রকম অসম্ভব কাজ করতে পারে কুন্তল। দুঃসাহসী নায়কটিকে তার কাজের জন্যই পুলিশ খুঁজছে হন্যে হয়ে। অথচ বনে-জঙ্গলে পালিয়ে থাকা ফেরারী মানুষটিকে পেয়েও পুলিশ ছেড়ে দেয়। কেন না পুলিশ অফিসারটি আবার কুন্তলের এক পরম ভক্তের হবু বর। শেষ পর্যন্ত কুন্তল মারা যায়, তবে ফাঁসিতে নয় যক্ষায়। তার মৃত্যুর ক্ষণটিতে যথোপযুক্ত আবহ সঙ্গীত পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায়। চরম রোমান্টিকতা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কুন্তল। শরৎচন্দ্রের দুই প্রসিদ্ধ নায়ক —দেবদাস ও সব্যসাচীর সংমিশ্রণ ও আদল দেখা যায় তার চরিত্রে। এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আবেগমথিত অতি সংবেদনশীল ভাষা। হাল্কা মেজাজের মেলোড্রামাটিক দারুণ জনপ্রিয় চরিত্রটির মৃত্যুর পরও কাহিনী চলতে থাকে বিভিন্ন জনকে কেন্দ্র করে। অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে একদা সন্ত্রাসবাদী শঙ্কর গ্রামে ফিরেছে এই ঘটনায় শেষ হয়েছে 'ভুলি নাই'। অর্থাৎ সুকৌশলে কুন্তল ও অন্যান্য সন্ত্রাস-বাদীদের গৌরবজনক অধ্যায় লিপিবদ্ধ করার পরে সবার ওপরে শঙ্কর ও তার স্ত্রীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। কুন্তলকে লেখক সৃষ্টি করেছেন সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ইমেজের সাহায্যে, আর শঙ্করকে চিত্রিত করেছেন নিজস্ব কল্পনা ও ভালোবাসা দিয়ে।

এমন ধরনের নির্দ্বন্দ্ব রচনায় শত্রুপক্ষ প্রত্যক্ষে নেই বলে উপন্যাস শক্তিশালী হয় না। শত্রু-মিত্র সবাইকে অহিংস চোখে দেখবার অসুবিধাটা এখানেই। 'ভুলি নাই' আত্মত্যাগীদের কাহিনী। দেশের জন্য প্রাণ নিঃশেষে দানের যে মহিমা তা সুনিপুণ আবেগময় ভাষায় মহিমান্বিত করেছেন লেখক। চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে আবেগ সৃষ্টিতেই তিনি অধিকতর সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক রচনায় কোনো গভীর তত্ত্ব নেই। উভয় গ্রন্থেই স্বাধীনতার জন্য একটা সরল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যদিও স্বাধীনতার অর্থ এখানে ইংরেজ বিতাড়ন। তাঁর সৃষ্ট

চরিত্ররা লঘু ছন্দে, উচ্ছ্বাসভরে আত্মত্যাগ করেছে। হাল্কা মেজাজের সন্ত্রাস-বাদীদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সহজ সরল সজল কাহিনী নিয়ে লেখা 'ভুলি নাই'। রাজনৈতিক নয়, মানবিক গুণের জন্য বইটির এত জনপ্রিয়তা। শঙ্কর নামে যুবকটি জেল খেটে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে এসে গ্রামে ফিরে গেছে। শঙ্কর সন্ত্রাসবাদী থেকে অহিংস সাম্যবাদী হয়েছে। তার অবৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বিশ্বাসের জন্য সে হয়ে দাঁড়ায় উদারনৈতিক গান্ধীবাদী। গভীর তত্ত্ব বা কঠিন কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই বলে মনোজ বসুর জটিলতাহীন লেখার রোমান্টিক আবেদন এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে অত্যন্ত বেশী।

* * *

এই উপমহাদেশে সাম্যবাদী আন্দোলন এগিয়েছে অতীব প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে। সরকারী দমননীতির চেয়েও নিজের দেশের মানুষের বিরোধিতা এড়ানো অনেক বেশী দুঃসাধ্য। আগস্ট আন্দোলনের সময়ে[২১] এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে মার্কসবাদীদের কাজকে যখন দেশের অনেকে সন্দেহের চোখে দেখছেন সেই বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও যে মার্কসবাদী শিল্পী সাহিত্যিকরা

২১॥ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকাশিত 'পার্টি ইতিহাসের রূপরেখা'য় এই ভুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এই সময়ে পার্টি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্যের যথার্থ সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়" (উদ্ধৃত : নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা', ১৯৭৫, পৃ. ২২৬)। এ কথা সত্য যে, কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ একটা সত্যকে হয়তো দেখতে চাননি, তা হচ্ছে উপনিবেশের কম্যুনিস্টদের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্বাভাবিক কারণেই ব্যাহত হয়ে থাকে এবং তা পরাধীনতার কারণেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এ দেশের কম্যুনিস্টদের একাংশ অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরাও বাংলাদেশের জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন নি।

তবে আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আনুগত্যের ও যুদ্ধের সপক্ষে থাকার শর্ত সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকরা যে তাদের বিশ্বাস করত না সে কথাও সত্য। তৎকালীন সরকারী গোপন নথিতে তার বিবরণ আছে, "Communists were playing a double game. On the surface they were anti-fascist and pro-war ; below the surface they were anti-imperial and their demand for arms might have as much relation to the one as to the other of these lines of thought" —৬ই মে, ১৯৪২-এ

সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা স্মরণীয়। তাঁদের সৃজনশীল কর্ম-প্রয়াসে অনেকেই এ সময়ে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ সময়েই আমরা পেয়েছি বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী পার্টি সদস্য লেখকদের। গোপাল হালদার তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন।

১৯৪২-এর আগস্টে কম্যুনিস্টদের ভূমিকার সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছে গোপাল হালদারের অমিত। "অমিত জানে মানুষের ইতিহাসের বক্র-তির্যক পথে আজকার মতো করতালি পাবে না এই অমিতেরা, তবু বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না অমিত"[২২] —এই ছিল আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অমিতের আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য। 'স্বদেশাত্মা'র সঙ্গে 'বিশ্বাত্মা'কে অমিতরা একসঙ্গে দেখতে চেয়েছে। আবেগ-মাখানো উত্তেজনা কিংবা কটু নিন্দার প্রস্রবণ সে দিন অমিতদের সঠিক কল্যাণকামী চেতনাকে কিছুটা বিপর্যস্ত করলেও বিপথগামী করতে পারেনি। পৃথিবীর সমস্ত ফ্যাসিষ্টদের ধ্বংসই ছিল তাদের কাম্য। এ জন্য সরল পথে চলবার উপায় তাদের ছিল না। 'মস্কো' নয় মানুষই ছিল অমিতদের স্বপ্ন। কিন্তু এই অমিতের পরিচয় কি? কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক ঠিকানা? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ভূমিকাই বা কি? অমিতের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে গোপাল হালদারের 'একদা' (১৩৪৬), 'অন্যদিন' (১৯৫০) এবং 'আর একদিন' (১৩৫৮)

বিহারের তৎকালীন গভর্নর স্যার টি. স্টুয়ার্ড এ সন্দেহ প্রকাশ করে-ছিলেন (*Quit India movement*, Editor's Introduction, *op. cit.*, p. 9).

একজন সমালোচক ঐ সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সঠিক কর্তব্য কি হওয়া উচিত ছিল সে বিষয়ে যে যুক্তিসম্মত মন্তব্য করেছেন প্রসঙ্গত সেটাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Shunning its exaggerated apprehension that any such struggle against the British would weaken the war efforts of the Soviet side and hamper its victory in the anti-fascist war, the Party should have organized active struggle for the demand of National Government and that could have enlisted the support of the bulk of the anti-imperialist masses behind the Party's basically correct line" —Sukomal Sen, *Working Class of India*, pp 376-77.

২২॥ গোপাল হালদার, 'আর একদিন', (১৩৫৮), পৃ. ২২১।

নামক ত্রিদিবার অভিজ্ঞতায়। এই তিনটি দিনে অমিতের জীবনের এক একটি পর্ব বিধৃত হয়েছে। এই তিন দিনের সময় সীমা আট থেকে দশ বছর পরে পরে। অমিত প্রাণবান এবং প্রখর মননশক্তি সম্পন্ন পুরুষ। তিনটি পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে শুধু তার চেতনার পরিচয়ই আমরা পাই না, ঐ সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর 'রূপান্তরের আভাস'।[২৩]

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র অমিত। কিছুকাল নিয়োজিত ছিল অধ্যাপনায়। সে জার্নালিস্ট এবং সাহিত্যিক। তার মধ্যে প্রবল শিল্পানুরাগ দেখা যায়। সর্বোপরি অমিত 'intellectual Communist' (একদা, পৃ. ১৬২) এবং আত্মনিবেদিত সাধক (১৬২)। সে মানুষের ইতিহাসের 'পৌরাপর্যে'র মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে সমাজ বিকাশের প্রেক্ষাপটকে। সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টির অধিকারী সে। সে জানে যে, বাণিজ্য-লোভী ধনিকতন্ত্রের পরিণাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, 'মুনাফাই তার প্রাণবায়ু'। মুনাফার জন্য এ দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন, শোষণের শত সহস্র পথ ও কূটকৌশল, যন্ত্রযুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বিধ্বস্ত হওয়া গ্রাম-নির্ভর সভ্যতা —এ সব অমিত জানে। যথাযথভাবেই তার ধারণা হচ্ছে এ হল শিল্প বিপ্লবের সূচনা লগ্ন। কিন্তু পৃথিবীতে এরই পাশাপাশি প্রবল হয়ে উঠেছে সমাজ বিপ্লব। "World Capitalism-এর যুগ নিয়ে এসেছে World slump —বিশ্বজোড়া 'মন্দা', আনছে তাই World Revolutionও—বিশ্ব বিপ্লব" —এই হল অমিতের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয়।

নিজের দেশের কথায় সে ভেবেছে, অগ্রসর যারা তাদের তুলনায় এ দেশের মানুষ ও সমাজ পিছিয়ে থাকলেও সেই বিশ্ব-বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ছে এখানেও। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে একই কাল বা সময়ে দুটো 'যুগ আমরা পাড়ি দেবার প্রয়োজন দেখছি'। এ জন্য এখানকার জীবন হয়ে উঠেছে অস্থির। কারণ এর মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। শাসকদের অন্যায় অত্যাচার এবং শাসনের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা নিয়েই অমিতদের 'জেনারেশন' যুগটা অতিক্রম করছে। "এই জেনারেশনের জীবনে যা কিছু সত্য, যা কিছু নিত্য, তা তাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম-প্রচেষ্টায় ফুটছে। সে প্রয়াস ঠিকমত দেখবার পক্ষে যতটুকু কালের ও স্থানের দূরত্ব থাকা দরকার, আমরা তা এখনও পেতে পারি না। তাই আমরা দেখছি এ সব প্রয়াসের অসঙ্গতি, তার অযৌক্তিকতা, তার প্রবঞ্চনা, তার হাস্যকরতা" (১৭৪) —অমিত নিজের জেনারেশনের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কথাগুলো বলেছে।

'রোমান্টিক অ্যাপীল' সম্বলিত মধ্যবিত্তদের জনগণ-বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাজে

---

২৩ 'একদা', ভূমিকা, পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন, (১৩৪৬)।

অমিতের আস্থা নেই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের আত্মত্যাগের মানসিকতাকে সে অবহেলা করতে পারে না। সন্ত্রাসবাদী সুনীলের জন্য অমিত অর্থ ও আশ্রয় খোঁজে প্রাণপণে। অথচ উপচিকীর্ষু অমিতের ঘরে প্রিয়জনদের সঙ্গে নিত্য মনোমালিন্যের পালা। বাবা-মা'র সঙ্গে নিজের চলাফেরা নিয়ে মান-অভিমান নিত্যনৈমিত্তিক। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব অমিত নেয়নি। তার দেরী করে ঘরে ফেরাও পরিবারে বড় একটা অশান্তির কারণ।

সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কর্মী অমিত। মজুরদের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে এবং লিখে তাদের সচেতন করে তোলে অমিত। অথচ তার পাশাপাশি সুহৃদ, সাতকড়ি, অনুকূলদের মতো অনেক বন্ধু ও সহকর্মী রয়েছে, যারা স্বার্থপরতা দিয়ে ঘেরা বিবেকহীন দুর্গে আপাতত আরাম ও আয়াসে বসবাস করছে। এই স্বার্থ-পরতার বিপরীতে মনীশ, সুনীল, দীনু, যুগল, মোতাহের, অমিতদের 'আত্মদান' ছিল মহৎ ও নিঃস্বার্থ।

মানুষের মহিমা এবং এ দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে একদা অমিত পথে পা বাড়িয়েছিল। তার ধারণা স্বাধীনতার জন্য দরকার সকলের সম্মিলিত আয়োজন; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত মোর্চা গঠিত হলে স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থপূর্ণ হবে। 'একদা'র অভিজ্ঞতা নিয়ে ছয় বছর জেল খেটে অমিত উপস্থিত হয়েছে 'অন্যদিন'-এ। 'অন্যদিন'-এর অমিত দেখে স্বাধীনতা আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা। অমিত কিন্তু কোনো বিশেষ দলে নাম লেখায়নি। 'ইজম'-এর বুলি বাইরের কাজে প্রমাণিত না করে শুধু দলানুবর্তিতা দেখানোতে সে বিশ্বাসী নয়। অমিত কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা না করে কোনো মত-বাদের কাছে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করবে না। কেন না রাজনীতি অমিতের 'ক্যারিয়ার' নয়, এ তার দায়িত্ব।

অমিতের বিদ্যাবুদ্ধি মননশীলতা তাকে বিত্তবৈভব, সৌভাগ্য কোনোটাই এনে দেয়নি। বাবার স্বপ্ন, মায়ের আশা সব কিছু চূর্ণ করে সে কাজ করে বন্যা-দুর্ভিক্ষের দুর্গতদের মধ্যে, মজুরদের এলাকায়। গ্রন্থপ্রচার এবং সম্পাদনা ছাড়াও সভাসমিতিতে যাতয়াত করে। তার ছোটবোন অনুর স্বামী শ্যামল অমিতের সঙ্গেই থাকে। শ্যামল কম্যুনিস্ট পার্টির শাখার সেক্রেটারী। তাদের ফ্ল্যাটে কম্যুনিস্ট পার্টির সভা হওয়ার অভিযোগে আবার ধরা পড়ে অমিত। এবার 'আর একদিন'-এর পর্ব। কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। অথচ স্বাধীন ভারতের নাগরিক এরা সবাই, যারা ধরেছে তারা, যাদের ধরা হচ্ছে তারাও।

এর আগেও দীর্ঘকাল কারাবাসের পর অমিত ন'বছর হল জেলের বাইরে কাজ করছে। আবার ১৯৪৮-এর নিরাপত্তা আইনের আওতায় মধ্যরাত্রিতে শুরু হল বন্দী জীবন। পুলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সব রকম কর্মীকে ছেঁকে তুলে

এনেছে কলকাতার গোয়েন্দা অফিসের প্রায়ান্ধকার গৃহতলে। বন্দীদের প্রাণ চাঞ্চল্যে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ সজীব হয়ে ওঠে।

অমিত এখানে বিগত দিনগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখে। এই দশকে সে কৃষক এবং শ্রমজীবীদের প্রবলভাবে সচেতন হতে দেখেছে। তার মতে বিগত একশ' বছর ধরে 'শেষ যুদ্ধ' চলছে, এবং "শেষ যুদ্ধ হলেও ডিসাইসিভ অ্যাক্‌শান-এর দেরি হতে পারে" (২০৮)। এখন হয় ক্ষমতা অধিকার করতে হবে, নয় তো শক্তি হিসেবে তাদের নগণ্য হয়ে যেতে হবে। দাঙ্গা ও দেশ বিভাগে অমিত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল অমিতদের ব্রত। সে জন্য একটা জেনারেশানকে উৎসর্গ করতে হয়েছে। অমিত ভাবছে এবার নিতে হবে অন্য ব্রত—'স্বাধীনতা নয়, এবার মানুষ গড়া' (২১১)। হয়তো এর জন্য দরকার আরও আত্মত্যাগ। শ্রেণী-সংগ্রাম শেষে হবে মানুষের নতুন জন্ম—শেষ যুদ্ধ। মজুর, চাষীরা এবার দেখছে শেষ যুদ্ধের নতুন রূপ।

অমিত, জ্যোতির্ময়, সৈয়দ আলীদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে তেজী শ্রমিক বুলকন, সাহসী কৃষক কানাই। লড়েছে এরা প্রাণপণে। সবাই এসেছে এবার কারাগারে। সঙ্গে এসেছে আরও অনেক নতুন অল্প বয়সী প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা কর্মী। এদের মধ্যে রয়েছে অমিতের অকাল প্রয়াত সহোদরা স্বরের মেয়ে মঞ্জু। মঞ্জু নারী-মুক্তির প্রতীকও বটে। নারী-মুক্তির সমস্যাটা এতকাল খুব জটিল বলেই মনে হয়েছে অমিতের কাছে। নিজের বোন স্বরকে তার বিষাক্ত বিবাহিতা জীবনে তিলে তিলে ক্ষয় হতে দেখেছে অমিত। স্বরের পরিণতি দেখে অমিতের অনুভূতি এমন হয়েছিল, "দেখিতে পাইয়াছিল এ দেশের সমস্ত বন্দিনী নারী—জীবনের বহু বহু শতাব্দী জোড়া ইতিহাসের একটি ছত্র। সেই ইতিহাস অমিতের কত পরিচিত। কত গৃহে না সে দেখিয়াছে—কত চকিতে দেখা বেদনাতুর নারী-মুখ, কত অবসন্ন, ক্লান্ত নারী-দেহ, আবার কত সালঙ্কারা শৃঙ্খলা-গর্বিতা ফ্যাশান-সর্বস্বার দম্ভেও এই ইতিহাস অমিত পাঠ করিয়াছে" ('অন্য একদিন', পৃ. ৫০)।

স্বরের অকাল মৃত্যুর পর তার স্বামী আবার বিয়ে করেছে। বাবা ও বিমাতার কঠোর শাসনেও মঞ্জু বিচলিত হয়নি। মঞ্জু তার মামা অমিতের আদর্শকেই বেছে নিয়েছে। সে তার মামাকে বলছে, "মা বরাবর বলতেন দুটি কথা—'আমাদের মেয়েদের দিয়ে কিছু হবে না।' আর তাঁর মুখে শুনতাম—তোমরা নাকি মস্ত বড় কাজ করছ। ঠিক করেছিলাম—মাকে দেখাব সে কাজ মেয়েরাও পারে" (৭২)। মঞ্জুর এই স্পর্ধিত আত্মপ্রত্যয় অমিতকে নতুন আশ্বাস দেয়। বাংলাদেশের চাষীর ঘরের মেয়েরা, শ্রমিক মেয়েরা তাদের নির্যাতিত নারী-জীবনের মধ্যে থেকেও বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে কথাও অমিত জেনেছে। "আগামী দিনের কোন মুক্ত, আত্ম-মর্যাদাময় নারী

জীবনের প্রথম উদ্বোধন" (১৪৩) ঘটিয়েছে ঐ সব রমণীরা। মঞ্জু কত সহজে ও নির্ভয়ে জীবনসঙ্গী রূপে বেছে নেয় পঙ্গু বিজয়কে। 'ইতিহাসের চরম দায়িত্ব —বিপ্লব' —কথাটা মঞ্জু মানে এবং এ দায়িত্ব সে পালন করবে অকুতোভয়ে ও দৃঢ়তার সঙ্গে। ঐ বিশ্বাস এবং আস্থা অমিতের মনেও জাগে। নিপীড়িতদের জন্য সমাজ পরিবর্তনের গুরু দায়িত্বের সঙ্গে কম্যুনিস্ট মঞ্জু নিজেও অর্জন করে নিচ্ছে নিজের মুক্তি —নারীর মুক্তি। একই সংগ্রামে দুটোই অর্জিত হবে তার।

অবশেষে অমিত খুঁজে পায় তার সঠিক পরিচয়। সে পরিচয়টা কী ? অমিত উপলব্ধি করে তার পরিচয় "···আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেম-মণ্ডিত গৃহ-রচনায়; ধ্যান-সুন্দর, প্রীতি-সুন্দর গোষ্ঠী-রচনায়; একান্তে বসিয়া আত্মরচনায়" (২৪৬-৪৭)। 'জন সমাজের জীবনের সঙ্গে' এবং মানুষের 'মহাভিযানে'র মধ্যে মিশে গিয়ে অমিত 'সম্পূর্ণ' (২৪৭)। স্বাধীনতা, মানবতা, জীবনের পথ, সৃষ্টির পথ, সবই চলেছে একই লক্ষ্যে —সে লক্ষ্য হচ্ছে মিলিত মানবজাতি। সব পথের শেষে অমিত দেখতে পাচ্ছে সম্মিলিত ও নির্ভীক মানুষকে।

গোপাল হালদার মননশীল লেখক। ঔপন্যাসিকের চেয়ে প্রাবন্ধিক রূপে তিনি অধিকতর প্রখ্যাত। তাঁর উপন্যাসের আবেদন বুদ্ধির কাছে —হৃদয়ের কাছে নয়। নিজের কারাস্মৃতি নিয়ে লেখক অমিতকে সৃষ্টি করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন অমিতকে। কম্যুনিস্ট দলের সদস্য রূপে গোপাল হালদার কৃষক মজুরদের মধ্যে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। আত্মজীবনীর ভঙ্গীতে লেখা এবং আত্মকথনের প্রচুর ব্যবহারে ভরপুর এই উপন্যাস ত্রয়ীর নায়ক অমিতের মধ্যে কিন্তু আমরা তার বিশ্বাসযোগ্য শক্তিশালী কর্মী পুরুষকে পাই না। অমিতের প্রত্যয় তার কর্মে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। এর একটা বড় কারণ অমিত আত্মত্যাগী কিন্তু আত্মবিস্মৃত নয়। নিজের চোখে নিজেকে দেখা ও বিশ্লেষণ করার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা থাকলেও একটা ফাঁকির সম্ভাবনা থেকে যায়। বহুগুণসম্পন্ন, প্রায় দোষত্রুটিহীন অমিত অতিমানবে পরিণত হয়েছে।

একজনের দৃষ্টি ও অনুভূতি দিয়ে সবাইকে যাচাই করার মধ্যেও একদেশদর্শিতা ঘটে। উপন্যাসে ব্যবহৃত আত্মকথনের রীতির ফলে 'কর্মই জীবন' মতবাদে বিশ্বাসী অমিতের কর্মযোগ দেখানোর তেমন সুযোগ ঘটেনি। সে অন্তর্মুখী, রচনারীতির কারণেই সম্ভবত এমন ঘটেছে। ফলে অমিতকে 'একদা' উপন্যাসেই সজীব মনে হয়। এই খণ্ডে সে অন্যদের জন্য কাজকর্ম করার প্রয়াসে এবং নিজের একটা পরিচয় খুঁজে বের করার আকুতির কারণে স্বাভাবিক ও সহানুভূতিশীল চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরের দু'খণ্ডে সে লেখক আরোপিত আদর্শায়িত চরিত্র হয়ে উঠেছে। এতে তার স্বাভাবিকতা অনেকটা ব্যাহত

হয়েছে। অমিত সংগ্রামী, কিন্তু এই সংগ্রামশীলতা তার চিন্তায় দেখা দিলেও কাজে তেমন প্রত্যক্ষ হয়নি। ফলে তার মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা অনেকটা প্রচারধর্মী। অমিত যতটা ভাবুক, ততটা কর্মী নয়। আর এখানেই মানিকের সংগ্রামী চরিত্রগুলির সঙ্গে তার পার্থক্য। মানিকের কারাগারের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর চরিত্ররা সরাসরি সংগ্রামে নেমে পড়ে। অমিতের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধিৎসা তার চরিত্রটিকে সহজবোধ্য হতে দেয়নি। অনেক সময় বিচ্ছিন্নতা-বিরোধী অমিতকে বিচ্ছিন্নও মনে হয়। আর এখানেই মার্কসবাদী অমিতের চারিত্রিক দুর্বলতা। চিন্তাধারায় সে মার্কসীয়, কিন্তু আচরণে কোথাও কোথাও সে আত্মসচেতন বুর্জোয়া। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ অমিত বারবার নিজের ব্যক্তিজীবনের আলোতেই সব কিছু যাচাই করছে। লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন অমিত মধ্যবিত্ত এ দেশীয় কম্যুনিস্টদের একাংশের দুর্বলতা উন্মোচিত করছে। তার আত্মপ্রেমের ঝোঁকটা এসেছে শ্রেণীচ্যুতির অসম্পূর্ণতা থেকেই। সংগ্রাম বলতে অমিত যেন কারাগারে যাওয়াকেই বোঝাতে চেয়েছে —অন্তত তার কাজকর্মে এমন ধারণা হওয়াটা অমূলক নয়।

দেখা যাচ্ছে আলোচিত উপন্যাস সমূহে আমরা স্পষ্টতই দু'ধরনের বক্তব্য পাচ্ছি—কংগ্রেসী এবং কম্যুনিস্ট। উল্লেখযোগ্য যে, তারাশঙ্করের সাম্যবাদী ভাবনা-চিন্তার ফসল 'মন্বন্তর'ও এই সময়ের রচনা। হাল্কা মেজাজের লেখক মনোজ বসুকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে সতীনাথ এবং বনফুল উভয়েই কম্যুনিস্ট বিদ্বেষ প্রচার করেছে। তাঁদের দু'জনের বক্তব্য ধারালো এবং জোরালো। ভাববাদিতার কারণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভাববাদী-সাম্যবাদী মতবাদ এবং সমাধান দিয়েছেন। গোপাল হালদার মার্কসবাদী, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট অমিত যে আত্মপরিচয় নিয়ে যা অন্বেষণ করেছে তেমন অন্বেষণে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিতা রক্ষিত হয়নি। মানিকের সৃষ্ট রাজনৈতিক চরিত্রবা যতটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, গোপাল হালদারের চরিত্ররা তেমন সজীব হতে পারেনি। গোপাল হালদারের অধিকাংশ চরিত্রই আত্মসচেতন, ফলে তাদের আত্মপ্রেমিক ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। মানিক ধাবালো বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তাঁর চরিত্রদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন, তার চরিত্ররা ভাবে কম, কাজ করে বেশী। গোপাল হালদারেব অমিতেব একটি প্রধান সার্থকতা এখানে যে, সে নিজেব আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে তাব আদর্শ ও বিশ্বাস পৌছাতে পেরেছে। অনু, শ্যামল এবং মঞ্জু —তিন জনেই অমিতের সহপথিক।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, আমরা 'জাগরী'তে দেখি দল বেঁধে কংগ্রেসীরা কারাগারে এসেছে (মাত্র একজন বা দু'জন কম্যুনিস্ট বন্দী বাদে)। সেটা ছিল আগস্ট আন্দোলনের সময়। দেশ ছিল তখন পরাধীন।

গোপাল হালদারের 'আর একদিন'-এ ঠিক বিপরীত চিত্র পাই। এখানে অসংখ্য কম্যুনিস্ট কর্মী স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হচ্ছে। কংগ্রেসী আন্দোলনই স্বাধীন ভারতের শেষ কথা নয়— মুক্তি ও স্বাধীনতা যে একটি ক্রম-সম্প্রসারণশীল দিগন্ত এ কথা যেন 'আর এক দিন'-এর কম্যুনিস্টরা তুলে ধরে।

কংগ্রেসী কুৎসা, বিরোধিতা এবং নিপীড়ন কম্যুনিস্টদের পথে অনেক কাঁটা ছড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু বড একটা বাধা ছিল কম্যুনিস্টদের নিজেদের মধ্যেই। সঠিক পার্টিগত নির্দেশ পায়নি অমিতরা। দলানুবর্তিতায় তাকে দেখা যায় একেবারে শেষের দিকে কিন্তু সেখানেও দলের অস্তিত্ব অস্পষ্ট। নিজের শেষ পরিচয়ে অমিত একজন intellectual communist। কিন্তু একজন intellectual communist এবং একজন ভাববাদীর মধ্যে ব্যবধান আকাশ পাতালের নয়। মার্কসবাদ যে কেবল চিন্তার ব্যাপার নয়, আচরণেরও ব্যাপার এই সত্য অমিতের রাজনৈতিক কর্মের সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রতিফলিত। তারাশঙ্করের গান্ধীবাদী কম্যুনিস্ট বিজয়দা বা 'জাগরী'র কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট বিলু পাঠকের কাছে একটি স্বাভাবিক আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, কেন না গান্ধীবাদ ও কংগ্রেস দুটোই পাঠকদের পূর্ব পরিচিত! কিন্তু অমিতের কম্যুনিস্ট পার্টি সেটা পারে না, কারণ পার্টির কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে সুপরিচিত নয়। দ্বিতীয়ত ভাববাদের ঐতিহ্যটিও অতিশয় পুরাতন এবং অতি পরিচিত। মার্কসবাদ সেই তুলনায় নতুন আগন্তুক এবং পূর্ব পরিচয়বিহীন। গোপাল হালদারের উপন্যাসে রয়েছে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতার ব্যাখ্যা, যদিও আত্মসচেতন নায়ক আত্মসচেতন উপায়ে সেই দুর্বলতা তুলে ধরেছে। অন্যদিকে 'জাগরী' ও 'অগ্নি' যেন কম্যুনিস্টদের ওপর এই উপমহাদেশের শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণের হিংস্রতার দলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব বাংলার উপন্যাস

পূর্ব বাংলার উপন্যাস সমূহের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। এই ইতিহাস যতটা আঞ্চলিক তার চেয়ে বেশী কালগত। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্বেই এই ইতিহাসের সূত্রপাত এবং ভিন্নপক্ষে আবার এই ইতিহাসের কারণেই প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। তাই পূর্ব বাংলার (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের) উপন্যাসের আলোচনায় আসবার প্রস্তুতি হিসাবে তার পটভূমিটি বিবেচনা করতে হবে। এই পটভূমি একাধারে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক।

১৯০৫-১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ—এই সময়টুকু মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারণের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমান প্রত্যক্ষ রাজনীতির বিষয়ে উদাসীন ছিল, কারণ এরা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা জনিত সচেতন মানসিকতার অধিকারী হবার পর্যাপ্ত সুবিধা পায়নি। অবিভক্ত বাংলার মুসলমানরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অর্থনৈতিক পশ্চাদবর্তিতা ও বিরূপ প্রতিবেশের দরুন হিন্দুদের তুলনায় পড়ে রইল বিস্তর পিছনে। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানদের ওপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশের কঠোর অনুশাসন। ইংরেজ আগমনের পর থেকেই ভারতীয় মুসলমান তাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদীক্ষা থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, ততোধিক দূরবর্তী রয়ে গেল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে। ব্রিটিশ শাসকরা এটাই চেয়েছিল।[১]

গোটা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষাংশ পর্যন্ত মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসকের বিপক্ষ বিবেচনায় তাদের বিরূপ মনোভাবের শিকার হয়ে রইল। ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী যখন তাদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, মুসলমান সমাজ সে সময় প্রায় বুদ্ধিজীবীশূন্য শতাব্দী অতিক্রম করল যার কুফল আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। অবশ্য ১৮৬০ সালের পর বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফের এবং

১ ॥ "For a long time, the British did everything in their power to curb Muslim intelligentsia and undermine their influence in every sphere of life..." Humayun Kabir, *Muslim Politics*, (1969), p. 15.

উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের ইংরেজ প্রভুর সঙ্গে আপসকামী আন্দোলন ও প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়। সমাজ নেতাদের আন্দোলনে, সরকারী শিক্ষানীতির আপেক্ষিক উদারতার সুযোগে, নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য অর্জিত হওয়াতে অনেক মুসলমান পরিবারের ছেলেরা শিক্ষাগ্রহণে তৎপর হল।[২] শিক্ষিত মুসলমান এবং বুদ্ধিজীবীর হার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করল, যদিও তা হিন্দুদের তুলনায় নগণ্য। এই শিক্ষিত মুসলমান জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই দেখল প্রাগ্রসর ও উদ্দীপ্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু তার প্রতিযোগী।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের ইংরেজ-শাসক ১৯০৫ সালে আবার বিশেষভাবে বিচলিত হয়। বাংলার শাসন-ব্যবস্থা সুচারু রূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকা বিভক্তিকরণের প্রস্তাব সরকারী মহলে ১৮৯১ সাল থেকেই উঠেছিল।[৩] ১৯০১ এবং ১৯০৩ সালেও অনুরূপ প্রস্তাব সরকারী মহলে আলোচিত ও বিবেচিত হতে থাকে, এবং এ খবর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট মতামত গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভক্তিকরণ বিষয়ে আলোচনা ব্যর্থ হলে লর্ড কার্জন স্বয়ং ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহে বিভিন্ন সভার মাধ্যমে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বঙ্গভঙ্গের উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।[৪]

১৯০৫ সালে এল বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ। প্রশাসনিক উপযোগিতা হয়তো বঙ্গভঙ্গের একটি কারণ হতে পারে কিন্তু বাঙালী হিন্দুর ক্রমবর্ধমান সচেতনতাই যে ছিল বঙ্গভঙ্গের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও একতা দানা বেঁধে উঠছিল, ব্রিটিশ শাসক সেই একতাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করাল সদ্য জাগতে শুরু হওয়া অনুগৃহীত মুসলমানদের।[৫] অনুগৃহীত শ্রেণীর মুসলমানদের মুখপাত্র নবাব সলিমুল্লাহ্ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর হলেন। বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে আন্দোলন

২॥ আনিসুজ্জামান, "মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য", (ঢাকা, ১৯৬৪), পৃ. ৯৭।

৩॥ *Struggle For Freedom*, ed. R. C. Majumdar, (Bombay 1969), p. 17.

৪॥ *Ibid*, p. 19.

৫॥ *Ibid*, p. 25.

প্রথমে সীমিত এলাকা —ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভাব ফেলেছিল। অপর পক্ষে হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলন যা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তার আবরণ ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের। তথাপি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদারনৈতিক হিন্দু নেতা, কর্মী এবং সাহিত্যিকদের ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান ও বুদ্ধিজীবী স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে থাকেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এ সময়ে হিন্দুদের অগ্রগামী প্রয়াস লক্ষণীয়। কিন্তু ঐ উদ্যোগের অন্তর্নিহিত ফাঁকি ও কৃত্রিমতা হিন্দু-মুসলমানের কোনো দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধ সূত্র রচনা করতে পারেনি। স্বাদেশিকতার সঙ্গে হিন্দুত্ববোধ এবং হিন্দুদের স্বার্থ-সংরক্ষণ চেতনা প্রবল হওয়াতে অধিকাংশ মুসলমান স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকল।[৬] হিন্দু রাজকর্মচারী এবং অন্যান্য জীবিকায় রত উপার্জনশীল ব্যক্তিবর্গ থাকত কলকাতায়। অথচ এদের জমিজমা সংক্রান্ত দ্বিতীয় অর্থকরী দিকটি ছিল পূর্ববঙ্গে। বঙ্গভঙ্গে হিন্দুদের আর্থিক ও মানসিক আভিজাত্যে আঘাত লাগলে তারা ইংরেজ সরকারকে তাদের বিরূপ মনোভাব জানাতে তৎপর হয়। সরকারের একদেশদর্শী মৌখিক সহানুভূতির বর্ষণে এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানদের সভাসমিতি ও প্রচারে খুব স্বাভাবিকভাবেই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে সুনজরে দেখতে পারল না।

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে নবাব সলিমুল্লাহ্ ঢাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতীয় মুসলমান নেতারা সে সময় ঢাকায় মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করতে এসেছিলেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। ইংরেজ সরকারের আনুগত্য, ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থসংরক্ষণের প্রস্তাব এ সভায় গৃহীত হয়।[৭] এই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন জ্ঞাপন এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জনের নিন্দা করা হয়। এর আগে ১লা অক্টোবর, ১৯০৬ সালে আগা খাঁর নেতৃত্বে উক্ত সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিমলায় তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চাকুরি, নির্বাচন এবং শাসনক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণের আবেদন করেন।[৮] মুসলমান প্রতিনিধি দলের সম্পর্কে লর্ড মিণ্টো কিছু দিন পর ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৬ সালে স্যার আর্থার গডলেকে লিখেছিলেন, "...They have been most fortunate and have really

৬॥ A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism* (Bombay, 1966), p. 360.

৭॥ Stanley Wolpert, *op. cit.*, p. 188.

৮॥ *Select Documents on the History of India and Pakistan*, Vol. IV, ed. C. H. Philips, (London, 1962), pp. 190-93.

done much to save the position, for as you say, they will be a useful reminder to the people of England that the Bengali is not everybody in India, in fact the Mohammedan Community, when roused, would be a much stronger and dengerous factor to deal with than the Bengalis".[৯]

রাজভক্ত অভিজাত মুসলমানদের প্রতি রাজকীয় করুণা বর্ষিত হল ১৯০৯ সালের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দানের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা দেখল যে, মুসলমানরা ইংরেজানুগত্যের বাঞ্ছিত পথ ধরে চলতে চাচ্ছে না। একজন গবেষক দেখিয়েছেন যে তদানীন্তন ভাইসরয় "···was rudely awakened to find that the minority whose claims he had sponsored repaid him with neither loyalty, nor gratitude, but, having grown to political maturity, naturally followed the path of its Congress sibling in gravitating toward the political power focus of empire at Whitehall".[১০]

আসলে ব্রিটিশ রাজের প্রধান সমস্যাটি ছিল 'divide and rule' নয়, বরং হওয়া উচিত ছিল 'how to rule a divided India'[১১]। উভয় সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে বাংলার তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার এণ্ডরু ফ্রেজার (১৯০৩-১৯০৮) সম্ভবত সচেতন হয়েই ভারত সচিব মর্লেকে লেখেন, "···policy of 'Divide et impera' is one which, in my judgement, is entirely inconsistent with the principles of our policy in India···it is utterly wrong to set one class against another, or to lean upon one class for the sake of repression another"[১২] —কিন্তু স্বাতন্ত্র্যমুখী স্রোতের আঘাতে উভয় সম্প্রদায়ের অপ্রতিরোধ্য বিদারণ-রেখা তখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রধানত অবাঙালী মুসলমানদের নেতৃত্বে সংঘটিত হলেও বঙ্গভঙ্গ সমর্থক আন্দোলনের প্রভাব বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। আবার স্বদেশী আন্দোলনের পরিচালকরা ছিল 'চরমপন্থী' বুর্জোয়াবাদী শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণী।

৯ ॥ *Ibid*, p. 194.

১০ ॥ Stanely Wolpert, *op. cit.*, pp. 198-99.

১১ ॥ *Ibid*, p. 191.

১২ ॥ A. H. I. Fraser's note to John Morley, March 25, 1907. —Quoted in Stanely Wolpert, p. 34.

এরা হিন্দু বুর্জোয়া-শ্রেণী এবং হিন্দু তালুকদার গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। "বিভিন্ন কারণে ইহারা পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ, ও ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাচীন সনাতন হিন্দু ধর্মকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।"[১৩] প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলে স্বদেশী আন্দোলনের যে আংশিক কার্যক্রম গণমুখী হতে চেষ্টা করেছিল তার শক্তি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে এবং "বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনসাধারণ এই জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যায়।"[১৪]

বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দুই সম্প্রদায়ের বিপরীত আচরণ দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান দিনটিকে আনন্দ উল্লাসে বরণ করে।[১৫] হিন্দুদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। নতুন প্রদেশের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐ দিনে ভাইসরয়ের কাছে শুভেচ্ছা সহ এক তারবার্তা পাঠান হয়। ভারত সচিবের কাছেও প্রেরিত স্মারকলিপিতে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করে বলা হয়, বঙ্গভঙ্গ রদ করা প্রসঙ্গে তাদের ভীতির কথা। কারণ বঙ্গভঙ্গের পরই তারা অনাদৃত পূর্ববঙ্গে এই প্রথম বহুমুখী স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা ভোগ করতে পারছে।[১৬] পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক মুসলমান। নিম্ন-বর্ণের হিন্দু ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর দূরত্বও মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের দূরত্বের মতোই ছিল। এর ওপর উনিশ শতকের ফারাজী, ওহাবীর মতো ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন গ্রামবাংলায় এক বিশেষ আঞ্চলিক কাঠামো পেয়েছিল। মূলত ধর্মের আধ্যাত্মিক আচ্ছাদনে সংঘটিত হলেও প্রায়ই এতে যুক্ত হয়েছে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক উপাদান সমূহ।

শতাব্দীর শেষে এই ধর্মীয় আন্দোলনের তীব্রতা বহুল পরিমাণে লোপ পেলেও গ্রামবাসী মুসলমানদের মনে তা প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়। সরকারের অনুগৃহীত মুসলমান জমিদার, ব্যবসায়ী, ধনী এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম তাদের দীর্ঘ দিনের জাড্য ত্যাগ করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সচেতন হল। জমিদার, তালুকদার অধিকাংশই হিন্দু হওয়াতে অত্যাচারিত, অবহেলিত মুসলমান কৃষক হিন্দু ও কিছুসংখ্যক মুসলমান নিয়ে সংগঠিত স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে থাকবে না এটাই ছিল স্বাভাবিক। 'স্বদেশী'দের বয়কট, বিলাতী

বর্জন এবং হিন্দুয়ানীকে উপলক্ষ্য করে মুসলমান নেতারা হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করবার প্রচার কাজে নামলেন।

"মুসলমানদের জাগরণ, হিন্দুদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি"—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৯শে মার্চ, ১৯০৭ সালে একজন সরকারী কর্মচারী যে রায় দেয় তা অযথার্থ নয়।[১৭] বগুড়া গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "মুসলমানদের মধ্যে যে একটা জনমত গড়ে উঠছে এটা নবসৃষ্ট প্রদেশের জন্য সম্ভব হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আপন সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য উদ্যমী হয়েছেন।"[১৮]

১৯০৭ সালে জামালপুরে কৃষক-বিদ্রোহের দৃষ্টান্তটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলনের ফলেই জমিদার, মহাজন এবং পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করবার সাহস খুঁজে পেয়েছিল।[১৯] অথচ এই দরিদ্র কৃষকদের অভ্যুত্থানকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা রূপে গণ্য করে সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা অরবিন্দ ঘোষ জামালপুরের হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য একদল বিপ্লবীর হাতে তিনটি বোমা পাঠিয়েছিলেন, এই বোমা তিনটির নামকরণ করা হয়েছিল 'কালীমায়ের বোমা'।[২০] এমন ঘটনায় একশ্রেণীর হিন্দু নেতাদের মানসিকতা স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, এই মানসিকতাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ববোধ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। অধ্যাপক ক্যান্টওয়েল স্মিথ তাঁর একটি গ্রন্থে জামালপুরের ঐ কৃষক অভ্যুত্থান এবং ভারতে সংঘটিত আরও কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, "...**All careful observers, even when British and conservative, recognize that this disturbing factor is economic. In fact (as in the pre-British period), communal riots have been isolated instances of class struggles fought in communal guise**"[২১]

নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়নি। হিন্দু জমিদাররা, জমির মালিকরা এবং সেই সঙ্গে দু'একজন মুসমলমান জমিদার চাচ্ছিলেন

---

১৭ ॥ *Ibid*, p. 273. ff.

১৮ ॥ *Ibid*, p. 273.

১৯ ॥ সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

২০ ॥ ঐ, পৃ. ২৮৫।

২১ ॥ **Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India*, (Lahore, 1963), p. 194.**

জমিদারী প্রথা অটুট রেখে এবং তার কাঠামোর মধ্যেই স্বদেশী শিল্প গড়ে উঠুক। অবশ্য এমন দ্বিমুখী ধারণার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ। ১৯০৬ সালে ১৬ই জানুয়ারী বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নতুন ভাইসরয়কে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় তাতে ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী হয়েছে এ কথা বলা হয় যদিও উক্ত অভিনন্দন পত্রে তীব্রভাষায় বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করা হয়।

১৯০৯ সালে ইংরেজ পশ্চাদ্‌পদ মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্প্রদায়-ভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দিয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার শাসনতান্ত্রিক পথটির সন্ধান দিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রহিত হল। এ আন্দোলন বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ ও প্রায়-সার্থক আন্দোলন। সার্থক এ জন্য যে, আন্দোলনের ফলে উক্ত শ্রেণীর ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় এবং সর্বোপরি এই আন্দোলনের চেতনাকে ভিত্তি করে অসহযোগ আন্দোলনের পথ সুগম হয়। স্বদেশী কর্মকাণ্ডে গঠনমূলক কাজের অভাব ছিল। ফলে সন্ত্রাসবাদী তরুণ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব দুই-ই সৃষ্টি হল এ সময়ে। পিছিয়ে-পড়া মুসলমান হঠাৎ-পাওয়া রাজানুগ্রহের আশায় কোনো প্রগতিশীল কাজ বা ভাবনা দেখাল না। মধ্যবিত্ত মুসলমানের কাযক্রম ও চিন্তাধারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনাকালীন সময়ের মতো ছিল, অর্থাৎ লক্ষ্য ছিল ইংরেজের কৃপাদৃষ্টিতে নিজেদের যথাসাধ্য সুবিধা আদায় করে নেওয়া।

বঙ্গভঙ্গ রহিত হবার ফলে বাংলার মুসলমানদের সে সময়কার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছিলেন লর্ড কার্জন। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ সালে হাউজ অব লর্ডস-এ প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, "...I think the position of the Mohomedans in Eastern Bengal is one of the saddest features of the present situation. For six years or more they have held aloof from agitation and have occupied themselves with building up their province. Dacca, the Capital, had started upon a new life ; they looked forward to having a University and High Court there ; over and over again they have been loyal to the Government and have been assured by the officers of Government that the thing was a settled fact and was going to remain. Now the policy is reversed. No wonder they feel bitter,". (Quoted in Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, p. 304)।

শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি —তিন দিক থেকেই মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে দুর্বল ছিল। প্রথম কয়েক বছর মুসলিম লীগের ধরনটা ছিল —"digni-

fied debating club"[২২]-এর মতো। এক সময়ে নিজেদের তুলনায় বলিষ্ঠতর রাজনীতিতে লিপ্ত কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফৎ উপলক্ষ্যে যোগ দিয়ে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হল। গ্রাম ও মফস্বলে মধ্যস্বত্ব-ভোগী মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাতেও তাদের প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষণই পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমান নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে এইসব নিপীড়িত চাষীদের সহজেই নিজেদের নেতৃত্বাধীনে টেনে আনতে পেরেছিল। ঐ সব কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগঠিত হতে পারেনি। এর জন্য দরিদ্র জনসাধারণের যুগ যুগান্তরের পশ্চাদ্‌পদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান দায়ী। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পার হয়ে এদের উত্তরণ ঘটেনি নিজস্ব শ্রেণীর জন্য গড়ে ওঠা সংগঠনে।

অপর দিকে হিন্দুসমাজ ও তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলমান সন্দিহান ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শতাব্দী ব্যাপী অনাস্থা, মুসলমানদের নিদারুণ সঙ্কটময় অস্তিত্ব এবং পশ্চাতে থেকেও এগিয়ে গিয়ে হিন্দু প্রতিযোগীর সমকক্ষ হবার বাসনায় শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, ক্ষীণস্বাস্থ্য মুসলমানদের জন্য ধর্মাশ্রিত রাজনীতির পথটাই বিশেষ করে উন্মুক্ত হল। ধর্মীয় আবেদনে ভোট পাবার পথ সুগম হল। লাখনৌ চুক্তি, বেঙ্গল প্যাক্ট অথবা খিলাফৎ আন্দোলনের সাময়িক সন্ধি ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের একসঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ আর রইল না।[২৩]

ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের তথাকথিত প্রগতিশীল ধারা শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ ধরে অগ্রসর হল।

২২ ॥ Humayun Kabir, *op. cit.* p. 18.

২৩ ॥ এ সম্পর্কে গোখলে অত্যন্ত বাস্তব মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৯ সালের স্বতন্ত্র নির্বাচনের সাম্প্রদায়িক ভিত্তির সমর্থনে তিনি বলেছিলেন যে, হয়তো ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ঐক্যে এমন স্বতন্ত্র নির্বাচন উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ফাটল ধরাবে, কিন্তু তাঁর মতে, "We cannot pretend such union, however desirable, exists ; moreover unless by special separate treatment soreness in minds of minorities is removed real union will be retarded ; the matter must be looked at in a large way and practical spirit", —Quoted in Stanely Wolpert, *op. cit.*, p. 196.

নেতৃত্ব রইল মধ্যবিত্তের হাতে। কারণ কংগ্রেস ও লীগ নেতারা প্রায় সবাই উক্ত শ্রেণীভুক্ত। তাদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব থেকে ক্রমশ জোরালো হল সাম্প্রদায়িকতার খেলা। স্বার্থ সংরক্ষণে এই শ্রেণী উত্তেজিত করে তুলল বৃহত্তর শ্রেণীকে। সাধারণ মানুষের নিজেদের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হল। ধর্ম হয়ে দাঁড়াল স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার। কংগ্রেস যদিও পরিচিত ছিল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংস্থা রূপে তবু পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস হেতু বাংলাদেশের কৃষক প্রজা পার্টির প্রায় সকল মুসলমান নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৮৮৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বিজাতি তত্ত্বের অস্তিত্ব অস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেন।[২৪] ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে তিনি মুসলমানদের দূরে থাকতে বলেন। তাঁর এই প্রস্তাবে মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর একটা ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান সৃষ্টির অনিবার্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দিকটি হল মুসলিম রাজনীতির সর্বভারতীয় রূপ।

১৯৪০ সাল পর্যন্ত দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ সকলেই ছিলেন অবাঙালী মুসলমান। চল্লিশের কাছাকাছি সময়ে বাঙালী মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যদিও এর ভিত্তিভূমি বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই মূলত অবাঙালী মুসলমান এবং তাঁদের অনুগতদের নেতৃত্বে রচিত হচ্ছিল। ১৯৩৭ সালের আগে অবাঙালী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের ওপর তেমন মনোযোগ দেননি। এমন কি তিরিশ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের পরিকল্পিত মানচিত্রে বাংলাদেশের কোনো স্থানই ছিল না। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের ভূমিকার গুরুত্ব অবাঙালী নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা বাঙালী মুসলমান নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তৎপর হলেন। বাংলাদেশে তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির অধিকাংশ সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করে চল্লিশ সালের শুরুতেই মুসলিম লীগের পরিচালনায় পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হল। ১৯৩৫ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর ছয়আনা খাজনা দানকারী কৃষকরা ভোটের অধিকারী হওয়াতে প্রজা আন্দোলনের নাম ব্যবহার করে নেতৃত্বকামী মুসলমানদের ভোট-প্রাপ্তির পথ সুগম হয়। সেই সময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ হিন্দু জমিদারের

২৪ ॥ "In his whole attitude was implicit the concept of Pakistan", Percival Spear, *India, Pakistan and the West*, (London, 1952), p. 191.

সঙ্গে অধিকাংশ মুসলমান কৃষকের বিরোধ বর্তমান থাকাতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রচেষ্টা একটা রাজনৈতিক সংহতি পেল।

সাহিত্যে উপরোক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রবাহ ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। উপন্যাসই যেহেতু সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক রূপকল্প, সেহেতু সেখানে এর প্রতিফলন সর্বাধিক স্পষ্ট। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ পর্ব পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, "রামমোহন রায় থেকে রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই সর্বভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রবল ধারাকে বাঙালী হিন্দু ঐতিহ্যের খাতে বহাতে সাহায্য করেছেন।"[২৫] অথচ উনিশ শতকের বাঙালীর সংস্কৃতি অবয়বে হিন্দু হলেও "তার প্রাণ কিন্তু বুর্জোয়া সংস্কৃতির। মাইকেলের তো কথাই নেই, বঙ্কিমও দেখি প্রাণপণে চাইছেন মিল, স্পেনসার, কোঁৎ-এর বাণীকে এই স্বদেশীয় কাঠামোতে রূপ দিতে। এই বুর্জোয়া সভ্যতার মূল সত্য হল মানবতাবাদ··· ; অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বের তাই লক্ষ্য।"[২৬] বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেন না সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন সত্য কিন্তু পরবর্তী পর্বে তাঁকে দেখি সামন্তবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে শুধু সন্ধি করতে নয় বরং তার কাছে প্রকারান্তে আত্মসমর্পণ করতে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ ভূমি-নির্ভর অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত চেতনার হলেও ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়ারা শ্রেণী হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের সঙ্গে সমঝোতা করে চলে। তদুপরি সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশে প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিকে টিঁকিয়ে রাখে তাদের নিজেদের শোষণের সুবিধার্থে। ফলে অনগ্রসর চিন্তা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা বিশেষ উৎসাহ লাভ করে। উনিশ শতকের নব্য বুর্জোয়াদের (কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) অর্থনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ ও মানসিকতা প্রায় সামন্ততান্ত্রিক কাজেই উনিশ শতকের সীমিত নব-জাগরণের চরিত্রটি অনেকাংশে প্রতিক্রিয়াশীল। এই শতকের প্রায় সকল মনীষী চেতনায় পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় প্রায়-বিপ্লবী, কিন্তু সামাজিক আদর্শে প্রতিক্রিয়াশীল। ব্যাপক গণ-জীবনের চাহিদায় ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সংঘটিত হয়নি বলে এই 'নব-জাগরণে'র পরিণতি ঘটে জীবনবিমুখ পারলৌকিক দর্শনে। এমন জাগৃতিতে ইহলৌকিক সুর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না।

এই সমাজের কাঠামো অভিনব। বিদেশী ধনতন্ত্রের আঘাতে পুরনো সমাজের চক্র মনে হচ্ছে বদলে যাবে, ব্যক্তি জেগে উঠতে চাচ্ছে এবং চাচ্ছে স্বতন্ত্র হয়ে

উঠতে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে। প্রচণ্ড ব্যক্তিগত সংঘর্ষ দেখা যায় সমাজের সঙ্গে ডিরোজিওর শিষ্যদের। ভারতীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে তাঁদের ঐ পাশ্চাত্য জীবনমুখী আদর্শের বিজাতীয় অনুকরণ অসদাচার রূপে সমাজে পরিগণিত হয়েছিল। তাঁদের রীতিনীতি জীবনমুখী হলেও পুরনো সামন্ত সমাজশক্তির কাছে এবং চলিত ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করবে এমন সুযোগের অভাবে এঁদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের পথে বাধা ছিল দুর্ভেদ্য। তদুপরি এঁরা তাঁদের ইহলৌকিক ধারায় সবার সঙ্গে এক হতে পারেননি বলে বড় কোনো প্রভাবও রেখে যেতে সক্ষম হননি।

জীবনমুখী চৈতন্যে অনন্য এ যুগের বিদ্যাসাগর। তাঁর ছিল স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। কিন্তু সমাজ-সংস্কার প্রয়াসে তাঁকেও নিতে হয়েছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। শাস্ত্র সংযুক্ত বলে তাঁর মহিমান্বিত যুক্তিবাদী মানবতাবোধ পরবর্তী যুগে কেবলমাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য হল, বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। সামন্ত সমাজশক্তির মুখ চেয়েই তাঁকে পারলৌকিক দর্শনের যুক্তি দেখাতে হয়েছিল। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর ছিলেন উক্ত সামন্ত সমাজের একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। যুক্তি, তর্ক, মনন, অনুশীলন, আচার-আচরণ —সব ক্ষেত্রেই। তাঁকেও প্রতিক্রিয়াশীলতার সমীপবর্তী হতে দেখা যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। বাংলাদেশের তৎকালীন ছোটলাট জনসাধারণের জন্য বাংলা শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী, দেশী-বিদেশী শিক্ষাব্রতীদের বক্তব্য জানতে চান। বিদ্যাসাগর যে মতামত দেন তার একাংশ এই রকম, "বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে।··· কিন্তু বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

"একমাত্র কার্যাকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। একশত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটি মাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন···।"[২৭] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চিন্তাবিদের ঐ সীমাবদ্ধতা এটাই প্রমাণ করে যে, উপনিবেশের সামন্তবাদী পরিবেশে বুর্জোয়া চেতনার বাসিন্দাদের যুক্তি ও নীতিপরায়ণতার লৌকিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

২৭॥ উদ্ধৃত: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', দ্বিতীয় খণ্ড, (১৩৬২), পৃ ৯০।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকেরা তাঁদের দেশবাসীকে আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবের পথ দেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু দেশের মানুষকে ধর্মের সঙ্গে বিযুক্ত করে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিকাশিত ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবাদ লোকালয়ের মধ্যে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট ও নির্দেশিত অনুশীলিত ধর্মপরায়ণ আদর্শ মানুষের সন্ধান ইহলোকে পাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষিত সৃষ্টি-উন্মুখ প্রতিভার এমন সীমাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে, তাঁদের ওপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবের তুলনায় তাঁরা যে সমাজের অন্তর্গত ছিলেন তার প্রভাব ছিল অধিক-তর শক্তিশালী। যে জাতীয়তাবাদ তখন হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আত্ম-সম্মানের দ্যোতনা রূপে বিকাশিত হতে চাচ্ছে সে জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে ইহলৌকিক চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যকার অসমতা, অনুপযুক্ত জীবিকা ইত্যাদি অসন্তোষ বিরাজ করছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী জাতীয়তা-বাদের চূড়ান্ত ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ যা গোটা ভারতবর্ষে ক্রমশ প্রসারিত হয়ে গেল।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ সামন্তবাদী সাংস্কৃতিক চেতনার নিকট থেকে সমর্থন পেয়েছে। সামন্তবাদী মানসিকতা ধর্মীয় প্রবণতার বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। দেশকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করার মধ্যে যতটুকু স্বদেশপ্রীতি রয়েছে তা হিন্দু ধর্মপ্রীতিতে পর্যবসিত হয়ে গেছে —লক্ষ্যে হোক কি অলক্ষ্যে। তাঁর স্বশ্রেণীর মধ্যে যে মানসিকতা তখন ক্রিয়াশীল বঙ্কিমচন্দ্র সেই মানসিকতার ভক্তি অবনত স্বদেশবন্দনা রচনা করলেন 'বন্দেমাতরম'-এর স্তোত্রে। এ সময়কার লেখক কবি সকলেই ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। সে ইতিহাস বিকৃত ইতিহাস। কারণ মুসলমানদের পরিচয় অসুন্দর করে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেখানে। আর উক্ত বিকৃত কাহিনী নির্বাচন করার মধ্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাহিনীগুলির মাধ্যমে হিন্দুদের বীরত্ব প্রচার এবং প্রাচীন ঐতিহ্যানুসন্ধানের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত স্বদেশবাসীর আত্মমহিমা জাগানোর একটা প্রত্যক্ষ প্রয়াস দেখা যায়।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'বীরবাহুকাব্য' (১৮৬৪), 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৬) প্রভৃতি কাব্যগুলি এবং বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) পর্যন্ত অগ্রসর হলে লক্ষ্য করা যায় হিন্দু বাঙালীর জাতীয়তার সুর ধাপে ধাপে চরমভাবে মুসলিম বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বাঙালী হিন্দুর ওপর যেমন বলিষ্ঠ প্রভাব ফেলেছে তেমনি জন্ম দিয়েছে পাকিস্তানবাদী মানসিকতার।

উনিশ শতকের শেষে প্রায় দু' শতাব্দী পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের মধ্যে যখন স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেল তখন সেই শিক্ষানবিশ ও পরে শিক্ষিত মুসলমানদের হৃদয় প্রভাবিত করেছে দু' ধরনের বিদ্বেষজাত অভিজ্ঞতা।

এই সময়ে যথোচিত 'ফিল্টারড্' হবার সুযোগ না পেয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটা প্রবল হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রাণবন্যার সৃষ্টি করল। ঐ জাতীয়তাবাদ প্রচারে ও প্রকাশে উনিশ শতকের দু'চার জন ব্যতিক্রমধর্মী নিরপেক্ষ প্রতিভা ব্যতীত সকল মনীষীই তৎপর হয়েছেন এবং প্রতিভাজাত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থনীতির। জমিদারী, চাকুরী, ব্যবসায়ে সর্বত্রই হিন্দু প্রতিবেশীর প্রবল পরাক্রম। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানের স্থান নেই, বরং রয়েছে উপেক্ষা মিশ্রিত ঘৃণা। মোটামুটি কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল বাঙালী মুসলমানদের উপরোক্ত জীবন-সমস্যা। কোনো মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করতে এলে তাঁকে পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়াও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে নিজের ধর্ম-প্রভাবান্বিত সমাজ চেতনার। বাইরের জগতে প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার আগেই ঘর সামলাবার দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁদের ওপর।

উনিশ শতকের মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রধান হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তিনি উচ্চশিক্ষা পাননি। কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে তাঁর দূরস্থিত বাসভূমির সে জন্য যোজনব্যাপী ব্যবধান। তিনি নগর থেকে শুধু নয়, শহর থেকেও দূরে ছিলেন। জীবিকার জন্য তাঁকে অধীনস্থ হতে হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার। মীর মশাররফ দূরে ছিলেন তাঁর যুগের ধর্মীয় অনুদার মানসিকতা থেকেও। তবু কি একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন ? পারেননি। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্বে যে সব রচনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যেমন 'রত্নবতী' (১৮৬৯), 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩), 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) প্রভৃতি লিখবার পর তিনি লিখলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'। বিষাদ সিন্ধু'র তিনটি পর্ব ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। 'বিষাদ সিন্ধু' প্রথম পর্ব প্রকাশের আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' (১৮৮৭) বাদ দিয়ে সব ক'টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'বিষাদ সিন্ধু'র বিশেষ শৈল্পিক আবেদন ও সাহিত্যিক মূল্য চরিত্র সৃষ্টিতে এবং এর শ্রেষ্ঠ অধ্যায়গুলি অ-ধর্মীয় ও অনৈতিহাসিক। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে 'বিষাদ সিন্ধু' আদৃত হয়েছে ধর্মবোধের কারণে।

মুসলমানদের কোনো উল্লেখযোগ্য 'মিথলজি' নেই। 'মিথলজি'র আশ্রয়ে হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর মহিমা প্রচারিত হয়। নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত সাধারণ হিন্দুরা পালাপার্বণে, রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালি, কথকতার মাধ্যমে সাহিত্যরস আস্বাদনের সঙ্গে ধর্মপালনের তৃপ্তি আদায় করতে পারে সহজেই। তুলনায় মুসলমানদের নিরাকার চেতনাবাহী ধর্মীয় কাঠামো অন্তত নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিতদের এবং ইসলাম ধর্মান্তরিতদের কাছে সূক্ষ্ম বোধ হবার কথা। আর এ দেশে "লোকশ্রুতি ও আউলিয়া দরবেশ ফকিরদের কেরামতি, সামাজিক সাম্য

ও ভাবালুতা সম্বল করে প্রচারিত হয়েছিল ইসলাম।"[২৮] শিক্ষা সংস্কৃতিহীন নগরবাসী মুসলমান জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে রসালো কাহিনী পরিবেষণ করতে-গিয়ে মিশ্রভাষা রীতির পুথিকার নানা অলৌকিক, অনৈতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা সৃজন করেছে। নবাবী আমলের পতন ও কোম্পানি আমলের অভ্যুদয়ের কালে ঐ সব পুথি র. ত।

পুথি রচয়িতারা নিজেরাও শিক্ষিত ছিলেন না। মার্কস ভারতবর্ষের যে সময়টার বর্ণনা করে লিখেছেন, "স্থানীয় সমাজের যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়।"[২৯] সেই স্তূপাকৃতি ধ্বংসের যুগে ক্রান্তিকালের অনিশ্চিয়তা-বোধে পীড়িত ও অতীতে মুসলমান শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সমধর্মীয়তা বোধে কতকটা হৃত গৌরবান্বিত পুথি-লেখকরা অবচেতনায় হিন্দুদের দেবদেবীর সমকক্ষ বীর সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন—যে বীর তাঁদের নিজস্ব ধর্মের, এবং তাঁদের আদর্শ সমাজেরও।

এই সামাজিক বীর নায়কের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারও ছিল এই শ্রেণীর পুথি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। হীনমন্যতার বোধ দূর করবার প্রতিক্রিয়াজাত প্রয়াসে হিন্দু দেবদেবীর মতো অলৌকিক মহিমাসম্পন্ন বীর নায়ক-নায়িকা এঁরা এনেছেন ফারসী রচনা অথবা উর্দু বা হিন্দীর মাধ্যমে বাংলায় ভাষান্তরিত কাহিনীগুলি থেকে। এই রচনাগুলিতে ইতিহাসের বিকৃতি যেমন ঘটেছে তেমনি এদের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে দেশজ ধারণার। ফলে কোনো অংশই অবিকৃত থাকেনি। তবে এই ধরনের মিশ্র রীতির পুথি লেখার প্রয়াস থেকে এই সত্য প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চাহিদা একটা স্বাতন্ত্র্য কামনা করছিল।

মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' লিখবার পশ্চাতে স্বধর্মের মহিমা জ্ঞাপনেচ্ছা হয়তো ছিল না। "মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষা প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই" ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ সিন্ধু'র মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ"[৩০] তিনি ব্যবহার করেছেন বলে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। মুখবন্ধের পূর্বোদ্ধৃত অংশ

বিশ্লেষণ করলে ধারণা হয় তাঁর 'বঙ্গভাষাপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা'রা হয়তো সকলেই মুসলমান নয়। মশাররফ হোসেন যখন একেবারে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন ('বিষাদ সিন্ধু'র শেষ পর্ব রচনার আগে তিনি লিখেছিলেন 'বেহুলা গীতাভিনয়', ১৮৮৯) —যে মনোভাব তাঁর আগের রচনাগুলিতে পরিস্ফুট সে সময়েই তিনি 'বিষাদ সিন্ধু'র ধর্মীয় বিষয়বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। মুসলমান পাঠকের প্রিয় পছন্দের বিষয়বস্তুতে তিনি পুথির জগতের যে জীবন মহিমা ও ইহলৌকিকতা অনুপস্থিত ছিল তা আরোপ করে 'বিষাদ সিন্ধু'কে করে তুলেছেন উপন্যাস সদৃশ। এখানে তিনি মানবতাবাদী শিল্পী। কিন্তু পুথির অলৌকিকতা এবং বীর সৃষ্টির চেষ্টা তাঁকেও প্রভাবিত করেছে। আসলে "মীর-মানস প্রধানত বাংলা পুথির দুনিয়াতেই লালিত ও বর্ধিত হয়েছে।"[৩১] তবে তিনি নায়ক করেছেন এজিদকে। "কারবালার বিয়োগান্ত পরিণামের কারণ হিসাবে পুথিতেও এজিদের অচরিতার্থ প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিত আছে। মীরের এটা মৌলিক উদ্ভাবন নয়। তবে তাকে রক্তমাংসের প্রচণ্ড প্রাণবন্তুতা দান করা পুথির অসাধ্য ছিল।"[৩২] আর এমন মানসিকতার জন্য তিনি আধুনিক জীবনোপলব্ধির পরিচয়ে যথার্থ শিল্পী।

কিন্তু প্রশংসনীয় উদারতা সত্ত্বেও মশাররফ হোসেনকে এরপর দেখা গেল ধর্মকে অবলম্বন করতে। 'গো-জীবন' (১৮৮৮)-এ তিনি লিখেছিলেন, "...ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণেব হানিও বোধহয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভ্রাতাব মন রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বারবার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি?"[৩৩] এমন লেখার জন্য মীর মশাররফকে স্বজাতির তীব্র সমালোচনার চাবুক সহ্য করতে হয়েছে। 'লেখক মুসলমান নহেন' এমন ধরনের শ্লেষাত্মক উক্তি তাঁকে দুর্বল করে দিয়েছে। সমসাময়িক হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে তাঁর উদার মনোভাবের যে রূপান্তর ঘটে, তিনি যে সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠেন সে ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না।

ব্যক্তিগত কারণের সঙ্গে সামাজিক কারণের সংমিশ্রণে সম্ভবত সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুদের প্রতি মীর মশাররফের অনুদারতা। ব্যক্তিগত কারণ হচ্ছে তাঁর প্রথম

জীবনের নীতি শিথিলতা জনিত মনস্তাপ এবং বার্ধক্যজনিত পারলৌকিক চিন্তা-বৃদ্ধি। সামাজিক কারণের মধ্যে একদিকে ছিল স্বধর্মাবলম্বীদের চাপ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং দেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার। তাঁর শেষের দিকের রচনাবলী যেমন 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৫), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবনলাভ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোস্লেম বীরত্ব' (১৯০৮), 'হজরত ইউসুফ' (১৯০৮) প্রভৃতি রচনায় তিনি পুথি লেখকদের মানসিকতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। পুস্তকগুলি রচিত হয়েছে সৌষ্ঠবহীন গ্রাম্যতা ও সামান্যতা দিয়ে। কলকাতা থেকে দূরে বসবাসকারী, উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত লেখকদের পক্ষে গ্রামীণ সংস্কৃতির ছাপ মুছে ফেলা হয়তো সম্ভব হয়নি। তবে মশাররফ হোসেনের শেষ পর্যায়ের রচনায় হিন্দু জাতিকে অপদস্থ করে নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা নেই। অর্থাৎ তাঁর রচনায় মুসলমান জাতীয়তাব বদলে রয়েছে শুধুই ধর্মভাব। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। তাঁর শেষ পর্বের কোনো কোনো রচনায় হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ উক্তিতে এই প্রত্যয় জন্মে যে, যুগের হাওয়া ক্রমশ ঝোড়ো হাওয়ায় পরিণত হতে চাচ্ছিল। তবু তিনি উচ্চশিক্ষিত, উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ছিলেন না, অর্থাৎ প্রতিভায়ও নয় আবার ভুল শত্রু নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও নয়।

মশাররফ হোসেনের আত্মকাহিনী 'বিবি কুলসুম'-এ (১৯১০) স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর স্বদেশী কাজে নিরুদ্যম থাকার কারণ বিবি কুলসুমের সাবধানী গৃহিণী-যুক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে, "ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনকুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশজাতি, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগৎশ্রেষ্ঠ। ...এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ, বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে?"[৩৪] এ ছাড়া হয়তো ব্যক্তিগত কারণেও তিনি আন্দোলন থেকে সরে ছিলেন।[৩৫] তবু ১৯১০ সালে লেখা বঙ্গভঙ্গের কালে এই ধরনের ইংরেজ প্রশস্তিতে ইংরেজদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে মুসলমান সমাজের কৃতজ্ঞতা বোধও হয়তো বা প্রকাশ পেয়েছে।

'মহাশ্মশান'-এর (১৯০৪)[৩৬] কবি কায়কোবাদও মীর মশাররফের মতো দূরে ছিলেন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে। উনিশ শতকের কবি রূপেই তিনি পরিগণিত, যদিও বেঁচে ছিলেন বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। উনিশ শতকের

৩৪॥ মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৩৫॥ ঐ, পৃ. ১৮৪।

৩৬॥ ১৩০৫ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'কোহিনুর'-এ এই 'মহাশ্মশান'-এর প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়।

কাব্যরচনার রীতি ও মানসিকতা দ্বারা তিনি সবিশেষ প্রভাবিত। কায়কোবাদ তাঁর কবিজীবন শুরু করেন প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখে। মূলত তিনি করুণ রসের কবি। কিন্তু "বঙ্গীয় মুসলমানদের স্পর্দ্ধা" বৃদ্ধির জন্য এবং "ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর", "অন্যকোন জাতি অপেক্ষা হীন বীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না" —সেই 'ক্ষীণস্মৃতি' স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তিনি "ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য্যসম্বলিত" 'যুদ্ধ কাব্য' রচনা করতে বাধ্য হলেন (মহাশ্মশান, ভূমিকা)।

তিনি স্বজাতির অতীতের সঙ্গে হিন্দুদের অতীত ইতিহাস একত্র করে মুসলমানদের বীরজাতি রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কারণ "তখন বাঙালী মাত্রই স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবাশ্রয়ী। হিন্দুর অনুধ্যানে এল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা গৌরববৃত্ত। মুসলিমের চিত্ত-পরিক্রমার ক্ষেত্র হল আরব, ইরান ও মধ্য এশিয়া। কায়কোবাদেও এই চেতনা প্রকট।"[৩৭] ফলে ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের পরিচায়ক আহমদশাহ আবদালীকে আসতে হয়েছে ভারতের বাইরে থেকে। এ কাব্যে নিরপেক্ষ বীরত্ব দেখানোর চেষ্টা হয়েছে—উভয় সম্প্রদায়েই, মারাঠা এবং মুসলমানদের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কায়কোবাদ এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভকে এভাবে দেখেছেন —"মুসলমানগণ যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাহারা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আহমদ শাহ দোরানী কাবুলে চলিয়া যাওয়ার পর বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি আর তাহাদের ছিল না।"[৩৮] আর ভূমিকায় তো বলেই রেখেছেন যে, "মুসলমানদের সৌভাগ্যবশতঃই ইংরেজগণ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন।"[৩৯] দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমাজের জন্য যেভাবে ভেবেছেন, কায়কোবাদও মুসলমানদের জন্য সেভাবে ভাবছেন। তথাপি শিল্পী কায়কোবাদের সঙ্গে মুসলমান কায়কোবাদের একটি বিরোধ দেখা যাচ্ছে। শিল্পী কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে মহত্ব দেখছেন কিন্তু সম্প্রদায়-মনস্ক কায়কোবাদ মুসলমানদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করতে চাইছেন। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এমন স্ববিরোধিতা নেই। কায়কোবাদ প্রতিভাতে খাটো, তাই কোনো 'আনন্দমঠ' রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কায়কোবাদ গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত কোনো বীরগাথা মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করতে পারেননি। তবু স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় মুসলমানদের অমন দুর্দিনে সমাজের দুর্গতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাঁদের মতো লেখকেরা যে থেমে পড়েননি সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। যে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের ব্যাকুল করেছিল উনিশ শতকের শুরুতে, তেমন আত্মচেতনা মুসলমানদের মধ্যে শতাব্দীর শেষে জাগল। ফলে তাঁরা সমাজ ও সম্প্রদায়কে উন্নত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত বিদ্বেষপূর্ণ লেখা, অবহেলা, ইসলাম ধর্মের ওপর খ্রীস্টান পাদরীদের আক্রমণ এমন সব আঘাতে সৃষ্টিশীল মুসলমান লেখকদের অন্তর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। হয়তো তাঁরা প্রায় সকলেই অল্প শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু বাড়তি উত্তেজনা তাঁদের স্থির থাকতে দেয়নি।

বিশ শতকের দু'দশক পর্যন্ত মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে দেখা যায়, "তাঁরা মুসলমান সমাজের জন্য নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করার তাগিদ তখন খুব বড় ক'রেই অনুভব করেছিলেন।"[৪০] আর এটাও একটা সত্য যে, মুসলমান সাহিত্যিকরা তর্কযুদ্ধে, আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা করতেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সৃষ্টিমূলক সাহিত্যরচনার অবকাশ পাননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সত্য বিধৃত।

কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান'-এর দীর্ঘ ভূমিকায় মুসলমানদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করবার জন্য হিন্দু সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। নিজের মানসিকতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই।"[৪১] কিন্তু এ কথাও সত্য যে, "অমিয়ধারা'র (১৯২৩) তিনটি কবিতায় অশ্লীল ভাষায় হিন্দুর নিন্দা করা হয়েছে"[৪২] এবং কায়কোবাদ 'মহরম শরিফ' (১৯৩৩) কাব্যে যথারীতি ধর্মীয় গোঁড়ামিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যদিও তাঁর সর্বশেষ রচনাটি হচ্ছে প্রেম-কাহিনী এবং 'শ্মশানভস্ম কাব্য' (১৯২৪) হিন্দুদের নিয়েই লেখা এবং একটি বিদ্বেষহীন রচনা।

মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মরক্ষার প্রয়োজন বোধ থেকে। কায়কোবাদের রচনার মধ্যে হয়তো জাতীয়তাবাদী ধারণা তেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তথাপি তিনি মুসলমানদের শৌর্যবীর্য দেখাতে

গিয়ে যে কাহিনী চয়ন করে নিয়েছেন তার মধ্যেই একটা অস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী ধারণা রয়েছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তিনিও ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাঁর যুগের মুসলমান লেখকদের বাধা ছিল বিস্তর—হিন্দুদের বিজাতীয় ঘৃণা, ঔদাসীন্য, নিজেদের প্রতিভা ও শিক্ষার অপ্রতুলতা, স্বশ্রেণীর এবং হিন্দুদের আক্রমণাত্মক সমালোচনা ছাড়াও ছিল স্বজাতির দৈন্য। এ দৈন্য তাঁকেও ঘিরে ছিল। ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত উদ্বোধনী বাণীতে কায়কোবাদ বলেছিলেন, "আজ আপনারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মুসলিম বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন, কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই। আজ আপনাদের পথ উন্মুক্ত।"[৪৩] হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের সামাজিক অবমাননার চেয়ে তাঁর কাছে অধিক লাঞ্ছনাকর মনে হয়েছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাওয়া অপমান। এমন অবমাননা যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণেই সম্ভব তা তিনি ভেবে দেখেননি। তাঁর 'অশ্রুমালা'য় (১৮৯৫) হিন্দুদের সমালোচনার ভয়ে তাই তিনি সচেতনভাবে শব্দ চয়ন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, "এমন একটি শব্দও ছিলনা যাহা পাঠ করিয়া হিন্দু ধুরন্ধরগণ মুসলমানদের লেখা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন।"[৪৪] 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরও যে তাঁকে উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে যন্ত্রণাময় স্মৃতিতে আকুল হয়ে উঠতে দেখি বাস্তবে যে সে অভিজ্ঞতা কত বেদনাময় ছিল সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি তাঁর সমস্ত উদারনীতি সত্ত্বেও যে স্বতন্ত্র ছিলেন পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যের 'স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মুসলিম বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি' কামনার মধ্যে তা নিহিত। এই রকম স্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতার জন্য তিনি বড় কবি না হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাকিস্তানবাদী মনোভাবের। "প্রতিনিধিত্বশীল হচ্ছে কায়কোবাদের মানসিকতা, যার মধ্যে হীনমন্যতা আছে, আছে বাঙ্গালিত্ব ও মুসলমানত্বের দ্বন্দ্ব, আছে দীনতা ও দারিদ্র্য, আছে আত্মসচেতনতা।...নিজের পরিবেশকে গোপনে ভালবাসেন অথচ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন না, যিনি বারবার ফিরে তাকান পশ্চিমের দিকে,...পূর্বসূরী তিনি পাকিস্তানবাদী মানসিকতার।"[৪৫]

মীর মশাররফ হোসেনের পরিণতিতে একটা বোধ, একটা চেতনা দানা

বেঁধে উঠছিল, এমন এক অস্তিত্ব যা আদপেই, সমন্বয়পন্থী নয় বরং স্বতন্ত্রপন্থী। মানবিক শিল্পী মীর মশাররফ পরিবর্তিত হচ্ছেন ক্রমশ ধার্মিক ব্যক্তিতে। আবার ঐ ধর্মপরায়ণতা ক্রমশ অবসিত হচ্ছিল বিধর্ম বিদ্বেষে। কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' প্রকাশ করেছেন ঠিক বিংশ শতকের শুরুতে, 'বিষাদ সিন্ধু' প্রকাশের পর এক যুগের ভেতরেই। তাঁরা উভয়েই ছিলেন অরাজনৈতিক। কায়কোবাদ পাকিস্তান আন্দোলনে কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি যেমন করেননি উভয়েই —বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। দু'জনের মনোবৃত্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এক-জনের 'বিষাদ সিন্ধু'তে বিষণ্ণতা, অন্যের 'মহাশ্মশান-এ রয়েছে কারুণ্য। মীর মশাররফ যখন 'মোস্লেম-বীরত্ব', 'মদিনার গৌরব', 'মৌলুদ শরীফ' লেখেন তখন স্বধর্মের গৌরবময় অধ্যায় তুলে দেখানোর মধ্যে তাঁর যে মানসিকতা প্রতি-ফলিত হয়, সেই মানসই প্রতিফলিত হয়েছে কায়কোবাদের মধ্যে। 'মহা-শ্মশান'-এ অদ্বিতীয় বীর তিনি সৃষ্টি না করলেও অন্তত মুসলমান যে, "অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না,"[৪৬] সেটা দেখাতে চেয়েছেন মারাঠাদের সমকক্ষ বীর সৃষ্টি করে। এই বীরত্ব অতি অবশ্যই দৈহিক, কিন্তু লেখকের আন্তরিকতায় তা একটা দেহোত্তর ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

কায়কোবাদ মীর মশাররফের বিরুদ্ধে মহরম ঘটনার অনৈতিহাসিক বিবরণ দেবার জন্য অভিযোগ করেছিলেন। সে কারণে কায়কোবাদ তাঁর নিজস্ব ধারণানুযায়ী লিখলেন 'মহরম শরিফ' কাব্য। ফলে তিনি মানসিকতায় আবার মীর মশাররফের সন্নিকটবর্তী হলেন। উভয়েই উদার ধার্মিক। তাঁদের রচনা পর্বের প্রারম্ভে, উভয়ে বিষণ্ণ ছিলেন সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি দেখে এবং সে জন্য আত্মজাগরণের চাইতে আত্মরক্ষার তাগিদ তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। যদি তাঁদের মানস-বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে বাঙালী মুসলমান সমাজের ক্রম রূপান্তরই সেখানে প্রতিবিম্বিত।

বাঙালী মুসলমান সমাজের রূপান্তর হিন্দু সমাজের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতিতে ঘটেছে। উনিশ শতকে বাঙালী হিন্দু জেগেছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পেয়ে। একটা উদার বুর্জোয়া মানবতাবোধ উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দুর মনে প্রভাব ফেললেও তার দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য খুব একটা বিনষ্ট হয়নি। বিশ শতকের শুরুতে বাঙালী মুসলমান জেগে উঠতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সাহিত্যিকদের মতো মুসলমান লেখকরা শিক্ষিত, চাকুরীজীবী এবং উচ্চবিত্ত হবার সুযোগ পাননি। বাঙালী হিন্দু বুর্জোয়া প্রভাব যতটুকু পেয়েছে ততটুকুও তাঁরা পাননি। এঁরা হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিজেদের চারপাশে একটা ব্যূহ রচনা করতে তৎপর হলেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান তখন সংখ্যায়

৪৬। 'মহাশ্মশান কাব্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১/০—১৵০।

অল্প, কিন্তু তাদের মধ্যে শ্রেণীগত চেতনার অভাব স্বভাবতই ছিল না। তাই তাঁরা জনসাধারণের দিকে না তাকিয়ে গৌরবের অনুসন্ধানে যেতে চাইলেন আরব, ইরান, মধ্য এশিয়ায়। মীর মশাররফ প্রথম জীবনে কিছুটা ব্যতিক্রম-ধর্মী ছিলেন যার প্রকাশ দেখা যায় 'জমীদার দর্পণ'-এ। কিন্তু অবশেষে তাঁর সমাজের মানসিকতা তাঁকেও প্রভাবিত করল। ফলে তিনিও গৌরব ও বিষয়বস্তুর সন্ধানে মধ্যপ্রাচ্যে যেতে চাইলেন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন মীর মশাররফ এবং কায়কোবাদের তুলনায় বহুগুণে সচেতন লেখক। এই সচেতনতা তাঁকে রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণে যেমন উদ্দীপনা দিয়েছে তেমনি আপন সমাজের উন্নতি সাধনে প্রেরণা যুগিয়েছে। মীর মশাররফ ও কায়কোবাদ ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন না, আবার উগ্র হিন্দু-বিরোধীও ছিলেন না। তাঁদের রচনায় যে ইংরেজ প্রশস্তি অথবা হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ দেখা যায় তা সমকালীন সমাজ-মানসের প্রতিচ্ছবি। তাঁদের ভূমিকা ছিল রাজনীতি অসচেতন লেখকের।

কিন্তু সিরাজী উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সচেতন লেখক। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে সিরাজী 'মাতৃভাষা' নামক প্রবন্ধে মাতৃভাষার মহিমা প্রচার করে বলেছিলেন, "...সাহিত্য সম্প্রদায়গত মতবাদের দুর্গে বন্দী হইয়া থাকিবার বস্তু নয়।"[৪৭] এর ঠিক চার বছর পর ১৩১০ সনে 'সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন' নামক প্রবন্ধে 'বঙ্গীয় মুসলমানদের' স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সজাগ হতে এবং সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন, "তোমরা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন জাতি এবং ধর্ম্মাবলম্বী। পরন্তু তোমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ।"[৪৮] সিরাজীর ভূমিকা এখানে স্পষ্টতই আগের তুলনায় ভিন্নতর, এখানে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচারক।

তাঁর 'অনল প্রবাহ' (১৩০৬)-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশে প্রেরণাদাতা ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লা। মুনশী মেহেরুল্লা নিজে ধর্মপ্রচারক। তাঁর দুটি রচনা পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রচারের কারণে সরকার বাজেয়াপ্ত করে। 'অনল প্রবাহ' প্রথম সংস্করণ মুনশী মেহেরুল্লার প্রভাবে সিরাজী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুসমাজ যে দুর্ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন।[৪৯] আবার সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে সিরাজী সেই স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[৫০] ১৯০৭ সালে তিনি 'নব উদ্দীপনা' কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে স্বার্থ,

৪৭॥ উদ্ধৃত : কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

৪৮॥ উদ্ধৃত : ঐ, পৃ. ৩৬০।

৪৯॥ ইবরাহীম খাঁ, 'বাতায়ন', (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ৪৮।

৫০॥ মুজাফফর আহমদ, 'সমকালের কথা', (১৯৬৩), পৃ. ৭

হিংসা, শত্রুতা ত্যাগ করে মোহনিদ্রা থেকে উঠে স্বদেশের কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। আর একটি কবিতায় তিনি স্বদেশী আন্দোলন ও 'বয়কট' সমর্থন করেন। দেখা যাচ্ছে, প্রথম সংস্করণ 'অনল প্রবাহ'-এর হিন্দু-বিদ্বেষ 'নব উদ্দীপনা' গ্রন্থে অনুপস্থিত। এবং এরপর প্রকাশিত হল 'অনল প্রবাহ' (১৩১৫)-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯০৮ সালের শেষে প্রকাশিত উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখলেন, "ইংরেজদের দাসত্বের বিরুদ্ধে গোলাম জীবনের প্রতিবাদ করে"।[৫১] বিরুদ্ধ পক্ষে এতদিনে ইংরেজও যুক্ত হল।

১৯০৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর উক্ত গ্রন্থ তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত করে গ্রন্থাকারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে। এ সময়ে সিরাজী 'মহাশিক্ষা কাব্য' রচনা করছিলেন। তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে দীর্ঘ আট মাস আত্মগোপন করে থেকে 'মহাশিক্ষা কাব্য' সমাপ্ত করে কলকাতায় এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বিচারে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে তাঁর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[৫২] দেখা যাচ্ছে বাঙালী মুসলমান লেখকদের মধ্যে সিরাজীই সর্বপ্রথম ইংরেজ-বিরোধী বই লিখে কারারুদ্ধ হন। তিনি মুসলমানদের দুটো বিরুদ্ধ পক্ষ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন —এক হিন্দু, দুই ব্রিটিশ। মনে প্রাণে তিনি আবার গোঁড়া মুসলমান ('মহাশিক্ষা কাব্য'-এ যার প্রকাশ) এবং প্যান-ইসলামাবাদী। কারামুক্ত হয়ে তুরস্কে বিদেশী আক্রমণে বিপন্ন তুরস্কবাসীদের সাহায্যার্থে ডঃ. আনসারীর নেতৃত্বে 'অল-ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল মিশনে' বঙ্গীয় প্রতিনিধি রূপে তিনি তুরস্কে যান। তাঁর পরের রচনাবলীতে ঐ ভ্রমণের প্রভাব দেখা যায়।

সিরাজী লঘু সাহিত্য পাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন। 'অধঃপতিত জাতি' 'নাটক নভেল' 'প্রেম-সঙ্গীত' 'যাত্রা-থিয়েটার'-এর মাধ্যমে কোনোদিন উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না এই ছিল তাঁর মত। কিন্তু "নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই···জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত এবং মর্মবিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই।"[৫৩] সে কারণে "দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর-বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায়

৫১॥ ইবরাহীম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
৫২॥ 'শিরাজী রচনাবলী', (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ৪২০-২২।
৫৩॥ 'রায়নন্দিনী', শিরাজী রচনাবলী, উপক্রমণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

'রায়নন্দিনী' রচনা করিয়াছি।"[৫৪] মুসলমান সমাজকে উন্নত কববাব জন্য তিনি 'উপন্যাসের ঘোর-বিরোধী' হয়েও উপন্যাস রচনা কবতে বাধ্য হয়েছেন। সুবক্তা ও সমাজকর্মী সিরাজী সমাজ হিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য হিন্দু লেখকরা তাঁদেব রচনায় মুসলমানদের যেভাবে কলঙ্ক লেপন কবে চরিত্রায়িত করেছেন, তার প্রত্যুত্তবে নিজের উপন্যাসসমূহে হিন্দুদেব বিরুদ্ধে তীব্র অনলোদ্গীরণ কবেছেন। এ কথা সত্য যে, শিল্পবিচাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব মুসলমান চরিত্রগুলো সফল সৃষ্টি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত দেশে শিল্পকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করা হিন্দু অথবা মুসলমান কোনো পক্ষেবই সম্ভব ছিল না। বিশেষভাবে পশ্চাদ্‌পদ বলে মুসলমান পাঠকবা এ বিষযে স্বভাবতই স্পর্শকাতব ছিলেন। এর প্রমাণ পাওযা যাবে মুসলমানদের সম্পাদিত তৎকালীন সামযিক পত্র-পত্রিকায়।[৫৫]

সিবাজীর লেখা 'বাযনন্দিনী', 'তাবাবাই', 'ফিবোজা বেগম', 'নুরুদ্দীন', সব উপন্যাসেরই ছক প্রায় এক রকম। হিন্দু রাজ-বাজডা ও মুসলমান নবাব-সেনাপতিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যেমন রয়েছে তেমনি আছে মুসলমান যুবকেব কাছে উপযাচিকা হয়ে হিন্দু রাজকন্যাব আত্মসমর্পণ। বিপবীত চিত্রও আছে সেখানে অভিজাত বংশীয়া মুসলমান কন্যাবা সদম্ভে হিন্দু বাজাদেব নিবেদিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর উপন্যাসে নানাভাবে হিন্দু ধর্মের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখানো হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্মেব মহিমা কীর্তিত হযেছে। এমন কি ইসলাম ধর্মের মহিমায অভিভূত হিন্দুদেব ধর্মান্তবিত কবার নানাবিধ প্রসঙ্গ উপন্যাস-গুলিতে উপস্থিত। এ ছাড়া হিন্দু দেবদেবীদেব প্রতি বিরূপ মন্তব্যও আছে।

মুসলমান সমাজেব আত্মমযাদা জাগানোব উদ্দেশ্যটা প্রধান হওযাতে সমাজের সমষ্টিগত মঙ্গল কামনায় তিনি ব্যক্তি মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের মহিমায় চরিত্রায়িত করতে পারেননি। দ্বন্দ্বটা ব্যক্তিগত না হযে হয়েছে সম্প্রদায়গত। উপন্যাসের বিকাশের জন্য ব্যক্তিত্বেব বিকাশ আবশ্যক। কিন্তু বাঙালী মুসলমান প্রায সকলেই তখন সামন্তবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায সঙ্গে জড়িত। বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকগণ পশ্চিমেব বুর্জোয়া প্রভাবের দ্বাবা প্রভাবান্বিত না হযে বরং তাকিযেছে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। তাঁদেব লেখায় চবিত্রের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আবোপিত হয়নি, গুরুত্ব পডেছে ঘটনা ও বক্তব্যেব ওপব। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কল্পনা পুথির জগতের মতো অতিরেকেব দোষে দুষ্ট।

সিরাজী উপরোক্ত কারণে ব্যক্তির অনন্যতা ও তার অন্তর জগতের রহস্যলোক সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখাননি। অথচ চরিত্রগুলির খুঁটিনাটি আচরণ তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। মূল চরিত্রের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্ব চরিত্রের বিশদ বর্ণনায় তাঁর উৎসাহ অধিক। পরিবেশ বর্ণনায়ও তিনি আবেষ্টনীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দিয়েছেন। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসে নায়ক ঈসা খাঁর 'পান' চিবানো এবং 'ছিবড়া' ফেলা, স্বর্ণময়ীর ঈসা খাঁকে পারস্য ভাষায় 'পত্র রচনা', সে পত্রে আবার 'মুসলমানী কায়দামতে একটু আতর' মাখানো; ঈসা খাঁর 'সাত হাজার অশ্বারোহী' 'বিশ হাজার পদাতিক', 'দুইশত রণতরী', 'দেড়শত তোপ', 'একশত পঁচানব্বই জন জমিদার' তার অধিনস্থ, 'দুই হাজার পুষ্করিণী', 'তিন হাজার ইঁদারা', 'দুইশত পান্থশালা', 'ষাটটি মাদ্রাসা' এমন অজস্র ছোটখাট তথ্যাদি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া একটি অপেক্ষাকৃত নগণ্য চরিত্র অভিরাম স্বামীর 'আসুরিক ভোজন'-এর বিস্তৃত দিনলিপি তিনি দিয়েছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রেম-প্রণয়, কূটনীতি, কলাকৌশল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা সবই রয়েছে সিরাজীর উপন্যাসগুলিতে, নেই শুধু রক্তমাংসের সজীব মানুষ। উপন্যাসের মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তি-সৃষ্টি। কিন্তু সিরাজী বক্তব্যকে প্রধান করতে গেছেন, ফলে ব্যক্তি তেমন মাথা তুলবার সুযোগ পায়নি। মুসলমানদের হীনমন্যতা বোধ দূর করবার জন্য একদিকে তিনি যেমন লেখার মাধ্যমে প্রবল প্রচার চালিয়েছিলেন অন্যদিকে আবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় কংগ্রেস-কর্মী রূপে খিলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগ দেন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন।[৫৬] উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী সিরাজী স্বাধীনতাস্পৃহায়[৫৭] কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনকে তিনি গ্রহণ করেননি। বঙ্গভঙ্গের সময়ে গঠিত মুসলিম লীগে তাঁর যোগ না দেবার বিশেষ কারণ বোধ হয় এর অবাঙালী চেহারা এবং মুসলিম লীগের তৎকালীন জনসংযোগহীনতা। সিরাজী যে মেহনতী মানুষের জন্য ভাবতেন তার পরিচয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'ছোলতান'-এ প্রকাশিত 'প্রাণের মূর্চ্ছনা' নামক প্রবন্ধে রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "স্বরাজের ও স্বাধীনতার আমি ঘোর পক্ষপাতী। ...কিন্তু সেই

৫৬॥ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২ এবং ইবরাহীম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৫৭॥ এ বিষয়ে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের 'ছোলতান'-এ তাঁর বক্তব্য ছিল এমন, "স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে মন কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। জাতি স্বাধীন না হইলে তাহার চিন্তা শক্তিও স্বাধীন এবং বলবতী হইতে পারে না।" উদ্ধৃত: শি. র., পৃ. ৪৩০।'

সঙ্গে আমি ইহাও স্পষ্টই ব্যক্ত করিতেছি যে, স্বরাজের জন্য আমার মুসলমান ভাইকে, আমার চাষী ভাইকে আমি কিছুতেই জবাই করিতে পারিব না।... ..চাষার রক্ত শোষণ করিয়াই জমিদার মহাজন ও উকিল মোক্তারদিগের বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি। চাষার টাকাতে তাঁহাদের দালান-কোঠা ও মোটর গাড়ি। ...সুতরাং চাষাকে বাঁচানো এবং চাষীকে জাগানই হইতেছে স্বরাজের প্রধানতম সাধনা।"[৫৮] স্বরাজ সাধনার জন্য যোগ্য কোনো রাজনৈতিক দল না পেয়েই সম্ভবত তিনি কংগ্রেসের অনুগত হয়েছিলেন। অথচ জীবনের শেষাবধি তিনি স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমান ছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলি ও অন্যান্য রচনা ঐ মানসিকতা তুলে ধরে।

আমরা সিরাজীর মধ্যে একটা প্রধান দ্বন্দ্ব দেখি, বাঙালীত্বে ও মুসলমানত্বে। কখনও বাঙালী জাতীয়তাবাদী হিসাবে তাঁর শত্রুপক্ষ হচ্ছে ইংরেজ এবং সেই শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। অন্যদিকে মুসলমান হিসাবে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ হিন্দু। সে জন্য তাঁকে হতে হয় প্যান-ইসলাম পন্থী। সিরাজীর মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি একটা প্রবল ভালোবাসা ছিল এবং সে ভালোবাসার মধ্যে বাঙালী সত্তা ও মুসলমান সত্তার কোনো অসদ্ভাব ছিল না। তাঁর চেতনার তিনটি উপাদান হল, বাঙালীত্ব মুসলমানত্ব এবং সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা। এর মধ্যে প্রথম দুটি উপাদান অধিক শক্তিশালী। তাই দেখি কখনও তিনি বাঙালী আবার কখনও তিনি মুসলমান। তবে ঐ ধরনের স্ববিরোধিতা তাঁর ব্যক্তিগত নয়। সেটা তাঁর সমাজ ও শ্রেণীর। এই চেতনাই পরে পাকিস্তানবাদী চেতনা রূপে সংগঠিত হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলমানত্বই অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বাঙালীত্বের তুলনায়, কারণ তখন প্রতিপক্ষ ছিল অবাঙালীরা নয়, বাঙালী হিন্দুরা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বিপক্ষ হিসাবে বাঙালী হিন্দু রইল না। তার স্থানে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল অবাঙালী মুসলমান। বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান বিরোধের প্রথম রাজনৈতিক প্রকাশ বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন যার পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে।

এই উপমহাদেশের বাঙালী মুসলমানদের যে স্বপ্ন ক্রমশ চারের দশকে এসে 'পাকিস্তান আন্দোলনে' রূপায়িত হল সিরাজী ছিলেন তার বাঙালী প্রতিনিধি। তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার কালবৈশাখী তাণ্ডবলীলা শুরু হয়নি। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘরাশি জমা হচ্ছিল, আর ছিল গুমোট। শূন্যতা এসে গ্রাস করছিল উভয় সম্প্রদায়কে। সিরাজী সঠিক কর্মপন্থা না পেয়ে হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু মানসিকতায় তিনি ছিলেন নির্ভুল

৫৮ ॥ 'শিরাজী রচনাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

স্বাতন্ত্র্যবাদী। আর ঐ মানসিকতা থেকেই জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান আন্দোলন। মীর মশাররফের উত্তর জীবন থেকে যে ধর্ম সংযুক্ত চেতনা ক্রমশ তাঁকে হিন্দু প্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টি থেকে সরিয়ে আনল ইসলামী জগতে, যে চেতনা কায়কোবাদে এসে হল নরম অথচ মুসলিম জাতীয়তাবাদী সেই চেতনার উগ্র আপসহীন রূপ সিরাজীতে লভ্য। প্রতিভা তাঁদের হয়তো অসামান্য ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে বহন করতে হয়েছে অসামান্য দায়িত্বের গুরুভার।

স্বদেশবাসী ভারতীয় মুসলমানদের প্যান-ইসলামিক মানসিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এয়াকুব আলী চৌধুরী। এয়াকুব আলী চৌধুরী খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। "বর্ণ হিন্দু নেতৃবৃন্দ 'এক নিখিল ভারতীয় জাতি' গঠনের স্বপ্নে দিশাহারা হইয়া মুসলমানদিগকে প্যান-ইসলাম-বাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী"[৫৯] বলে যে অভিযোগ করেছিলেন তার প্রত্যুত্তরে তিনি একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে এমন ধরনের অভিযোগের অন্তরালে 'নিগূঢ় সত্য' রয়েছে, "ভারতে ভারতীয় মুসলমানগণ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, স্বদেশ তাকে বিদেশী করিয়া রাখিয়াছে।"[৬০] পরের বছর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা' প্রবন্ধে তিনি তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ করে তুলে ধরেন। হিন্দু জাতীয়তা-বোধই যে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার জনক এ কথা তিনি বলেছেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী লিখেছেন, "ভৌগোলিক সীমা, ভাষা, আবহাওয়া ও আহার পরিচ্ছদের বিভিন্নতা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে নিতান্ত স্বভাব ধর্ম অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। ...ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও রাজ্য গঠনের এই স্বাভাবিক ক্রিয়া কি ভারতবর্ষেই বিফল বলিয়া প্রমাণিত হইবে?"[৬১]

পরমধার্মিক শান্তরসাশ্রিত এয়াকুব আলী চৌধুরীর মতো লেখকও যখন দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রচার করেন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তোলেন তখন ঐ স্বতন্ত্রবাদী মানসিকতা কত গভীরে প্রবেশ করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এই সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের কোন ধরনের আকুলতায় পাকিস্তান সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের আকাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান ছিল নিপীড়নহীন, স্বতন্ত্র-সংস্কৃতি ও স্বাধীন জীবনযাপনের মানস রাষ্ট্র।

৫৯॥ 'এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী', (সম্পাদকের নিবেদন), (ঢাকা, ১৩৭০), পৃ. (ট)।

৬০॥ 'ভারতীয় মুসলমান ও স্বাদেশিকতা', 'এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৬১॥ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

সাধারণ মানুষের প্রতি সিরাজীর যে ভালোবাসা স্বাধীনতা কামনার সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছিল তাই-ই অনেক বেশী স্পষ্ট ও প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে কাজী নজরুল ইসলামে। আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমর্যাদা বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন নজরুল-পূর্ববর্তী মুসলমান লেখকরা। বাঙালী মুসলমান রচিত সাহিত্যে ও তাতে প্রতিফলিত মানসের প্রতি হিন্দুদের ঔদাসীন্য নজরুলের লেখা পড়বার পর দূর হতে শুরু করল। নজরুলকে হিন্দু সমাজ অসাম্প্রদায়িক রূপে গ্রহণ করল। অথচ নজরুল তাঁর বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানদের জাতীয়তাবাদকেই উদ্দীপ্ত করে তুললেন। শ্রদ্ধার আসন পেলেন মুসলমানদের জাতীয় বীর রূপে। অদ্যাবধি তিনি বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় কবি রূপে পরিগণিত।

নজরুলের পূর্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদী লেখায় মুসলমান সমাজ নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছে জাগরণের। কিন্তু তেজোদ্দীপ্ত, বিপ্লবী এবং আধুনিক চেতনামণ্ডিত জাতীয়তাবোধ তাদের জন্য সৃষ্টি করলেন নজরুল। নজরুল-পূর্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের জন্য উদ্দীপনামূলক আবেদন ফিকে ছিল। উষ্ণ শোণিত যে চড়া রঙ ও স্বর চায় তার সন্ধান পাওয়া গেল নজরুলে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তারুণ্যে জাগল উচ্ছ্বাস। অপর দিকে প্রবীণ ধারার মুসলমানরা নজরুলের ইসলামী রচনার আধুনিক আবেদনে প্রীত হলেন। নবীনধারা 'আনন্দমঠ'-এর বিজাতীয় দেবীভূত মহিমা-উত্তীর্ণ সুস্থ বিপ্লবী চেতনার বিকাশ দেখল এবং প্রভাবিত হল। তবে মুসলমান সমাজের একাংশ তাঁকে গ্রহণ করেনি। নজরুলকে তারা কাফের এবং ইসলাম-বিরোধী বলে চিহ্নিত করল। এই বিরোধিতার মধ্যে সেই সামন্তবাদী মানসিকতাই প্রকাশ পায় —যে মানসিকতা মুসলমানদের সার্থক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধক ছিল।

গোঁড়া মুসলমান নজরুলের লেখায় হিন্দু রূপক প্রতীকে আচ্ছাদিত বিপ্লব প্রচারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। মাসিক 'ইসলাম দর্শন'-এর তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৯ সনের সম্পাদকীয়তে নজরুলের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল যে, "…ধূমকেতুর ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং উহার সারথির স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে,—'রক্তাম্বর-ধারিণী মা' ও 'ভৃগু বন্দনা' হইতে আরম্ভ করিয়া…কোফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে,…যবন হরিদাসের এ রূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম।" [উদ্ধৃত : আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', (ঢাকা, ১৯৬৯), পৃ. ৩৩৬] উপরোক্ত সংখ্যাতেই মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদের "লোকটা মুসলমান না শয়তান" নামক প্রতিবাদ

প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদের অংশবিশেষ —"দুঃখের বিষয়, একদল ধর্মজ্ঞানশূন্য মুসলমান ধূমকেতুর এই সকল শয়তানী ও পৈশাচিক উক্তি পাঠ করিয়া লেখককে 'বাহবা' দিয়া তাহার মাথাটা বিষম বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে উহার বুকের পাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ...খাটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত।" -[প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৮]।

নজরুলও সিরাজীর মতো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সরকার-বিরোধী আপত্তিকর লেখা প্রকাশ কবার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৫ সালে নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপদ লাভ করেন।[৬২] ঐ বছরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেব অন্তর্ভুক্ত 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠনে অংশ-গ্রহণ করেন। এই পার্টির 'কর্মনীতি ও সঙ্কল্পে' বলা হয়েছিল যে, যেহেতু "আমলা-তন্ত্রের নিকট খোসামুদি দ্বারা ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন-আনয়ন সম্ভব নয়, কিম্বা সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ স্বদেশীয়গণের সাহায্যেই নিরস্ত্রীকৃত জনসাধারণের স্বাধীনতা গুপ্তহত্যার সাহায্যে আসিতে পারে না।" সে জন্য "বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।"[৬৩] অর্থাৎ নজরুল ইসলাম কংগ্রেসের আপস-পন্থা এবং স্বদেশীদের সন্ত্রাসবাদ উভয়কেই পরিত্যাগ করতে চাচ্ছেন। 'লাঙল'[৬৪] (১৯২৫, ডিসেম্বর) এবং 'গণবাণী'র[৬৫] (১৯২৬, আগস্ট) মূল কথা ছিল জনসাধাবণ এবং কৃষক ও শ্রমিককে সংগঠিত করে তুলতে হবে, তবেই মুক্তি আসবে দেশের। মুজাফফর আহ্‌মদের প্রভাবে ও নিজের প্রবণতায় নজরুল মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। 'সাম্যবাদী' কবিতাটি 'লাঙল'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের নজরুল কৃত অনবদ্য বাংলা তর্জমা 'জাগো অনশন-বন্দী, উঠরে যত' ১৯২৭ সালের এপ্রিলে 'গণবাণী'তে ছাপা হয়। নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তাধারা

তাঁর রচিত বিভিন্ন লেখায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উনিশ শ' বিশের দশকেও ভূমি-মালিকদের স্বার্থ সচেতনতা ছিল প্রবল। তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকরা 'ধূমকেতু'র নজরুলকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল 'লাঙল'-এর নজরুলকে তারা তেমন সুনজরে দেখল না। 'ধূমকেতু' মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য যত বলেছে কৃষকের জন্য তেমন স্পষ্ট করে বলেনি যা 'লাঙল'-এ বিশেষভাবে ফুটে উঠল।

'পথের দাবী'র কবি শশীর প্রতি সব্যসাচীর কাব্যসৃষ্টির উপাদান সংক্রান্ত যে উপদেশ রয়েছে তা সম্ভবত নজরুলকেই কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল।[৬৬] সব্যসাচীর উপদেশে তৎকালীন বাঙালী মধ্যবিত্তের মানস প্রতিফলিত। "তখনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মনে করতেন তাঁরাই সব-কিছু করবেন, আর জনগণ গড্ডলিকার মতো তাঁদের অনুসরণ করবেন।"[৬৭] এই মানসিকতা উনিশ শতকের 'ফিলটারেশন থিওরী'রই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরূপ। বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে ইংরেজ-বিদ্বেষী নজরুল যত প্রিয়পাত্রই হন না কেন, শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামের সমর্থক রূপে যে তিনি তাদের অপ্রিয় হবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামে সমর্থন জানালে মধ্যবিত্তের নিজের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

নজরুল বিভিন্ন সময়ে এ দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা দেখেছেন তার রূপ 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) এবং 'কুহেলিকা' (১৯৩১) এ দুটি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। 'খেলাফতী ভলান্টিয়ার' আনসার কারাগার থেকে ফিরে এসে তার পূর্বের রাজনৈতিক মত পরিবর্তন করেছে। সে বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, "সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।"[৬৮] "আর সব দেশ মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এ দেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে"? (পৃ. ৫৯৩) ফলে আনসার জানতে শুরু করেছে, "শুধু কার্ল মার্কস, লেনিন, ট্রটস্‌কি, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক-পরাধীনতা, অর্থনীতি" (পৃ. ৫২৩)। এই বিপ্লবীকে যখন পুলিশ গ্রেফতার করল তখন পুলিশের হুমকি না মেনে মেথর-কুলি, গাড়োয়ান কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল আনসারকে দেখবার জন্য ছুটল। 'উন্মত্ত জনতা'কে শান্ত করতে পুলিশ সাহেবের অনুরোধে আনসার ঐ শ্রমজীবী মানুষদের কিছু বলতে পেয়ে সে তাদের অনুরোধ জানাল, অবিরত সংগ্রাম

চালিয়ে যাবার জন্য। তখন মেহনতি, ক্রুদ্ধ জনগণ লেখকের ভাষায় পরিচিত হয়েছে 'জনসঙ্ঘ' রূপে। আনসার বলেছে, "যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই" (পৃ. ৫৩২)। জনসজ্যের উদ্দেশ্যে তার নিবেদন, "সংঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের রূপে এসো না।"

'মৃত্যুক্ষুধা'য় নজরুল বিস্ময়কর জীবননিষ্ঠ চিত্র দিয়েছেন মেহনতি মানুষদের দিন যাপনের। দেখেছেন কি জ্বালায় দরিদ্র মানুষ ধর্মান্তরিত হয়। মিশনারী-দের আশ্রয়ে থেকে মেজবৌ যখন ধর্মান্তরিত হবার কারণ দেখায় সন্তানের 'উপোস' তখন এর আর কোনো উত্তর দেবার থাকে না। তবে 'মৃত্যুক্ষুধা'র সমাপ্তিতে কবি নজরুল বড় হয়ে উঠেছেন, ফলে ভাবাবেগ পূর্ণ প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে শেষ অধ্যায়ে। তবু নজরুল চেতনার দিক দিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁর সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়। এভাবে সাম্যবাদে আস্থা ঠিক ঐ সময়ে অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল লেখক দেখাননি। কিন্তু তিনি 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি রচনা করেছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নিয়ে। স্ববিরোধিতা হয়তো রয়েছে এ উপন্যাসে কিন্তু নিজস্ব শৈলীও আছে। প্রমত্ত বিশ্বাস করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে, যে বিশ্বাস সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে দেখা যায়নি। প্রমত্ত কাজ করছে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, সে একত্র করবে একই লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়কে। সন্ত্রাসবাদীদের পরিণতি হল দ্বীপান্তরে। সন্ত্রাসবাদের দুর্বলতা 'কুহেলিকা'য় দেখানো হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়'-এ যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে নয়। নিষ্ঠুর সমালোচনা নয় বরং গভীর সহানুভূতি দিয়ে নজরুল সন্ত্রাসবাদকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। আবার 'পথের দাবী'তে যেমন রূপকথার নায়ক সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র, তেমনটি নজরুল করেননি। তিনি অধিকতর বাস্তববাদী।

সব কিছু মিলে তিনি এক ব্যতিক্রম। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে তাঁর ভক্ত অগুনতি অথচ দেশে তখন সাম্প্রদায়িকতা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যে পরিবেশে অনেক সময় তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যিককেও নিদারুণ ক্ষোভে আর্তনাদ করে উঠতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একদা তিনি বেদনাময় অনুযোগ করছিলেন, "যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর নূতন শব্দ ভীতি দেখে বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। ...নৈলে আরবী ফার্সি শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয়।"[৬৯] আন্তরিক দুঃখে তিনি বলেছেন, "সন্ত্রাস্ত

৬৯॥ 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', ন. র., দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮।

হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা শেরওয়ানী-টুপী ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হ'য়ে যায় 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'।"[৭০] হয়তো সাহিত্যে 'খুন' শব্দটি ব্যবহার করার পেছনে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কোনো নন্দনতাত্ত্বিক কারণ ছিল (অবশ্য নন্দনতত্ত্বও ধর্ম-নিরপেক্ষ নয়), আর নজরুলের অভিমান মিশ্রিত ও ক্ষুব্ধ প্রত্যুত্তরেও ছিল ছেলেমানুষী কিন্তু এর আড়ালে যে সমাজ বর্তমান ছিল, তাদের অভিমানের ভিত্তি কতদূর গম্ভীর ছিল তা সহসা এমন সাহিত্য-বহির্ভূত তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাম্প্রদায়িকতার বোধ যতই শক্তিশালী হচ্ছিল ততই অনিবার্য হয়ে উঠছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। যে সাংস্কৃতিক ধারার ফলশ্রুতি পাকিস্তান, নজরুল ইসলাম সেই ধারার অন্তর্গত নন, যদিও সেই ধারাকে তিনি পরিপুষ্ট করেছেন, কারণ সামাজিক পরিচয়ে তিনি ছিলেন মুসলমান। আত্মরক্ষার প্রবল আবর্তে ভেসে-চলা মুসলমান সে সময় যা কিছু 'মুসলমান' দেখেছে তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিজয় তখন ছিল মুসলমানদের 'দিগ্বিজয়'। খেলার নির্মলতাও আচ্ছন্ন করেছিল সাম্প্রদায়িকতাবোধ। 'দৈনিক আজাদ'-এর তৎকালীন মোহামেডান লীগ সংক্রান্ত প্রচারের ফলে পত্রিকার প্রচার মুসলমান পাঠকের কাছে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭১] এই মানসিকতার ফলেই নজরুলকে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গৌরব করেছে এবং তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তারা জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছে।

নজরুল ইসলামের অসাধারণত্ব তাঁর সম্প্রদায়ের অন্য লেখকদের সাধারণত্বকে প্রমাণ ও চিহ্নিত করে। নজরুলের উপন্যাসের নায়করা ব্যতিক্রম—সমাজের তুলনায় অগ্রসর। আনসার বা 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীরের মতো চরিত্র সে সমাজে ছিল না বললেই চলে। নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ সামন্তবাদী নয়, তিনি অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিকে। তাই সামন্তবাদ-শাসিত মুসলমান সমাজে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না, বরং নিজের অজান্তে পুষ্ট করে তুললেন পাকিস্তানবাদী ধারাকেই। ইতিহাসের বক্রাঘাত এইখানে। ইতিহাস অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দাস, লেখকের আজ্ঞাবহ নয়।

৭০ ॥ ৬৯ সংখ্যক পাদটীকা, পৃ. ৬২৬।

৭১ ॥ আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'অতীত দিনের স্মৃতি', (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃ. ১৫৪-৫৮।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উভয়েই দেখেছেন তাঁদের প্রতিবেশী সমাজকে। গ্রাম পরিক্রমার অভিজ্ঞতা গোরার এই রকম "গ্রামে কোন আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না।" গোরা উপলব্ধি করল যে, "ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে" ('গোরা' —পৃ. ৪৮৯)। শরৎচন্দ্রের রমেশও মুসলমানদের দেখেছে। "কুয়াপুরের হিন্দু প্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না, করিলেও তাহারা প্রতি হাত একনম্বর রুজ্জু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না।" আর রমেশও গোরার মতো বুঝতে পারল, "মুসলমান…ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পরের সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতে পারে না" ('পল্লীসমাজ' --পৃ. ১৯০-৯১)। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র উভয়েই উনিশ শতকের শেষাংশের মুসলমান পল্লীসমাজের সদ্‌গুণ দেখেছেন, কিন্তু মুসলমান জীবন তাঁরা কেউই চিত্রিত করতে পারলেন না। পারলেন না কারণ ঐ জীবন সম্বন্ধে তাঁরা এর বেশী কিছু জানতেন না। এঁরা মুসলমানদের আনতেও পারছেন না উপন্যাসে। কেন না ঐ সব মুসলমান শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজের তুলনায় ছিল পশ্চাদ্‌বর্তী। উপন্যাসগুলি লিখিত হয়েছিল মোটামুটি উচ্চবিত্ত হিন্দুদের নিয়ে। কিন্তু উভয় সমাজের ব্যবধান অর্থনৈতিক বা শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে চিহ্নিত হয়নি, চিহ্নিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান রূপেই। ঔপন্যাসিকদ্বয় মুসলমানদের 'মুসলমান' রূপেই দেখেছেন, অনগ্রসর একটি জনগোষ্ঠী রূপে দেখেননি। বরং অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতা না দেখে তাদের মধ্যে একটি ধর্মীয় শক্তি দেখেছেন। মধ্যবিত্ত মুসলমানরাও উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের দূরত্বকে অর্থনৈতিক দূরত্ব হিসাবে না দেখে ধর্মীয় দূরত্ব হিসাবে দেখেছেন। আর এই পারস্পরিক দূরত্ববোধই দ্বি-জাতিতত্ত্বের উৎস ও লালনভূমি।

১৯৪০ সালের পর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শক্তিশালী হওয়াতে বাঙালী মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও প্রবল এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালী মুসলমানদের যে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত পরিচয় থাকা উচিত, সেই স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রচারও এই সঙ্গে তীব্রতর হয়ে উঠল। দুটি প্রতিষ্ঠান "পাকিস্তান আন্দোলন যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রতিষ্ঠার অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে।"[৭২] একটি হচ্ছে ১৯৪২ সালে ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং দ্বিতীয়টি ঐ সালেরই আগস্ট মাসে কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'।

৭২॥ 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', 'প্রসঙ্গ কথা', সম্পাদনা, সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকা, ১৯৬৮)।

বাঙালা মুসলমানদের রচিত সাহিত্যে মুসলমানদের একটি বিশেষ স্বতন্ত্র রূপ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুটি সংসদের উদ্যোক্তাদের সেটাই ছিল মূল লক্ষ্য। পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিজেরা যেমন সচেতন ছিলেন অন্যদেরও তেমন সচেতন করে তুলতে চাইছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের বক্তব্যে গঠিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আর একটি কাজ আরম্ভ করছিলেন। তা হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি যে পশ্চিম-পাকিস্তানের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র এ কথা সংসদ ও সোসাইটির বিভিন্ন সভায় উল্লেখ করছিলেন। "...ধর্ম ও সংস্কৃতি ...এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তমদ্দুন সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ। এইখানেই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা, এই জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।"[৭৩] ১৯৪৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে আবুল মনসুর আহমদ উপরোক্ত বক্তব্যে পূর্ব-পাকিস্তানীরা যে স্বতন্ত্র জাতি সে কথা সুস্পষ্ট করে বলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের স্বতন্ত্র রূপ এবং কাঠামো কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বাঙালী হিন্দুদের রচিত সাহিত্য নিঃসন্দেহে উঁচুমানের। কিন্তু ঐ হিন্দু সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের 'স্পিরিট' ও 'ভাষা' নেই। এ কারণে সে সাহিত্য মুসলমানদের সাহিত্যের এলাকাভুক্ত হতে পারে না বলে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকরা মত পোষণ করেন।[৭৪] কারণ "বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা।"[৭৫] —১৯৪৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান 'রেনেসাঁ' সম্মেলনের সভাপতি তাঁর অভিভাষণে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য অমন একটি সাহিত্যিক কাঠামো ও আদর্শ তুলে ধরেন। এঁরা মনে করেন যে, পর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি একই সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের থেকে আলাদা হবে। পূর্ব-পাকিস্তান যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে যাবে তাই সেই বিচ্ছিন্নতার পরিচয় সাহিত্যের ভাষাতেও থাকবে। সাহিত্যিক ভাষার এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই তাঁরা পুথিসাহিত্য থেকে প্রেরণা ও উপাদান

৭৩॥ 'মূল সভাপতির অভিভাষণ', 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

৭৪॥ 'মূল সভাপতির অভিভাষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৭৫॥ ঐ, পৃ. ১৯১।

সংগ্রহ করতে চেয়েছেন[৭৬] এবং যথোচিত মুসলমানী শব্দাবলী সংযোজন করবার কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীরা নজরুল ইসলামকে তাঁদের সাহিত্যিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেও নজরুলের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের সমালোচনার বিষয় হল, "ইসলামী আদর্শে বঞ্চিত হলে বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি হতে পারে নজরুলের কাব্য তার আভাস মাত্র, শেষ কথা নয়।"[৭৭] অর্থাৎ নজরুল ইসলামেই থেমে গেলে চলবে না। কারণ "হালী বা ইকবালের রচনার মধ্যে আগাগোড়া যে সুর শুনতে পাই, তার মর্মে মর্মে ইসলামী তমদ্দুনের রস যেভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তার আভাস নজরুলের কবিতায় একেবারেই নেই"—কাজেই তাঁদের মতে নজরুলের রচনাসমূহ পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যের জন্য আদর্শ হলেও শেষ লক্ষ্য নয়।

পাকিস্তান-পূর্ব বাঙালী মুসললান সাহিত্যিকরা ক্রান্তিকালে যেভাবে সাহিত্য সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, বারবার ভেবেছেন, পথ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন সেই সব প্রয়াস থেকে পাকিস্তানবাদী বাংলা সাহিত্যের উপাদান এবং আদর্শ সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এ ধরনের সাহিত্যে সচেতন-ভাবে কতটা ইসলামী উপাদান ও মুসলমানী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা আলাদাভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। তবে এ কথা সত্য যে, ঐ স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবনা পাকিস্তান সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছে।

উনিশ শতকের হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুকরণে পাকিস্তানবাদী লেখকরা ভেবেছিলেন 'রেনেসান্স' আনবেন সংস্কৃতিতে। কিন্তু প্রকৃত রেনেসান্স যে সমাজ কাঠামোতে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন না ঘটিয়ে আনা সম্ভব নয় এ সত্য হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা যেমন অমান্য করেছেন তেমনি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও অমান্য করলেন। তাঁরা দেখে শিখলেন না। বোধ করি অপেক্ষা করে রইলেন ঠেকে শিখবার জন্যে।

মীর মশাররফ, কায়কোবাদ, সিরাজী প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কে মুখে যথেষ্ট অনুপ্রেরণার কথা বলা হলেও যেহেতু অন্য কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ও ঐতিহ্য মুসলমান ঔপন্যাসিকদের সামনে ছিল না, সে জন্য মুখে তাঁরা যে যাই বলুন, বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই তাঁদের অগ্রসর হতে হল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সৃষ্ট উপন্যাসের পরিচিত পশ্চাদ্‌ভূমি অবলম্বন করে পূর্ব বাংলায় [এরপর থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব বাংলা ব্যবহার

৭৬॥ 'মূল সভাপতির অভিভাষণ' পৃ. ১৫১, এবং 'সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৭৭॥ 'সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

করেছি। পূর্ব-পাকিস্তান ছিল একটি রাজনৈতিক নাম —এ দেশের মূল পরিচয় বাংলাভাষার ভিত্তিতেই। উপন্যাস লেখা শুরু হয়।

সাংবাদিকতার স্বতন্ত্র প্রয়াস বাদ দিলে দেখা যায় অন্যান্য সাহিত্যিক প্রয়াসের তুলনায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী সঙ্গীতের প্রাবল্যে বিভাগোত্তর লগ্ন মুখর। এমনটা ঘটেছিল উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' রচনার কালে ও পরবর্তী বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনে সৃষ্ট দেশাত্মবোধক অসংখ্য গানে। এ ধরনের জাতীয় আবেগের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস বোধ করি দেশপ্রেমমূলক গান বহন করে এবং তা প্রায়ই সম্মিলিতভাবে গাইবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবিতায় যে ব্যক্তি-মনের অনুভূতি প্রকাশিত হয় তার স্থানে সম্প্রদায়গত মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এ ধরনের সঙ্গীত রচনা করা হয়। পাকিস্তানোত্তর এই সব জাতীয় সঙ্গীত স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার চূড়ান্ত নিদর্শন। এমন ধারার সঙ্গীতে পুথির আদলে ভাষার অবয়বে কষ্টসাধ্য কারুকার্য করা হয়েছে। এ ছাড়া আত্মগত দেশপ্রেমমূলক কবিতাও এ সময়ে প্রচুর রচিত হয়েছিল। সদ্য-পাওয়া আজাদীর প্রবল উচ্ছ্বাসে এ ধরনের কবিতা অসংখ্য রচিত হয়েছিল।

উপন্যাসের উপাদান বাস্তব জীবন। ব্যক্তিকে অনন্য জ্ঞানে, ব্যক্তির মনে নিজেকে ঘিরে যে রহস্য —সেই রহস্যকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের উপাদান করেন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলেন। ব্যক্তিত্বের অমন একটা বোধ ও প্রকাশ সামন্তবাদী সমাজে সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব নয়। সামন্তবাদী সমাজ মোটামুটি স্থির। সামাজিক সচলতা সে সমাজে নেই। ব্যক্তির বিকাশ সামন্তবাদী সমাজে ঘটে না। ফলে ব্যক্তিত্বের রহস্য সন্ধান সে সমাজে সম্ভব নয়।

ঔপন্যাসিকের বাহুল্য-বর্জিত, সংযমী, সামাজিক বাস্তবতাবোধ, বুর্জোয়া রূপ-কল্প উপন্যাসকে সার্থক করে তোলে। সাতচল্লিশের পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতার অভিনব স্বাদ ও অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি দেখা দিল উন্মূলীত পরিবার সমস্যা, নতুন করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের অজস্র সমস্যা। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ধর্মকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার যে সঙ্কল্পের কথা স্বাধীনতার আগে ঘোষণা করেছিলেন স্বাভাবিক কারণেই ঠিক তেমন অর্থে ধর্ম রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হল না। শোষণমুক্ত রাষ্ট্রের যে আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল বাস্তবে তাও প্রতিষ্ঠিত হল না। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল পৃথক রাষ্ট্রে হিন্দুদের প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা। মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান তার নিজের শ্রেণীস্বার্থ প্রসারে তৎপরতা প্রদর্শন করল। কিন্তু এই প্রসারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল অবাঙালী মুসলমান।

স্বাধীনতার পরে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলন ঢাকায় স্থানান্তরিত

হল। রাজনৈতিক পরিবর্তনে সাহিত্যের অঙ্গনও কিছুটা পরিবর্তিত হল কিন্তু এ পরিবর্তন বাহ্যিক। অর্থনীতির রূপান্তর ঘটানো ক্ষমতার হাত-বদলের রাজনীতির পক্ষে সম্ভব নয়। তীব্র সংঘাত-সঙ্কুল, দ্রুতগতি, অনন্যোপায় হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকামী রাজনীতির প্রভাব এড়ানো বাঙালী মুসলমানের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। রাষ্ট্রে ও সমাজে নানাবিধ অনিশ্চয়তার ফলে সাহিত্যিকদের মনেও সংশয় থেকে যায়। কিন্তু সমসাময়িক গুরুতর সমস্যাকে এড়িয়ে নন্দনতাত্ত্বিক সাহিত্য সৃষ্টি করলে সে সাহিত্য বাস্তব হয় না এবং তা মহৎ সৃষ্টিও হয় না। বিভাগোত্তর সমস্যাবলী ও দ্বন্দ্বসমূহ তখন পূর্ব বাংলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। পূর্ব বাংলার শিল্পোন্নয়ন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো সম্ভব হয়নি বলে নগর-মুখীনতাও হয়নি। বদল হয়নি কৃষিজাত প্রাচীন অচলায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার। এর ফলে স্বভাবতই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার অবসান ঘটল না। গ্রাম যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছে তবে দ্রুতগামী যানবাহনের সুযোগে শহরে জীবনের সঙ্গে গ্রামের দূরত্ব খানিকটা কমেছে। কিন্তু শহর এগোয়নি তেমন করে যেমন এগোয় উন্নত দেশগুলোতে। পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলার অগ্রসরকামী পদক্ষেপকে পশ্চাদ্‌মুখী অর্থনীতির শেকলে জড়িয়ে রেখেছিল অবাঙালী মুসলমান শাসক ও শোষক এবং তাদের সহায়ক বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমান। এদের চক্রান্তে উন্নত মানের শিল্প-সম্প্রসারণ ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গেছে। পল্লী ও শহর, পূর্ব বাংলার পরস্পর সংযুক্ত অর্থনীতির উল্লেখ-যোগ্য কোনো পরিবর্তন হল না। দৃঢ় হতে পারল না বিকাশিত হতে চাওয়া বুর্জোয়া মানসিকতা। পদে পদে অর্ধস্ফুট বুর্জোয়া মন আচ্ছন্ন হয়েছে সামন্তবাদী মানসিকতার প্রভাবে।

এরপর রয়ে গেল বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষা ও সামন্তবাদী ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব। বিভাগ পূর্ব যুগে কল্পলোকের যে বাসনায় সাহিত্যিকদের আবেগ 'মুক্তদেশকে' ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তানোত্তর কালে বাস্তবের রূঢ়তার মুখোমুখি হয়ে আগেকার সে উচ্ছল অনুপ্রেরণা আর রইল না। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য থেকে যাতে পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে স্বতন্ত্র রূপে চিহ্নিত করা যায়, তার জন্য পূর্ব বাংলার সাহিত্যের রূপ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে যত আলোচনা হয়েছে সে অনুপাতে সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। সে জন্য বিভাগোত্তর প্রথম দশ বছরে পূব বাংলায় উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাসের সংখ্যায় নগণ্যতা এত স্পষ্ট।

আবুল ফজলের 'জীবনপথের যাত্রী' (১৯৪৮)[৭৮] উপন্যাসটিতে সদ্য স্বাধীন

৭৮

হওয়া দেশের কথা অনুপস্থিত। এই উপন্যাসের পরিবেশে জটিলতা রয়েছে, কিন্তু লেখকের পরিবেষণা সহজ সরল। লেখকের উদ্দেশ্য 'জীবনপথের যাত্রী'র মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করা। সে জন্য তিনি সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে এর পাশে এনেছেন সমাজতান্ত্রিক চেতনার কথা। উপন্যাসের নায়িকা হেনা নিজে নারী হয়েও পুরোপুরি সামাজিক স্বাধীনতা আস্বাদনে ইচ্ছুক। পুরুষ যেমন অভিভাবকহীন, স্বেচ্ছাধীন মুক্তজীবন যাপন করে, তেমন একটা মুক্তজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষায় হেনা তার যুগের সামাজিক মানদণ্ড অগ্রাহ্য করে। তার কালের অন্যান্য মেয়ের জীবনযাত্রার মানদণ্ডে সে বিদ্রোহিনী। হেনাকে ধরে নেওয়া যাক বুর্জোয়া মানসিকতার অধিকারী আধুনিকা রূপে। তার ইচ্ছাপূরণে বাধা দিয়েছে সামন্তবাদী মূল্যবোধ-সম্পন্ন সমাজের প্রতিনিধি, হেনার পিতা। হেনার পিতা পেশায় ব্যারিস্টার, আচরণে জমিদারসুলভ, মোটামুটি আধা-বুর্জোয়া, আধা-সামন্তবাদী। হেনা বিয়ে করল না। কারণ পিতার নির্বাচিত পাত্র মামুন একদা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আত্মসম্মান ও আত্মাভিমানের জয় হল। অবিবাহিতা হেনা পিতার মৃত্যুর পর সামাজিক চাপের সম্মুখীন হয়। অভিভাবকহীন একা নারী এ সমাজের চক্ষুশূল। যদিও এ সমাজ কলকাতা-কেন্দ্রিক, প্রায় বিচ্ছিন্ন তবুও অচলায়তন মূল্যবোধগুলি আঁকড়ে রয়েছে সমাজের মানুষগুলি। হেনা মুসলমান, শিক্ষিতা নগরবাসী। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার মতো বিবাহিতা জীবনের বিধি নিষেধের দেওয়াল তার সামনে নেই। তার একটা প্রধান বাধা হতে পারত তার কুমারী জীবনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় অনুশাসনের কাঠিন্য। কিন্তু এই উপন্যাসে চিত্রিত মুসলমান সমাজ এমন ধর্মীয় পরিচয়হীন যে মুসলমান চরিত্রগুলি যে কোনো ধর্মের হতে পারে। সামাজিক বাঁধন ও পরিচয়ে শক্তমূল না হলে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষজাত দ্বন্দ্ব ফুটতে পারে না। সে কারণে হেনা যেমন অবাস্তব তেমনি অবাস্তব হয়েছে অন্যান্য চরিত্র। স্বাধীনচিত্ত হেনার মনে রঙ ধরিয়েছে ভণ্ড সমাজতন্ত্রবাদী হাশিম, যেমনটি ভণ্ড স্বদেশীআলা সন্দীপ রঙিন করেছিল বিমলার অন্তর। নিখিলেশ, মামুন, হেনা এই সব আকাশচুম্বী আদর্শবাদী চরিত্রগুলির গড়ন প্রায় এক। আদর্শের ক্ষেত্রে এরা দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, কিন্তু সে আদর্শ রূপায়িত করবার জন্য বিশেষ কোনো কর্মপদ্ধতি বা ব্যস্ততা এদের মধ্যে দেখা যায় না। ফলে এমন ধরনের চরিত্রগুলি আদর্শের ভারবাহী অশরীরী, বাস্তবে এরা ঠাঁই পায় না। তবু বাসনাময়ী বিমলা জীবন্ত হয়েছিল প্রেমের দ্বন্দ্বে।

আবুল ফজল যখন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করতে চাচ্ছেন তখন হেনা ও মামুনের প্রেমে প্রতিবন্ধক হিসাবে স্বাভাবিক কারণেই দেখাতে পারতেন দু'জনের অসম সামাজিক অবস্থান কিন্তু তা দেখানো হয়নি। তবে যে সত্য

তিনি তুলে ধরেছেন, সেটা হচ্ছে 'জীবনপথের যাত্রী'র উপনায়ক ও খল চরিত্র হাশিম রবীন্দ্রনাথের সন্দীপের মতোই কর্মী পুরুষ এবং উভয় উপন্যাসেই এরা নায়কের তুলনায় নায়িকার কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়। যে সামাজিক এক-ঘেয়েমী নারীর জীবনে সেই মন্থর গতানুগতিকতায় কর্মী পুরুষই নারীর হৃদয় অধিকার করতে সমর্থ হয়। নায়করা আদর্শের জন্য সামান্য কাজে নামে না। তারা কর্মবিমুখ এবং শিল্পী প্রকৃতির। উভয় লেখকই শেষপর্যন্ত আদর্শের জয় দেখাতে চেয়েছেন এবং খল চরিত্রের যোগ্য পরিণতিই দেখিয়েছেন। তবু এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, নায়কের তুলনায় প্রতিনায়করাই অধিকতর সক্রিয় ও জীবন্ত এবং সর্বোপরি বাস্তবর্তী। তাদের পরিণতি লেখকেরই আরোপিত ও ইচ্ছাধীন।

হেনা বা মুহসিন (হেনার সহোদর, বিদেশে থেকে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে) যদি কোনো জীবিকার্জনের মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক মুক্তি ও শোষণের সূত্রটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করত তাহলে তাদের সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা অনেকটা বাস্তব হত। এরা দু'জনেই উত্তরাধিকার সূত্রে ধনী। উপন্যাসের চরিত্রাবলীর স্বপ্রতিষ্ঠিত ও স্বোপার্জিত অনুধ্যান নয় বলে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা ও প্রচার সম্বন্ধে পাঠকের কোনো আস্থা জন্মায় না। মুহসিনের বোধের সঙ্গে একাত্মতা দেখানো হয়নি সমাজের বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণা ও বিক্ষুব্ধ অনুভূতির। জনজীবন এ উপন্যাসে যথাযোগ্য স্থান পায়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিকথার পরের কথা'র ধনীপুত্র শুভর চরিত্রটি জন-দরদী। জনগণের মঙ্গলেচ্ছায় সে অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছিল। কিন্তু জনসাধারণ শুভর মতো ধনীপুত্রদের দেখে সংশয় ও সন্দেহের চোখে। শুভ দরিদ্রদের সঙ্গে নিজের দূরত্ব ঘুচাতে জমিদার পিতা ও পৈত্রিক সম্পত্তি ত্যাগ করে নেমে এল সাধারণের মধ্যে যেমন এসেছিল মানিকের 'দর্পণ'-এর বিত্তশালী মমতা। মমতা বসবাস শুরু করেছিল বস্তীপাড়ায়। দরিদ্রের নির্মম জীবনযাত্রা যেমন এদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি শুভ ও মমতার উঁচুমানের বিলাসী জীবনের ইতিহাস দরিদ্রদের পক্ষে কষ্টকর স্মৃতি হয়ে দাঁড়াল। শুভেচ্ছার গভীরতা যতই নিবিড় হোক না কেন, এই দুই শ্রেণীর অবস্থান অনিবার্য প্রভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে ধনী শুভার্থী আর নিপীড়িত জন-সাধারণের মধ্যে।

মুহসিনের সমস্যা দরিদ্রশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া নয়, সে শুধু তাদের দুরবস্থা দূর করতে একটা পরিকল্পনা করেছে। তবু মুহসিনকে সরকার কারারুদ্ধ করল। কারণ তাদের মতো মানুষের "কথাগুলিই বর্তমান বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার মারণাস্ত্র।" 'জীবনপথের যাত্রী'র সাম্যবাদী চেতনা অগভীর হওয়াতে তা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'-এর কম্যুনিস্ট চরিত্রদের মতো হয়ে উঠেছে। 'মন্বন্তর'-এর চরিত্রগুলি

নামে সাম্যবাদী, কর্মে দুঃস্থসেবক কংগ্রেসী। বিপ্লবের কথা ও পথের উল্লেখে এরা ভীত অথচ নিপীড়িত জনগণের বেদনাকে এড়াতে পারে না। এক কথায় এমন ধরনের চরিত্রদের স্রষ্টা যতটা না সাম্যবাদী তার চেয়ে অধিক উদারনৈতিক মানবতাবাদী। সদ্য অর্জিত স্বাধীন দেশে এমন ধরনের উপন্যাস প্রকাশ করবার পেছনে বোধহয় লেখকের স্বদেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-ভাবনা জড়িত। অতীতকে বিশ্লেষণ করাতে তাঁর একটি সদিচ্ছা ফুটে উঠেছে। সে সদিচ্ছা সঠিক একটা পথ খোঁজার। প্রকাশকালের বহুপূর্বে রচিত বলে সম্ভবত এ উপন্যাসে পাকিস্তান প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। উপন্যাসের কোনো চরিত্র মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করছে না। উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয়েছে সে সময়ে তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল তেমন কোনো চাঞ্চল্য এ গ্রন্থে নেই। অতীতের প্রায় স্থির জীবনের ছকে তিনি দুটি নিগৃহীত জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে চেয়েছেন —একটি নারীর, দ্বিতীয়টি দরিদ্রের। হেনা মুক্তি পেল তার সনাতন কল্যাণময়ী নারীত্বের জাগরণে, দরিদ্রদের জন্য দেওয়া হল কর্মসূচীহীন সাম্যবাদী ইঙ্গিত অর্থাৎ 'ইটোপিয়ান' সাম্যবাদ। হেনার নারীত্ব শাশ্বত, তার জন্য কোনো বিপ্লবের দরকার হয়নি। তার চেয়ে অনেক বড় বিপ্লবী 'ঘরে-বাইরে'র বিমলা। হেনার অনেক আগের সময়ের গ্রামের জমিদারের স্ত্রী হয়েও ঘরের শিকল ভেঙে সে বাইরের জগতে চলে আসতে চেয়েছে। যদিও বিমলাকে ঘরের মধ্যে রাখবার জন্য তার মধ্যে একটা অস্ফুট মাতৃত্ববোধ দেখানো হয়েছে (অমূল্য চরিত্রের আমদানি এবং বিমলার মায়ের স্মৃতি স্মরণ)। তবু আধুনিক নাগরিকা হেনা বিমলার পাশে কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। সমাজতান্ত্রিক ধারণাও হেনাকে বিমলার চেয়ে আধুনিকা করতে পারল না। হেনা নিজে পুরুষের সমকক্ষ হবার জন্য বিদ্রোহ করেছিল। হেনার স্রষ্টা দেখেননি, হেনার সময়ের পুরুষরা নিজেরাই ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও সামন্তবাদী মানসিকতার দাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা প্রগতিশীল হয়েও যথোপযুক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গির অভাবে সুস্পষ্ট হয়নি। তবু নানা ত্রুটি ও ভ্রান্তি সত্ত্বেও একটা সুনির্দিষ্ট জীবন পথের ইঙ্গিত এতে রয়েছে বলে আবুল ফজলের প্রগতিবাদী কল্পনা বিশিষ্টতার দাবি রাখে এবং সে কারণেই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর লেখার ভালো ও অসঙ্গত দিক তুলে ধরা হল।

আবুল ফজলের পরবর্তী উপন্যাস 'রাঙ্গা প্রভাত' (চট্টগ্রাম, ১৩৬৪)। এই উপন্যাসে পাকিস্তান-পূর্ব ও বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ উপন্যাসের নায়ক স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমান নয় বলে পাকিস্তানের স্বপ্ন তার ছিল না। শ্রেণীস্বার্থ থেকে উদ্ভূত যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পাকিস্তান সৃষ্টিকে অনিবার্য করে তুলেছিল সেই সাম্প্রদায়িক বোধ কি করে অপসারিত করা যায়, লেখক সে পথই সন্ধান করেছেন। ব্যক্তিগত প্রেম কাহিনী

এবং পারিবারিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, নৈকট্য ও দূরত্ব দেখানো হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ভিত্তি লেখকের মতে চিত্তের উদারতা। কামালের মাতামহ আর চারুবাবুদের যুগে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তেমন অসদ্ভাব দেখা যায়নি। সাম্প্রদায়িকতাবোধের জন্ম —আবুল ফজল এ গ্রন্থে যেমন করে তুলে ধরেছেন তার উৎস হচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলমানের অক্ষম ঈর্ষা থেকে। মাদ্রাসা-স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ইকবাল সাহেব কামালকে খদ্দর পরবার জন্য ব্যঙ্গোক্তি করলে কামাল প্রত্যুত্তরে জানায়, খদ্দর দেশীয় জিনিস বলেই সে পরে। সে অন্য মুসলমানদের মতো বাইরের দিকে তাকায় না। এ দেশকেই নিজের দেশ বলে জানে। এ সব কথা শুনে ইকবাল স্যার ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে জানালেন যে, ছোট বড় মাঝারি সব চাকরিই হিন্দুরা জবর দখল করে নেয় এমন কি খদ্দরের মুনাফাটাও। কামালের যুক্তি হল যে, কেন মুসলমানরা শিক্ষায় হিন্দুদের সমকক্ষ হয়নি। স্বাতন্ত্র্যবাদী ইকবাল স্যার ক্ষোভের সঙ্গে বললেন যে, ওটা ইংরেজ শাসকদের কৌশল। হিন্দুদের ইংরেজ নিজের দলে নিয়ে মুসলমানদের শোষণ করেছে। আর হিন্দুদের সঙ্গে শক্তিতে পারবে না বলেই তার মতো নিরুপায় ব্যক্তিরা পাকিস্তান চায়। অবশ্যই কামাল তার শিক্ষকের দলের লোক নয়। বাল্যাবধি সে উদারচিত্ত। লেখক তাকে উদার করে এঁকেছেন।

অথচ আমরা দেখেছি কামালের সামাজিক পরিবেশ তার মতো উদার ছিল না। উদার ছিল না হিন্দু প্রতিবেশীদের মনেও। অবশ্য হিন্দু সমাজের এই অনুদারতার প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে 'মুসলিম লীগ'-এর জন্ম হচ্ছে সে কথাও 'রাঙ্গা প্রভাত'-এর হিন্দু চরিত্রের উক্তিতে রয়েছে। কামালের একান্ত কামনার রাষ্ট্র নতুন-পাকিস্তান নয়, এক কথায় সে আদপেই স্বাতন্ত্র্যবাদী বাঙালী মুসলমান নয়। তার চাওয়া-না-চাওয়ার প্রশ্নের বাইরেই পাকিস্তান সৃষ্টি হল। কামাল রাজনীতি পছন্দ করে না। শুধু তাই নয়, সে স্বেচ্ছায় রাজনীতির তথাকথিত কুটিলতা সযত্নে এড়িয়ে চলে। রাজনৈতিক দলাদলি তার অপ্রিয়। তবু এ দেশ যেহেতু তার স্বদেশ কাজেই নতুন রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যায় সে বিচলিত। মোহাজের সমস্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তির অনুপস্থিতি, সর্বোপরি নতুন করে জেগে-ওঠা সাম্প্রদায়িকতাবোধ। কামাল আদর্শ পাকিস্তানী মুসলমান হয়তো নয় কিন্তু সে উদার মানুষ। 'রাঙ্গা প্রভাত'-এর পাকিস্তান সব ধর্মের সব মানুষের জন্মভূমি। লেখকের মতে যে এ দেশকে নিজের দেশ, স্বদেশ বলে ভালোবাসতে পারছে সেই যথার্থ বাসিন্দা পাকিস্তানের।

দুটি হিন্দু মুসলমান বাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস। হিন্দু নায়িকা মায়া কামালের মতোই উদারনৈতিক। এর কাহিনীতে উভয় সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা রয়েছে এবং এর মধ্য দিয়েই মায়া ও কামালের প্রেম-সম্পর্ক গভীর হয়েছে। মায়ার ভাই মুকুল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে।

তার আশাও রয়েছে এ বিষয়ে কাজ করবার। কিন্তু যেহেতু সে কলকাতার মেডিকেলের ছাত্র সেহেতু দেশ বিভাগের ফলে আপন দেশেই প্রবেশ করতে গেলে বহু বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হতে হয়। মুকুল ও মায়ার পিতা চারুবাবু উদারনৈতিক স্বদেশভক্ত। পাকিস্তান হবার পরেও নিজের বাসভূমি সম্বন্ধে তার প্রীতিপূর্ণ ধারণা মনোহর। নিজের দেশ ত্যাগ করে বিদেশ তিনি গেলেন না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণ হারাতে হল। ওদিকে স্বাধীন কলকাতাতেও মহরম উপলক্ষে দাঙ্গায় অসংখ্য নিরীহ মুসলমান প্রাণ হারাল। কামাল বা চারুবাবু তাদের আন্তরিক ঔদার্য দিয়ে সমাজকে বদলাতে পারল না। মুকুলের একান্ত চেষ্টায় মায়া ও কামালের মিলন হল। মুকুল মনে করে সে তার সহোদরা মায়াকে নিজের মতবাদে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী করতে পেরেছে। আর মায়াও সমাজ-তান্ত্রিক ধারণা দিয়ে কামালকে প্রভাবিত করবে এমন আশাও সে রেখেছে। মুকুল উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সেতু রূপে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আস্থা রাখে। এ গ্রন্থের নায়িকা ও নায়ক দেশপ্রেমিক এবং লেখকের বর্ণনায় তারা সমাজতন্ত্রবাদীও বটে। তাদের দু'জনের মিলন একটা শুভেচ্ছার সম্মিলন। এমন সম্মিলনে সম্প্রদায়গত বাধার প্রাচীরটা ভেঙে পড়তে পারে এমন আশা লেখক করেছেন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মুকুল বলেছে, "...আমি কিন্তু মানবতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রেই বিশ্বাস করি না—এই তন্ত্র বা মন্ত্রের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক রূপ হল সমাজতন্ত্র। ...সব মানুষই আমাদের আত্মীয়—কেউ আমাদের পর নয়। এই ত সমাজতন্ত্রের বাণী" (২৯১)। এ হেন মানবপ্রীতির প্রকাশে মানবতাবাদী লেখকই স্পষ্ট হন, সমাজতন্ত্রবাদী লেখক নন। 'মানুষের সত্যিকার মুক্তি' যে পথে আসবে বলে মুকুল প্রচার করছে সে দুর্গম পথের কোনো মানচিত্র উপন্যাসে নেই। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের উদ্যম ও প্রস্তুতি লক্ষণীয় হওয়া উচিত তেমন কোনো কর্মসূচী এ গ্রন্থে নেই। এমন কি মায়া বা কামাল যে সমাজতন্ত্রে সত্যিই আস্থা রাখে এমন কোনো প্রমাণও নেই। দেখা যাচ্ছে, লেখকের বিশ্বাস চরিত্রদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। সমাজতন্ত্রের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে লেখকের উদাসীনতা এ জন্য দায়ী।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। কামাল রাজনীতি পলাতক। সে মানবতাবাদী, দুঃস্থ-সেবক, শিক্ষাব্রতী। তার ধারণায় "রাজনীতির মানে হচ্ছে দলাদলি"। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ তার আদপেই পছন্দ নয়। সাম্প্রদায়িক মনো-ভাবকে সে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে। এমন হীন মনোবৃত্তি যাতে আর কার্যকরী না হয় এ ধরনের আশা সে পোষণ করে। উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাই লেখক চিত্রায়িত করেছেন। য়ুনুস নামে একজন ছাত্রনেতা 'রাঙ্গা

প্রভাত'-এর হিন্দু শিক্ষকদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব তুলে ধরেছে। য়ুনুস তার শিক্ষকদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখে হয়ে পড়ে গোঁড়া মুসলিম লীগ সমর্থক। এই চরিত্রটি এ উপন্যাসের একটি জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র। য়ুনুস শক্তিশালী অশুভের প্রতীক। ছাত্র রাজনীতি করে সে ক্ষমতা দখল করতে চায়। বহুদিন ধরেই য়ুনুস ক্ষমতালাভের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ধর্মকে সে শিক্ষার ক্ষেত্রে টেনে এনেছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। য়ুনুস ক্রমশ অধিকতর শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

আবুল ফজল একটা সত্য বিবেচনা করে দেখেননি। সে সত্যটা হচ্ছে কামালের মতো দলছাড়া, ব্যক্তিগত দাতব্যে বিশ্বাসী এবং রাজনীতি থেকে পালানো ব্যক্তিরাই য়ুনুসদের অশুভ রাজনীতিতে তৎপর করে তুলতে সাহায্য করে। কামাল দলবাদে বিশ্বাস করে না। অথচ মুকুল যে সমাজতন্ত্রের কথা বলছে এবং সে জন্য সে যে পার্টির সদস্য সেই পার্টিতেও দলে টানবার প্রবণতা দেখানো হয়েছে। অথচ মুকুল দলে টানবার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলেনি। মায়া বা কামাল মুকুলের পার্টিতে যোগ দেবে এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখানো হয়নি। তবু আমরা এমন একটা ধারণা সহজেই করতে পারি সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি লেখকের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু পার্টির আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তাঁর পছন্দ নয়।

একটা সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে তাঁর উপন্যাসের সমাজতান্ত্রিক প্রচার সার্থক রূপ পায়নি। সাম্প্রদায়িকতার মূলশক্র ও প্রশ্রয়দাতা যে সাম্রাজ্যবাদের দাস স্বার্থবাদী শাসকচক্র এমন কথাও তিনি কোথাও তুলে ধরেননি। তবুও যেহেতু সাম্প্রদায়িকতাবোধ এই উপন্যাসের রচনা ও প্রকাশকালীন সময়ে এই উপমহাদেশে যখন-তখন বিষোদগার করছে সেহেতু তাঁর এমন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচার শাসকশ্রেণীর স্বার্থে আঘাতকারী। সাম্প্রদায়িক সমস্যা তখন একটি পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা রূপে বিরাজ করছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা যেহেতু স্বার্থবাদী চক্রের একটি রাজনৈতিক খেলা সে জন্য এ সমস্যার সমাধান যারা করতে আগ্রহী তাদেরও কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের অধিকারী ও সমকক্ষ হতে হবে। এ ধরনের উপন্যাসে নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য নায়কের চরিত্রে একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিতে সাহায্য করে। যেমন আমরা দেখেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এর প্রণব, গোকুল চরিত্রে। মানিকের সঙ্গে আবুল ফজলের তফাৎ এখানেই। মানিক যেমন স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, আবুল ফজলের পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনুন্নতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষাবিদ আবুল ফজল 'রাঙা প্রভাত'-এর কামালের মতো রাজনীতির জটিলতা পছন্দ করতেন না। তিনি ঔপন্যাসিক নন, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী। তিনি সার্বক্ষণিক

লেখকও নন, কারণ লেখা তাঁর পেশা নয়। তাঁর সামাজিক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশে মার্কসবাদী চিন্তা প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। সে সময়ে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি —সর্বত্রই ছিল মুসলিম লীগের প্রাধান্য এবং প্রবল সাম্প্রদায়িকতার বোধ। এই পরিবেশে থেকেও ও মাদ্রাসা তাঁর শিক্ষা-জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও[৭৯] তিনি হয়েছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। 'বুদ্ধির মুক্তি'র চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি যে তাঁর সমাজের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় ছিল এ কথা যেমন তার, সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এক ধরনের বুর্জোয়া উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী আন্দোলন। এর কেন্দ্রীয় চেতনা যেমন সামন্তবাদ বিরোধী তেমনি আবার মার্কসবাদ বিরোধীও। এই আন্দোলন মানব-মুক্তির বস্তুগত ভিত্তিকে উপেক্ষা করে এবং সামন্তবাদী ও ভাববাদীদের মতো উদার বুর্জোয়া আইডিয়া গ্রহণ করাকেই মুক্তির পথ বলে বিবেচনা করে। এঁরা আস্থাশীল ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর। ইউরোপীয় সভ্যতার এঁরা অনুরাগী ছিলেন এবং পশ্চিমের অনুকরণে এ দেশে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটাবেন বলে আশা করতেন। কিন্তু বস্তুগত ভিত্তি ছাড়া যে আধুনিকতা আসতে পারে না, সংস্কৃতির উপর-কাঠামো যে অর্থনীতির মূল কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল এই সত্যটি তাদের অজানা না থাকলেও তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় গুরুত্বলাভ করেনি।[৮০]

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নায়ক ছিলেন দু'জন —কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন। এঁদের মধ্যে আবুল হুসেন রাজনীতি ও অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ঐ আন্দোলনের ওপর আবুল হুসেনের তুলনায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রভাব ছিল অধিক। আবদুল ওদুদ মূলত সাহিত্যিক এবং তার চিন্তায় অর্থনীতি তেমন স্থান পায়নি।[৮১] 'সাহিত্য সমাজ'-এর নামকরণেও সাহিত্যের প্রতি এঁদের বিশেষ পক্ষপাত প্রতিফলিত। এ ছাড়া 'বুদ্ধির মুক্তি'

———————

আন্দোলন জনগণের আন্দোলন ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই এ আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ। 'বুদ্ধির মুক্তি' রাজনীতি-বহির্ভূত আন্দোলন —অল্প কিছু লোকের বুদ্ধিতে খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টির মধ্যেই এ আন্দোলনের কর্ম সীমা নির্দিষ্ট ছিল।

এ ছাড়া বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টিতে যেমন ছিল হিন্দু প্রাধান্য তেমনি এ পার্টি ছিল জনজীবন থেকে দূরে। তদুপরি সরকার কর্তৃক কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং পার্টির অনেক কর্মী কারারুদ্ধ হওয়াতে কম্যুনিস্ট সংগঠন গোপন এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তো পরের কথা মার্কসবাদী চিন্তাও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসবাদ যে নাস্তিক্যবাদের প্রচারক এই ধারণা অনেকের পক্ষে এই মতবাদকে গ্রহণ করাব পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। অন্য সকলের মতো আবুল ফজলও এই নিষেধের মধ্যে ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কালে তিনি পরিণত বয়সের মানুষ এবং সর্বোপরি সরকারী কর্মচারী। তাই তাঁর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা স্বাভাবিক ছিল এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু এর মধ্যেও দেখছি যে তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন যদিও এই সমাজতান্ত্রিক ধারণা ভাববাদী। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মতো তাঁর উপন্যাসে কোনো শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চিত্র নেই। তাঁর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্ররা কেউ শ্রেণীচ্যুত নয়; শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে এদের কোনো যোগই নেই। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের সত্য মানিকের উপন্যাসে প্রেম-বিবাহ সমস্যার চেয়ে বড় সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আবুল ফজল প্রেম ও বিবাহ সমস্যাকে (হিন্দু-মুসলমানের বৈবাহিক মিলন) প্রধান করে দেখেছেন। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে পীড়িত পরিবেশে এমন ধারণা অবশ্যই উদারনৈতিক, কিন্তু যে ধরনের বিবাহের কথা তিনি বলছেন তা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয় —এ শুধু সাহিত্যেই সম্ভব। আবুল ফজল সমস্যাকে দেখেছেন অরাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে। ফলে সমস্যাগুলির জনক স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা বা শাসকদের তিনি দেখতে চাননি। রাজনীতির দলাদলিতে তাঁর অনীহা, তবু প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্যাগুলির কুফল দূর করবার জন্য তিনি নিজেও একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবনার কথা বলেছেন। কিন্তু সেই প্রগতিশীল ধারা বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে তার কথা তিনি বলেননি। এই উপন্যাসের একটি বড় ত্রুটি, কামাল বা মায়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু নায়ক বা নায়িকা অনুরূপ কোনো কর্মসূচীর বিবরণ দেয়নি।

উপন্যাসের বক্তব্য ও চরিত্রের যে সামঞ্জস্যহীনতা সে ত্রুটি কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে অনেকটা অনুপস্থিত। প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে প্রাবন্ধিক আবুল ফজল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। উনিশ শো সত্তর সালে পূর্ব বাংলার জটিল রাজনৈতিক দুর্যোগের

মধ্যেও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি উপন্যাসের তুলনায় স্পষ্টতর ও জোরালো রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করেছেন। যদিও নিজে রাজনীতি পছন্দ করেন না, কিন্তু ক্রমশ তিনি রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং আর উপন্যাস লেখেননি। সময়ের ব্যবধানে তাঁর বক্তব্য স্বচ্ছ হয়েছে, "রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক সমতা ছাড়া সামাজিক সমতা আসতেই পারে না। এ তিন ক্ষেত্রে সমতা ছাড়া সমাজ দেহ থেকে অবিচার আর শ্রেণীগত ব্যবধান দূর হওয়ার নয়।"[৮২] অবশ্য পরবর্তীকালে প্রবন্ধে তাঁর অনেক মতামত আমরা দেখি। কিন্তু মতগুলি সুসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসেব সৃষ্টি করে না। এগুলি সাধারণ মত, কোনো মতবাদ হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর উপন্যাসদ্বয়ের বক্তব্যের তুলনায় এমন ধরনের প্রবন্ধের মধ্যে তিনি অনেক শক্তিশালী আবেদন রাখতে পেরেছেন। 'রাঙ্গা প্রভাত' ও 'জীবনপথের যাত্রী'র উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারণা আকর্ষণীয়; কিন্তু গ্রন্থ দুটি শিল্পোত্তীর্ণ হয়নি বলে আদর্শের অন্তর্নিহিত আবেদনও শক্তিশালী হতে পারেনি। উপন্যাসদ্বয় আইডিয়া সর্বস্ব হয়ে গেছে। কামালদের সাম্প্রদায়িকতা বোধ অপসারণের যদি কোনো বাস্তবমুখী চিত্র দেওয়া হত তাহলে সংঘর্ষের মুখোমুখী এসে দাঁড়াত শাসক সাম্প্রদায় বা তাদের প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু তেমন কোনো বাস্তবভিত্তিক সংঘর্ষ-চিত্র বা সমাজতান্ত্রিক ধারণার জন্য কোনো শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা এতে নেই, সে কারণে উদারচিত্ত নায়ক-নায়িকা ধর্মীয় গোঁড়ামী মুক্ত হয়েও বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত চরিত্র হতে পারেনি।

তুলনায় আবুল মনসুর আহমদ শক্তিশালী লেখক। তিনি তাঁর উপন্যাসে বহু অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। 'জীবনক্ষুধা' (ময়মনসিংহ, ১৩৬২) উপন্যাসে তিনি অনায়াসে পুঁথির জগতের আদলে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে দিয়েছেন আবার ঐ কুহকের জগৎ দ্রুতগতিতে পেরিয়ে কোনো বাস্তব ঘটনার কেন্দ্রে এনে পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন। দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দগতি বলে ঘটনাগুলি বা চরিত্রের কার্যাবলীর অবিশ্বাস্যতা প্রমাণিত হবার আগেই তা কুহকের মতো সরে যায়। পাঠক পুনরায় বাস্তব জগতে বিচরণ করে লেখকের আকর্ষণীয় কাহিনী বলবার ক্ষমতার গুণে। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসের নায়কের জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহের অধিকাংশ বিশেষ করে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসমূহ বাস্তবভিত্তিক। যে রাজনীতির সঙ্গে নায়ক যুক্ত সে রাজনীতি একটা প্রত্যক্ষ সত্য এবং লেখকের আত্মজীবনীমূলক লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' পড়লে দেখা যায় তাঁর নায়ক যে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিনি স্বয়ং ঐ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ-

৮২॥ "বিদেশী ইজ্‌ম কথাটার অর্থ কি", 'সমকালীন চিন্তা', (ঢাকা, ১৯৭০), পৃ. ১৯৬।

ভাবে যুক্ত। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসেও বিধৃত। তিনি যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই আন্দোলনের ধারাকেই তিনি 'জীবনক্ষুধা'য় রূপায়িত করেছেন। ফলে উপন্যাসে কিছু অবান্তর ঘটনা থাকা সত্ত্বেও তা ছাপিয়ে একটা রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রধান হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটি কাহিনীপ্রধান। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স যেন শতাব্দী পেরিয়ে নব রূপে বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। বঙ্কিমের রোমান্সের কাল ছিল অতীত আর লেখা হয়েছিল রাজ-রাজড়ার জীবন নিয়ে। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সমকালের কৃষক-সন্তানকেই রাজকীয় মহিমায় উন্নীত করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন জোরালো হবার সামান্য কিছু আগে থেকে কাহিনী শুরু হয়েছে। নায়ক হালিম একজন শিক্ষিত আধুনিক যুবক। তার জীবনে দুটো পর্ব। তার আদর্শজাত দ্বন্দ্ব থেকে এই পর্ব ভাগ। হালিম নিজে অত্যন্ত দরিদ্র। কিন্তু তার সামনে খোলা রয়েছে ধনী হবার রাস্তা। সে গৃহশিক্ষক রূপে জমিদারের অন্তঃপুরে অবাধে বিচরণ করে, তার সামনে উন্মোচিত হয় সৌভাগ্যের দ্বার। তবু হালিম দরিদ্র থাকাকেই ভালো মনে করে। ধনীর সঙ্গে অন্যায় আপস করে বড়লোক হওয়া তার পছন্দ নয় মোটেই। হালিম পরে অবশ্য ধনী হয়েছে এবং নিজের পরিশ্রমে বড় ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হালিমের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে দরিদ্র মুসলমানদের শিক্ষালাভের নির্মম ইতিহাস। তার জীবিকাযুদ্ধের বিবরণে প্রস্ফুটিত বেকার সমস্যা ও তার করুণ পরিণাম। হালিমের পিতা মাতা, প্রথমা স্ত্রীর গ্রামীণ জীবনযাত্রায় বর্ণিত দরিদ্র কৃষক পরিবারের কঠিন জীবনযাপনের চিত্র। হালিমের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়ার পেছনে রয়েছে বাঙালী মুসলমান কেমন করে ক্রমশ অসাম্প্রদায়িকবোধ ও কৃষক-বান্ধব রাজনীতির পথ ছেড়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম রাজনীতির আশ্রয় নিল তার ক্রমপরিণতির ইতিকথা। 'জীবনক্ষুধা' বলতে কেবলমাত্র হালিমের ব্যক্তিজীবনে বড় কিছুর জন্য ক্ষুধা ও অমৃতসন্ধানী অনুসন্ধিৎসা নয়। আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, ব্যক্তির মতো একটি জাতিরও মহৎ ক্ষুধা থাকে। যখন এমন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তখন জাতীয় জীবন নিবৃত্তির সন্ধানে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং একদিন অমৃতের খোঁজ পেয়ে তৃপ্তি বোধ করে। মুসলমান জাতি যখন এই উপমহাদেশে নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজছিল সেটা ছিল তাদের জাতীয় জীবনে বৃহত্তরের জন্য ক্ষুধা এবং জাতির এমন ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্বেষার ফলে জন্ম নিয়েছিল তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান।

আবুল মনসুর আহমদ মূলত ব্যঙ্গ-লেখক। 'জীবনক্ষুধা'র মতো গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুর অখণ্ড চমকপ্রদ উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি স্যাটায়ারিস্ট নন এবং স্যাটায়ারিস্ট হতে পারেননি বলে এখানে তিনি হয়েছেন ঔপন্যাসিক। কেন না জীবনকে এখানে তিনি দেখেছেন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে। ১৯৫৫ সালে

অর্থাৎ পাকিস্তান হবার প্রায় আট বছর পর তিনি এই উপন্যাসের কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরলেন পাকিস্তান আন্দোলনের কথা। এই সঙ্গে বিবরণ দিলেন কোন শ্রেণীর বাঙালী মুসলমানের আকাঙ্ক্ষায় আদর্শান্বিত পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল।

হালিমের মতো কৃষক-সমিতির যুবক কেন পাকিস্তানকে অনিবার্য সত্য বলে গণ্য করল সে সত্যও তুলে ধরা হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ আবুল ফজলের মতো 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের কর্মী ছিলেন না। তিনি ছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি'র কর্তাব্যক্তি। একাধারে তিনি রাজনীতিবিদ ও লেখক। আগে তিনি ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি পরে হয়েছেন বিশিষ্ট মুসলিম লীগ পন্থী। অর্থাৎ 'পূর্ব-পাকিস্তানী' মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস তাঁর রাজনৈতিক পালাবদল এবং বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম। সংস্কৃতিগতভাবে অবশ্য তিনি বাঙালী মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার আগে থেকেই সভা-সমিতিতে সে কথা বলেছেনও। বাঙালী মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ঐতিহ্য সন্ধানে তিনি পেছনে ফিরে পুথি সাহিত্যের দিকে চেয়েছেন। "পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁস আসবে এই পুথি সাহিত্যের বুনিয়াদে" —এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর অমন বিশ্বাসের যথার্থ রূপায়ণ 'জীবনক্ষুধা'। পুথি সাহিত্যের 'স্পিরিট' তিনি তাঁর উপন্যাসেও আনতে পেরেছেন।

চাষীর ছেলে হালিম উচ্চশিক্ষার দৌলতে জমিদার বাড়ির অভিজাত পরিবেশের সংস্রবে সহজেই আসতে পারে। সুশিক্ষিত এবং তার সহৃদয় ব্যক্তিত্বের জন্য সে যেমন অভিজাত ধনী ব্যক্তিদের কাছে সম্মান পেয়েছে অন্যদিকে দরিদ্র ব্যক্তিরাও তাকে শ্রদ্ধা করে। হালিম আদর্শবাদী ও সহানুভূতি-সম্পন্ন বলে কোনো দরিদ্র ব্যক্তির ওপর নির্যাতন দেখলে সে নিজের বিপদ ডেকেও প্রতিবাদ করে। হালিম দিগ্বিজয়ী। সে অবলীলায় পরমাসুন্দরী জমিদারের কন্যার হৃদয় দখল করে, ইংরেজ সাহেবকে যুক্তিতর্কে মুগ্ধ করে তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজের সৌভাগ্যের সোপান সৃষ্টি করে নেয়। সাহসী হালিম ইংরেজের সমালোচনা করেছে কিন্তু সে সমালোচনায় ইংরেজরা যে শোষক এমন উল্লেখ নেই। ইংরেজ হাকিমের সহৃদয়তায় হালিমের ভাগ্যের মোড় ঘুরে গেল। সে হয়ে দাঁড়াল পুথির বীরদের কতকটা আধুনিক সংস্করণ। এরপর বুর্জোয়া হালিমের চরিত্রের পরিবর্তন লেখক দেখিয়েছেন কিছুটা কৌতুক রসাশ্রিত করে।

হালিম যখন দরিদ্র ছিল তখন সে দরিদ্রদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করত। সে নিজেকে শ্রমজীবী শ্রেণীর বলেই ভাবত। মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া হালিম কিন্তু দরিদ্রদের দেখতে শুরু করল সমাজের বাড়তি অভিশাপ হিসাবে, "এতদিন তার কাছে সাম্যই ছিল জীবনবিধি, আজ তার মনে হয় সাম্য নয়, প্রতিযোগিতাই

জীবনবিধি" (২৩৯)। আসলে হালিমকে লেখক যত শিক্ষিত ও ধনী অর্থাৎ বুর্জোয়া ভাবাপন্ন করুন না কেন তার মানসিকতা আচ্ছন্ন সামন্তবাদী ধারণায় ও বোধে। ধনীজীবনে সে আদর্শচ্যুত হল, দরিদ্রদের ভুলে গেল। কিন্তু বিবেকের দংশনে সে আবার কৃষক-প্রজাদের যে পার্টি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। রাজনীতিতে যুক্ত মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করে হালিম এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, সে এবার মুসলিম লীগের হয়ে কাজ করবে, "কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের মত শ্রেণীসংগ্রামের নামেও আজিকার জাতীয় সংগ্রামকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। সে চেষ্টাই হইবে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সুতরাং অবৈজ্ঞানিক" (৩৯২)। আমরা আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিকথায় দেখেছি যে, তিনিও ঠিক অনুরূপ যুক্তিতে কৃষক-প্রজা আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন।

হালিম পাকিস্তান আন্দোলনকে গণমুখী করবার জন্য কৃষক-শ্রমিকদের সমাবেশে ভবিষ্যৎ মুসলিম রাষ্ট্রের একটা শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো তুলে ধরে। ফলে মুসলমান কৃষক, শ্রমিকও মুসলিম লীগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। হালিমের সংঘর্ষ বাধল ইংরেজ মালিক ও কোম্পানি-সংশ্লিষ্ট মাড়ওয়ারী পাট ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সঙ্গে। হালিম চাকরি ছেড়ে দিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠল। কোম্পানির সাজানো মামলায় অতঃপর তাকে যেতে হল কারাগারে। অবশ্য কারাগারে যাবার আগে সাহেবজাদী লুৎফুন্নিসাকে অভাবনীয় রূপে সে দ্বিতীয় স্ত্রী রূপে লাভ করল।

পাকিস্তান কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে হালিম কারামুক্ত হল। ফিরে পেল তার চাকরি ও সম্পদ। স্বাধীন রাষ্ট্রে অযাচিত সৌভাগ্যময় এবং দ্বিতীয় বিবাহোত্তর জীবনের সুখশান্তির মধ্যেও পুনরায় সে বিবেকের দংশন অনুভব করল। সে দেখল উভয় রাষ্ট্রের বাস্তুত্যাগীদের কি অসীম দুঃখ-দুর্দশা। ব্যক্তি-জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সব দুঃখ-পীড়িত বাস্তুত্যাগীদের জীবন-ক্ষুধার স্বরূপ কি আর নিবৃত্তিই বা হবে কিসে —এর কোনো সদুত্তর সে পায়নি।

উনিশশো পঞ্চান্ন উপন্যাসের প্রকাশকাল। ঐ সময়ে তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান' হতাশাচ্ছন্ন ছিল। আবুল মনসুর আহমদ তেমন হতাশাজনক পরিবেশ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। আবুল ফজলের মতো সর্বধর্ম-মুক্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি অতীত ইতিহাস স্মরণ করেননি, করেছেন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে। তাঁর উপন্যাসে রয়েছে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য, যেমনটি ছিল 'আনন্দমঠ'-এ হিন্দুদের। হিন্দু চরিত্রগুলি সংখ্যায় নগণ্য হলেও উজ্জ্বল। যেমন মুসলমান জমিদারের হিন্দু নায়েবটি অর্থলোভী পিশাচ। আর পাকিস্তান আন্দোলনের এক হিন্দু-সমর্থক জনৈক গরীব চাষীর মুসলমান ভাইদের প্রতি প্রীতির কারণটা

ব্যক্তিগত। কিছু সহৃদয় মুসলমানের সাহায্যে সে তার জমিজমা হিন্দু জমিদারদের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। এই জন্য সে মুসলমানদের আপন ভাবে। কিন্তু উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রচারে ঐ দরিদ্র হিন্দু কৃষকেরও মনে হল যে পাকিস্তান হলে হিন্দুদের আর রক্ষা নেই।

দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামী না থাকা সত্ত্বেও হালিম দ্বি-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। অবশ্য এই উপন্যাসের সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় (৩৯৭-৪০২) হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতা আঁকতে গিয়ে লেখকের মধ্যেও যে একটা সাম্প্রদায়িকতাবোধ আছে সেটা অস্পষ্ট থাকেনি। লেখকের বর্ণনানুযায়ী হালিম ধর্মীয় গোঁড়ামী মুক্ত, কিন্তু তার মানসিকতা, আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালী ভীষণভাবে সামন্তভাবে আচ্ছন্ন। তবু লেখকের জোরালো সমর্থন পেয়ে হালিম চরিত্রটি বাস্তব ও সার্থক হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী মানসিকতা হালিমের মতো অখণ্ড বাংলার মুসলমানদেরও ছিল। তবে অধিকাংশের মনে সব চেয়ে বেশী ছিল শোষণমুক্ত পাকিস্তানের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা। হালিম কৃষক-শ্রমিকের সভায় যে শোষণমুক্ত পাকিস্তানের কথা বলেছিল তার বাস্তবভিত্তিক কোনো অর্থনৈতিক সূচী সে দেয়নি। কারণ শ্রেণীস্বার্থে উদ্বোধিত পাকিস্তানবাদী নেতাদের অমন কোনো কর্মসূচী ছিলই না আর বাঙালী মুসলমান-মধ্যবিত্ত নেতা ঐ সব নেতাদেরই সহচর।

সামন্তবাদী মানসিকতা ও বুর্জোয়াপন্থী আদর্শে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন রাজনীতিবিদ লেখক আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, "...প্রজা-আন্দোলন ছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। সামন্তরাজদের বিপুল সংখ্যাধিক লোক হিন্দু হওয়ায় এবং মুসলমান মধ্যবিত্তেরা এই সামন্ততন্ত্রের কোন সুবিধা না পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে প্রজা-আন্দোলন এতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল।"[৮৫] কৃষক আন্দোলন যখন একশ্রেণীর স্বার্থে গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করল তার পেছনের কারণ তিনি দেখিয়েছেন, "এই আন্দোলনে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী বামপন্থী একদল কর্মী ছিলেন বটে, এবং তাঁদের চেষ্টায় প্রজা-আন্দোলন বাধ্য হইয়া কৃষক-আন্দোলনের আকৃতি-প্রকৃতিও কিছুটা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক কারণেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পান নাই...।"[৮৬] যিনি এমন গণমুখী আন্দোলনে মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই জানতেন পাকিস্তান আন্দোলনে কোন শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধ হবে। ১৯৪২ সালে পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটির সভায় তিনি সে কথা বলেছিলেনও,

"ভদ্রলোক হিন্দু ও ভদ্রলোক মুসলমানের সঙ্কীর্ণ শাসনিক স্বার্থের টক্কর লেগেছিল বলেই আজ 'পাকিস্তানে'র কথা উঠেছে।"[৮৫] অথচ উপন্যাসটিতে তিনি স্পষ্ট করে এ কথা কোথাও বলেননি। বরং পাকিস্তান সৃষ্টির অনিবার্যতা সম্পর্কে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে তিনি ভদ্রলোকদের সমালোচনা না করে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এর কারণ স্পষ্ট।

'ভদ্রলোক' হালিমদের জন্য পাকিস্তান এনে দিল অপ্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা। 'ভদ্রলোকে'রা অনেক সময়ই বিবেকবান হয়ে ওঠে। মানবিক দুঃখ-দুর্দশা প্রায়ই তাদের ভাবিয়ে তোলে। তবে তারা আত্মসচেতন ও স্পর্শকাতর। তা নইলে শত সহস্র উদ্বাস্তুর দুর্দশায় বিচলিত হালিম ভিন্ন দৃষ্টিতে 'জীবনক্ষুধা'র অর্থ সন্ধান করত। যে হালিম ক্ষুধার জ্বালায় একদা খাবার চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল আজ ভদ্রলোক হয়ে সেই হালিমই যথার্থ ক্ষুধার জ্বালা বিস্মৃত হয়েছে (শিক্ষিত যুবক হালিম চুরি করতে বাধ্য হলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় কিন্তু আমরা জানি যে, অভদ্র লোকেরা চুরি করলে তাদের কারাদণ্ড হয়)। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখলে হালিম দেখত যে জীবনক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য লোকজন (যাকে সে বলেছে বৃহত্তর জাতীয় ক্ষুধা)[৮৬] সব ছেড়ে পালাচ্ছে না, পলায়ন করছে জীবন বাঁচাতে। সে সত্যটা বলতে গেলে হালিমকে শাসক সম্প্রদায়ের রূঢ় সমালোচনা করতে হবে। সে যে ঐ সমালোচকের ভূমিকায় নামবে না এ জানা কথা।

'জীবনক্ষুধা'য় নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে লেখকের সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনার পরিচয় বহন করে। এই উপন্যাসে নারী-স্বাধীনতার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। হালিমের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি আচরণে তার সামন্তবাদী চেতনাই প্রকট হয়ে ওঠে। আবুল ফজলের উপন্যাসে নারীর যেমন একটা উঁচু স্থান রয়েছে তেমন সম্মানিত স্থান 'জীবনক্ষুধা'য় নারীর জন্য নেই। এখানে নারী চরিত্রগুলি তাদের সামন্ততান্ত্রিক কিন্তু বাস্তবভিত্তিক সামাজিক ভূমিকা পালন করেছে।

৮৫॥ 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৮৬॥ হালিম উদ্বাস্তুদের দেখে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় বলেছে যে, "এ সব লোক এমন কিছু চায় যা তারার নাই। কি তারার নাই তাও যেমন তারা জানে না, তেমনি কি তারা চায় তাও তারা জানে না।। ...এই যে অতৃপ্তি, এইটাই জীবন। এরই নাম জীবনক্ষুধা। এটা ব্যক্তির জীবনে যেমন সত্য, জাতির জীবনে তেমনি সত্য" (৪৭৪)। অবশ্য হালিম না জানুক সবাই জানে এরা কি চায়। এরা চায় —জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা।

ভাষার ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন পুথি আর যাত্রার চড়া স্বর। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের পরেও তিনি এখানে স্বাতন্ত্র্যধর্মী পুথি-প্রভাবিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এমন রীতির ভাষা প্রয়োগ করতে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর জন্য স্বতন্ত্র কালচারের দাবিতে মুখর আবুল মনসুর আহমদ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেন তার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট হয় তাঁর আঞ্চলিকতাচ্ছন্ন সামন্তবাদী মনোভাব। ভাষার মধ্যে আরবি-ফারসি আর অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক শব্দ যোজন করলে হয়তো তা মুসলমানের ভাষা হয়ে উঠবে কিন্তু শিল্পসম্মত ভাষা হয় না।[৮৭] অবশ্য গ্রামীণ জীবনকে গ্রাম্য ভাষায় দেখার মধ্যে বাস্তব দিকও রয়েছে, কিন্তু 'জীবনক্ষুধা'র অধিকাংশই শহুরে জীবনভিত্তিক, তবু ভাষার মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য।[৮৮]

আবুল ফজল কলকাতার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না। অথচ কলকাতার বাইরে থেকেও তিনি ভাষা ও শহরের জীবনের বর্ণনায় লক্ষণীয় রূপে মহানগরীর অধিবাসী। আবুল মনসুর আহমদ জীবনের অনেকটা সময়

৮৭॥ এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি না দেবার কারণ সম্পূর্ণই অর্থনৈতিক। কিন্তু বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করবার জন্য অবাঙালী শাসক সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে একটি হাস্যকর যুক্তি তুলতে শোনা গেছে। এদের মধ্যে নামকরা এক নেতা মনে করতেন বাংলা ভাষা সংস্কৃত অক্ষরমালা সম্বলিত, অথচ উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় ফারসী অক্ষরমালা প্রধান। সংস্কৃতানুসারী হবার জন্য না-কি বাংলা ভাষাভাষীর হিন্দুয়ানী ঘুচবে না এমন ছিল তাঁদের ধারণা। অথচ ভাষা আন্দোলনের আগে পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বাংলাভাষী ছিলেন শতকরা ৫৪·৬, পাঞ্জাবীভাষী, ২৮·৪ এবং উর্দুভাষীর সংখ্যা মাত্র ৭·২। —Keith Callard, *Pakistan a political study*, (London, 1957), p. 180.

৮৮॥ 'জীবনক্ষুধা'র ভাষার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল: 'মিঠাইর দোকান-কেই খেচিয়া হালিমের দিকে আনিতে থাকে' (১০১); 'ঢেউ খেলানো পানিতে জোছ্না রূপার চিলিক মারিতেছে' (১৩০): 'সুখটানের ধুঁয়া নাকে-মুখে বুন্দা-বুন্দা ছাড়িতে লাগেন' (১৩৮); 'শরমে মরা দ্রৌপদীরা যেন দুহাতে ছত্তর ঢাকিয়া মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে' (২৩১); 'হাজী সাহেব রেশরাফতির এই এলযাম বরদাশত করিলেন না' (২২৮); 'এমন বেদরদ লা-জওয়াব যার স্ত্রী' (২৩৪) ·· ···ইত্যাদি।

কলকাতায় কাটিয়েছেন, মহানগরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর লেখায় তাঁর অঞ্চলের প্রভাবই সমধিক। এমনটা হতে পেরেছে এই জন্য যে, একজনের মানসিকতায় উদার বুর্জোয়া প্রভাব বেশী, অন্য-জনের ওপর বুর্জোয়া প্রভাব প্রবলভাবে কার্যকরী হয়নি। অথচ উপন্যাস বিচারে 'জীবনক্ষুধা' আবুল ফজলের উপন্যাসদ্বয়ের তুলনায় সার্থক রচনা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবুল মনসুর আহমদ সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর প্রতিভা যোগ্য বুর্জোয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হলে তিনি শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি এরপর আর কোনো সার্থক উপন্যাস রচনা করতে পারেননি। তার একটি কারণ তিনি রাজনীতিতে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়লেন; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্লিপ্ততা তাঁর পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পাকিস্তান যে নতুন সুযোগ, সুবিধা ও দায়িত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য সৃষ্টি করেছিল তিনি তাঁর শ্রেণীর আর পাঁচজন মানুষের মতো তা গ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই ব্যস্ততা সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক নয়। এ কথা সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার প্রায় সব লেখকের ক্ষেত্রেই কম-বেশী সত্য।

আবুল মনসুর আহমদের সমর্থন ছিল পুথির প্রভাবান্বিত ভাষা ব্যবহারের প্রতি। এমনটা থাকার কারণ হচ্ছে আবুল মনসুরের ওপর আঞ্চলিকতা ও সামন্তবাদের প্রভাব। যে প্রভাব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং স্বীকার করে নেওয়াকেই তাঁর সাহিত্যিক কর্তব্য মনে করেছেন। এখানে তিনি বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী, সচেতনভাবে দেশপ্রেমিক। এই জাতীয়তাবাদ তথা দেশপ্রেমের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে সামন্তবাদপ্রীতি। কেন না সামন্তবাদ স্বদেশী, সে প্রাচীন, সে গ্রামীণ। যে বুর্জোয়া-বিকাশ সামন্তবাদ-বিরোধী তাকে তিনি পরিহার করেছেন, কেন না বুর্জোয়া-চেতনা হচ্ছে বিদেশী, অর্জিত, আরোপিত। তাঁর সমকালে অন্যদের মধ্যে ভাষার যে 'ভদ্রলোকত্ব' লক্ষ্য করি, আবুল মনসুর আহমদের মধ্যে তার নিদর্শন পাই না। কেন না তিনি 'ভদ্রলোকত্ব' থেকে দূরে থাকেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের মূলে যে স্বাতন্ত্র্যের অন্বেষণ আছে তাই তাঁকে ভাষার বিশিষ্টতা রক্ষায় আগ্রহী করেছে। অবশ্য তাঁর ভাষায় এক ধরনের বলিষ্ঠতা আছে যা সাহিত্যের তথাকথিত ভদ্রভাষায় নেই। উল্লেখ্য যে, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাষায় এক ধরনের বিশৃঙ্খলা আবার কোথাও কোথাও ভাষার উৎকট ব্যবহারে দেখা যায়। এর মূল কারণ হল, তাঁরা উভয়েই একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাসিন্দা। দু'জনেই বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী সমর্থক এবং উভয়েরই মানসিকতা সামন্তবাদী।

'জীবনক্ষুধা'য় হালিমের জগতে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। সে দরিদ্র কৃষকের সন্তান। উচ্চশিক্ষা পেয়ে সে কাজ নিল সাহেবদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে। হালিম প্রজা-শ্রমিক দল ছেড়ে মুসলিম লীগে চলে আসে এবং আন্দোলন করে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে জমিদার তনয়াকে এবং বিয়ে করে উঁচু স্থান দখল করে। সে ছিল দীনহীন চাষার ছেলে। তার পক্ষে কৃষকদের মুক্তির কথা ভাবাই সঙ্গত ছিল; কিন্তু সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে ক্রমশ অভিজাত শ্রেণীর দিকে তার সামাজিক অবস্থানকে তুলে নিল। তার পক্ষে আর শ্রেণীচ্যুত হবার সম্ভাবনা রইল না। অথচ আমরা দেখছি 'গণদেবতা'র দেবুর জগৎ এমন বিশৃঙ্খল নয়। সমাজ-জীবনে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট। সে ইংরেজ কোম্পানিতে চাকরি করবে এমনটা কল্পনাও করা যায় না। দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে হালিমেরা যতটুকু সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছে তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, আরোপিত। সে নিজের বৈষয়িক স্বার্থে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে জড়িত এবং যদিও সে কৃষকের সন্তান তবু সামন্তপ্রথা-বিরোধী নয়। তার মনে সামন্তবাদের প্রতি একটা গোপন আকর্ষণ আছে, যে জন্য সে জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করে জীবনকে সার্থক মনে করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হালিমদের জন্য অশেষ সুবিধা এনেছিল। সে ব্যবসায়ী এই অর্থে সে বুর্জোয়া, কিন্তু সে শিল্পপতি নয়। এটাই ছিল পাকিস্তানী আমলে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা। তারা নিজের স্বার্থে নানাভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে (এই দুটি একই এবং অভিন্ন প্রক্রিয়া) নিজেকে যুক্ত রেখেছিল। স্বাধীন ভাবতে দেবুদের এতটা সুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না, ('সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম পণ্ডিত যার প্রমাণ)। এই বাঙালী মুসলমান উঠতি বুর্জোয়াদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী বড় বুর্জোয়াদের যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল সেটা পরবর্তী ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বণিক ইংরেজ সমাদর পায়নি। তিনি সুশাসক রূপে ইংরেজকে চেয়েছিলেন, বণিক রূপে নয়। কালের পরিবর্তনে রাজনীতির রূপান্তর হল। আবুল মনসুর আহমদের সময় শাসক ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে তাই বণিক ইংরেজ সমাদৃত হয়েছে, শাসক ইংরেজ নয়।

বাহান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল তরুণ সমাজের আন্দোলন এবং রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত শক্তি নিহিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী বড় বুর্জোয়া-সামন্তদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার উঠতি বুর্জোয়াদের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান রচনার এলাকাভুক্ত নয়। তথাপি ঐ দ্বন্দ্বের কথাটি এখানে উল্লেখ করতে হয়—ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাজনীতি কোন দিকে কিভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল এবং কোন পথে অগ্রসর হয়েছিল তার পূর্বাভাস হিসাবে। এই দ্বন্দ্বের বিষয়ে বলতে চেয়েছেন মোহাম্মদ মোর্তজা।

মোহাম্মদ মোর্তজা ঔপন্যাসিক নন ; তিনি পেশায় চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবী। তাঁর উপন্যাস 'চরিত্রহানির অধিকার' (ঢাকা, ১৩৭২) শিল্পোত্তীর্ণ বলা চলবে না কিন্তু এ গ্রন্থে যে বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। এ উপন্যাসে রয়েছে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের সমালোচনা। মধ্যবিত্তের ধনার্জনের ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যে যে সততাহীনতা রয়েছে সেই অসদুপায়ই লেখকের মতে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক দুর্বলতা ও চরিত্রহীনতার কারণ। তিনি বলেছেন মধ্যবিত্তের এই অবলম্বিত উপায়টির নাম হচ্ছে উচ্চবিত্তের সঙ্গে আপস।

'চরিত্রহানির অধিকার'-এর নায়ক মালেক চৌধুরী উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী। বাংলা ভাষা ব্যবহার ও সুষ্ঠু প্রয়োগের বিষয়ে তার সচেতনতা এটাই প্রমাণ করে যে, মালেক চৌধুরী পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মানস-সন্তান। নায়িকা রোকেয়া ইসলাম হচ্ছে ইংরেজ উপনিবেশবাদের সৃষ্ট সুবিধাভোগী এ দেশীয় অনুগত শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভূ। তবে সে নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সামান্য পরিমাণে হলেও সচেতন এবং এটুকুই তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। লেখক বলেছেন, ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে পাকিস্তানী শাসকের হাতে ক্ষমতার বদবদলে 'নানা শূন্যতা ও বিকৃতি' এ দেশের সমাজ জীবনে প্রকট হয়ে উঠল। মালেক নিজে সৎ প্রকৃতির কিন্তু তবু সে সীমাবদ্ধ ব্যক্তি। মালেক রাজনীতি করে, ভালো বক্তা, ভালো লেখকও। কিন্তু তার রাজনৈতিক কার্যাবলী গণমুখী নয়। জনগণের স্বার্থ তার রাজনীতির এলাকাভুক্ত নয়। অথচ সে পরম নিষ্ঠা সহকারে তার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

এ দেশের আন্দোলনগুলি সামগ্রিক জীবনধারার কোনো পরিবর্তন এনে দেয়নি, তবু আন্দোলনের 'পর্যায়গুলি নেতিবাচক অর্থে হলেও প্রগতিমূলক' বলে লেখকের ধারণা। তাঁর মতে ইংরেজের এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটা যেমন এক পর্যায়ে প্রগতি বলে ধরে নেওয়া চলে, এমন অর্থেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেরও এক ধরনের প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা নিহিত রয়েছে এই আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চরিত্রের মধ্যে। লেখক বলেছেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সার্থক হবে, "যদি ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যকে সামগ্রিকভাবে সকলকে একসঙ্গে এবং একতালে গেঁথে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত" (২৪৯) করতে পারে। কিন্তু মালেক চৌধুরীর প্রয়াস সামগ্রিক নয়, বিচ্ছিন্ন এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই সে অসংগঠিত, ফলে তার মধ্যে একটা হীনতার (এই হীনতা অবশ্য শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার নাম) সম্ভাবনা থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের একটা শুভবোধ থাকা সত্ত্বেও পরিণতি হয় হতাশাপূর্ণ। তাঁর মতে রোকেয়ারা সব চেয়ে খারাপ, চরিত্রহীন। কারণ তাদের মতো ব্যক্তিদের

"বেঁচে থাকাটা সামাজিক দায়িত্বের উপলব্ধিতে উজ্জীবিত নয়", আর এ জন্যই এদের কোনো সামাজিক চরিত্র নেই, এরা 'চরিত্রহীন'।

'চরিত্রহানির অধিকার'-এর নায়িকা অধিকাংশ সংলাপই ইংরেজীতে বলেছে। দেশী বিদেশী সাংস্কৃতিক মিশ্রণে অপজাত সমাজের সন্তানদের এটাই মাতৃভাষা বলে প্রমাণ করাটা হচ্ছে সে শ্রেণীর একটা সচেতন প্রয়াস। মিশ্রিত সমাজের ইংরেজী ভাষাকে অমন স্বাভাবিক বলে চালানোটা যে কত হাস্যকর তা লেখক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতেই তুলে ধরতে পেরেছেন। মোহাম্মদ মোর্তজা উপন্যাসের শেষে একটি উপসংহার যোজনা করেছেন। কারণ তাঁর মতে এতে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির দ্বান্দ্বিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হবে। তবে উপসংহার অংশের তীক্ষ্ণ মননশীল ব্যাখ্যা চরিত্রগুলিতে প্রতিফলিত হয়নি, দুটো অংশ সমমানের নয়। অর্থাৎ লেখক যত বড় প্রাবন্ধিক তত বড় ঔপন্যাসিক নন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো করে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও ধারণা চরিত্রে প্রতিফলিত করতে পারেননি। স্বার্থবাদী অর্থনীতির কৌশলে যে এ দেশের রাজনীতি পরিচালিত সে কথা তিনি যুক্তি সহকারে বলেছেন, উপসংহার পর্বে। উপন্যাস শেষ করে প্রবন্ধাকারে তিনি লিখেছেন এর উপসংহার। কারণ তিনি তাঁর উপন্যাস অন্তর্গত চরিত্রসমূহের কার্যাবলী ও আচরণের ঐতিহাসিক বস্তুবাদসম্মত একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। অথচ উপসংহারের এই বিশ্লেষণানুযায়ী চরিত্রগুলির দ্বান্দ্বিক ভূমিকা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। এর ওপর চরিত্রগুলি অবিকাশিত রয়ে গেছে। ফলে উপন্যাসটি সার্থক হয়নি। লেখক তাঁর বক্তব্যকে যে উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে পারছেন না এর কারণ মনে হয় যে, উপসংহারের বক্তব্য উপন্যাসের ভেতর থেকে আসেনি। তাঁর প্রবন্ধ-চিন্তার বিষয়, কল্পনা ও অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে ওঠেনি। ঔপন্যাসিকের বক্তব্য উপন্যাসের ভেতর থেকেই আনতে হবে। লেখক নিজে যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করতে চাচ্ছেন তা কোনো চরিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়নি। নেতিবাচক আন্দোলনের সমালোচনা করে তিনি এর পাশাপাশি ইতিবাচক চরিত্র ও তার কর্মসূচী উপস্থিত করতে পারতেন। তাতে দ্বন্দ্বও তীব্র হত। কিন্তু এমন কোনো সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন চরিত্রের অভাবে তাঁর উপন্যাস সার্থক হয়নি। মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রচার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তবে চরিত্রগুলির সামাজিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উপন্যাসের শেষে যে শক্তিশালী বক্তব্য তিনি 'উপসংহার' অধ্যায়ে যোজনা করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী প্রাবন্ধিক রূপে পরিচিত হন। মধ্যবিত্তের স্বরূপ শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে উন্মোচিত করলে হয়তো তাঁর উপন্যাস সার্থক হত।

সার্থক চরিত্র-চিত্রণের অভাবে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য অন্য আর একটি উপন্যাসে

যথাযোগ্য রূপে প্রস্ফুটিত হয়নি। এখানেও একটা সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য রয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঐ একই সমস্যা। কারণ চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ রূপে বিকাশিত হয়নি। আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' (ঢাকা, ১৯৬৪) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তৎকালীন দুর্ভিক্ষ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত। লেখক নিজে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য কারাভোগ করেছেন। পেশায় তিনি শিক্ষক, চরিত্রে বুদ্ধিজীবী।

'ক্ষুধা ও আশা'র পটভূমি বিশাল। এত বড় ক্যানভাসের তিনি যথোপযুক্ত ব্যবহার করেননি। এই উপন্যাসে কোনো সুনির্দিষ্ট কাহিনী উপস্থাপিত হয়নি। হয়তো কোনো নিটোল কাহিনী উপস্থিত করাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। জোহা নামে এক দরিদ্র কিশোর এর নায়ক। জোহার বাবা মা বোন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এল। কারণ যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামের মানুষদের ছিন্নমূল হয়ে শহরে আসতে হয়েছিল খাবারের খোঁজে। শহরে এসেও এই পরিবার সেই একই নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করল। উপন্যাসটিতে পরিস্থিতি ও পরিপার্শ্বিকতাকে অবলোকন করা হয়েছে মূলত জোহার দৃষ্টিতে।

জোহা দেখছে চারদিকের ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা। তাদের পরিবারের সবাই একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের বাবার অপমৃত্যু হল। নারীমাংসলোভীদের কবলে পড়ল কিশোরী বোনটি। জোহা সাময়িকভাবে আশ্রয় পেল মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে কতকটা আদরের গৃহভৃত্য হিসাবে। সে দেখল এখানেও শৃঙ্খলা নেই। লেখক মধ্যবিত্ত পরিবার এবং মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির আচরণ অনেকটাই বর্ণনা করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোতে। জোহা মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রায় অনেক সময়েই অনুপস্থিত থাকে। মধ্যবিত্তের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় লেখক বাস্তব ও সার্থক। কিন্তু জোহাদের ক্ষুধার জ্বালা তাঁর ভাষায় তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, যেটা হয়েছে সেটা হল নীচুতলার মানুষদের হীন প্রবৃত্তির চিত্র। মোহাম্মদ আলী উপন্যাসের মধ্যবিত্ত অংশের নায়ক। সে সাম্যবাদী। ভুখা মিছিল বের করবার উদ্যম নেবার অপরাধে তার কারাবাস হয়। আলীর সমসাময়িক যুবকরা অনেকেই সাম্প্রদায়িক। মধ্যবিত্তরা রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। অন্যদিকে আসন্ন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছে বাঙালী মুসলমান। এর মধ্যে জোহা বেরিয়ে পড়ে তার হারিয়ে যাওয়া বোনের সন্ধানে। বোনকে সে পায় না। উপন্যাস শেষ হয়েছে পথের পাশে অচেনা এক নারীর সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে জোহার কোলে তুলে নেবার দৃশ্যে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটন করা উপন্যাসের কাজ। কোনো সুনির্দিষ্ট কাহিনীর বর্ণনা যেমন এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য নয় তেমনি এর মধ্যে কোনো চরিত্রের পূর্ণ বিকাশও নেই। লেখক উপন্যাসে মধ্যবিত্তের কোনো আশার

চিত্র উপস্থাপিত করেননি। অঘোর চ্যাটার্জি, লিনার বাবা আলী মতুজা চৌধুরীদের মতো প্রবীণরা যেমন, তেমন নবীনরাও কেউ যথাযোগ্যভাবে আশা ও সম্ভাবনার কোনো ছবি তুলে ধরতে পারেনি। এর একটি বড কারণ তাদের কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যয় নেই। জোহাদের জীবনে দুঃসহ যন্ত্রণা নেমে এসেছে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি কোন পথে আসবে তার কোনো উল্লেখ নেই। জোহার মনে একটা ভাববাদী কল্পনাকে আশ্রয় করে তাকে লেখক আগামী দিনেব আশার চিত্র বলে অভিহিত করেছেন, "জীবন্ত মাংসেব গন্ধেই বুঝি শৃগালেব ডাকে হিংস্র উল্লাস ঝরে, কিন্তু আশ্চয কোন অজানা রহস্যে জানে না, সে এখন যেন বাঘের চেয়েও সাহসী, জননীব গায়ে গা চেপে এবং শিশুটিকে পরম যত্নে আগলে দারুণ শীতে অন্ধকারে বসে থাকে ভোরেব প্রতীক্ষায়" (২৪১)। এই ধবনেব সাহস জোহা কেমন কবে পেল, কোথায় পেল, আব কতক্ষণই বা তাব ঐ সাহস বজায় থাকবে তাব কোনো বিশ্লেষণ নেই। সাহিত্যে সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা অবশ্যই একটি গুণ কিন্তু সাঙ্কেতিকতা ঘটনাবর্তেব মাধ্যমে না এলে তার সার্থকতা কোথায় ?

আলাউদ্দিন আল-আজাদ উপন্যাসটি লিখেছেন চৌষট্টি সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সময় যে দুঃসহ পরিস্থিত বিবাজ কবছিল তা তিনি চিত্রিত করেছেন কিন্তু এই পবিস্থিতিব জন্য দাযী সাম্রাজ্যবাদেব স্বরূপ ও তাব আভ্যন্তবীণ দ্বন্দ্ব তিনি উন্মোচিত কবেননি। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা জোহাব মতো দরিদ্র কিশোরের দৃষ্টিতে মধ্যবিত্তকে দেখেও কোনো শ্রেণী-দ্বন্দ্বেব কথা তিনি বলেননি। বস্তুত কোনো কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অভাবে গ্রন্থটি সার্থক হয়নি। ক্ষুধা ও আশার মধ্যবর্তী স্তরেব নাম হচ্ছে সংগ্রাম। ক্ষুধা থেকে উত্তবণেব পথটা সংগ্রামের, খোলাখুলিভাবে বললে শ্রেণী-সংগ্রামেব। এমন কথা তাঁর মধ্যবিত্ত নায়ক মোহাম্মদ আলী ইঙ্গিতে বললেও অমন বিচ্ছিন্ন কথাতে উপন্যাসের মূল বক্তব্য অর্থাৎ 'আশা'ব কথা ধ্বনিত হয় না।

লেখক দুর্ভিক্ষ-কবলিত, মৃত্যুব দিন গোনা, উন্মূলিত অসংখ্য পবিবাবের চিত্র বর্ণনা করেছেন, শুধু দেননি সেই ইঙ্গিত কি করে এরা একত্রিত হবে, শক্তি অর্জন করবে। সেই জন্য ক্ষুধা কি করে আশাতে উত্তীর্ণ হবে, এমন কোনো পথের ইঙ্গিত বা প্রতীতি এই উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় না। তাই উপন্যাসের নামকবণ যে প্রত্যাশার সৃষ্টি কবে উপন্যাস তা পূবণ করে না। দেখা যাচ্ছে, 'ক্ষুধা ও আশা'র বক্তব্যে থাকা উচিত ছিল একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চেতনার কথা। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীয়ন্ত'-এ বয়েছে। তাঁব উপন্যাসে পাঁচুর মতো কৃষকের ছেলে নিজেব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু এমন কোনো স্পষ্ট বক্তব্য এখানে না থাকার জন্য অনেক চরিত্র বিশেষ করে মূল চরিত্র বাস্তব হয়নি। ফলে উপন্যাসও সার্থক হয়নি।

আলাউদ্দিন আল-আজাদ যদিও সামন্তবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন নন তথাপি তিনি ভাববাদী। তাঁর আশার চিত্রটা ভাববাদীদের আশার মতোই যতটা অবাস্তব ঠিক ততটাই কল্পনানির্ভর। নতুবা লিনার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে একটা ভাবাবেগ তিনি সৃষ্টি করতেন না। প্রেমমূলক উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা' নয়। সে জন্য লিনার কবরের পাশে মোহাম্মদ আলীর স্বগতোক্তি আর জোহার ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে তা কান পেতে শোনা সবটাই অবাস্তব বলে মনে হয়।

তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' এই একই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়ে লেখা। অথচ নির্দিষ্ট একটি মতবাদে বিশ্বাস থাকার জন্য তিনি তাঁর নিজের আদর্শকে তুলে ধরেছেন সার্থকভাবেই। আর এমন কোনো (সে বক্তব্য যা-ই হোক না কেন) নির্দিষ্ট ও গভীর বিশ্বাসের অভাবের কারণেই আলাউদ্দিন আল-আজাদ তাঁর উপন্যাসে কল্লোল যুগের লেখকদের মতো হয়ে পড়েছেন। কল্লোল যুগের তরুণ লেখকরা সামন্তবাদী প্রভাবকে অস্বীকার করতে চাইলেও কোনো সুদৃঢ় ও বাস্তব-ভিত্তিক বুর্জোয়া-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সমাজে যা অনুপস্থিত তাকে সাহিত্য সম্ভব করে তুলতে যে প্রতিভা দরকার তা বোধকরি একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিছুটা নজরুল ইসলামের মধ্যেও ছিল কিন্তু মূলত তিনি ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তাঁর অভাব ছিল স্থৈর্যের ও অনুশীলনের। বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাববাদের 'চোরাবালি' পরিহার করতে শিখিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদিতা আলাউদ্দিন আল-আজাদের নেই।

সত্যেন সেনের প্রধান পরিচয় তিনি নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। তাঁকে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে এবং তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল অনেক বছরের জন্য। কারাগারেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা এবং কারা-মুক্তির পর তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ই তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের তুলনায় বড় হয়ে উঠেছে। সত্যেন সেনের লেখা 'পদচিহ্ন' (ঢাকা, ১৩৭৫) উপন্যাসে বিভাগ পরবর্তী পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বাস্তব সমাজ-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেশ ভাগ হবার পর বিপুলসংখ্যক হিন্দু পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে চলে গেলেও একাংশ রয়ে গেল। কেউ রয়ে গেল নিরুপায় হয়ে, অনেকে গেল না এ দেশকেই স্বদেশ মনে করে। কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের সমস্যা 'পদচিহ্ন'-এর বর্ণিতব্য বিষয় নয় এ গ্রন্থে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার পটভূমি দেওয়া হয়েছে। 'হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রা অন্তরঙ্গভাবে' দেখবার জন্য আনিস তার বন্ধু সুবিনয়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে এল। উভয়েই আদর্শবাদী উদারনৈতিক শিক্ষিত যুবক। সুবিনয়ের বাবা-মা গোঁড়া হিন্দু। তারা প্রথমে মুসলমান আনিসকে পরিবারের অতিথি রূপে গ্রহণ করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত

হলেও পরে কিন্তু তারা আনিসকে প্রিয়জনের মতো আপন ভেবেছে। আনিস গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করল। শ্রীপুর সুবিনয়দের গ্রাম। এ গ্রাম এককালে হিন্দু-প্রধান ছিল। শহরে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত হিন্দুদের সঙ্গে গ্রামের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ ছিল। এরা নানা উৎসব উপলক্ষে গ্রামে যাতায়াত করত। ফলে এ ধরনের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ ছিল। দেশভাগের পর চলে গিয়েছে প্রায় সব সম্পন্ন হিন্দু। তাদের সঙ্গে চলে গিয়েছে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী হিন্দুরাও। দেশত্যাগীদের সঙ্গে হিন্দু সমাজও চলে গেছে। এই শূন্যতা শহরবাসী হিন্দুদের তেমন করে অনুভূত না হবারই কথা। কারণ শহরের জীবনযাত্রা অনেকটা বিচ্ছিন্ন। গ্রামবাসী হিন্দু যারা রয়ে গেল তাদের অবস্থা শোচনীয়। ধর্মোৎসব পালনের মধ্যে এ দেশীয় হিন্দুদের জীবনে যে আনন্দের প্রকাশ ও সামাজিকতা ফুটে ওঠে সেইসব উৎসব শ্রীপুরের মতো গ্রামে আর হয় না। কারণ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবে কে? মূল সমাজশক্তি থেকে শিকড় ছেঁড়া বিচ্ছিন্ন এই কয়েক ঘর হিন্দু নিরানন্দ, হতাশাগ্রস্ত। এরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এতকাল হিন্দুদের সমষ্টিগত একটা যে অর্থনৈতিক মূল প্রবাহ ছিল সেখান থেকেও। 'এ দেশ কি এখনও আমাদের আছে' (পৃ. ৫৩) এই প্রশ্নের পিছনে সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও জড়ানো। তবে কেন সংখ্যালঘুরা একাত্ম হতে পারছে না মুসলমানদের সঙ্গে? কারণ মাঝখানে রয়েছে সম্প্রদায়গত বিভেদের এক অনড় দেওয়াল।

সুবিনয় ও আনিস উপরোক্ত সমস্যাগুলি অবলোকন করে একটা চেতনা লাভ করল যে, শুধু হিন্দু নয়, এক শ্রেণীর মানুষের এ দেশে কোনো নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা নেই। তাদের সংখ্যাতে মুসলমানই বেশী। দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে উৎপীড়িত। শ্রীপুর যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন আরামে ছিল উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি। দরিদ্ররা চিরদিনই দরিদ্র —ক্রমশ আরও বেশী দরিদ্র হচ্ছে এই যা। এমন কঠিন সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র আনিসদের সদিচ্ছা আর মহৎ উদারতা দিয়ে ঘটানো সম্ভব নয়। আনিস আশাবাদী, সে হতাশ না হয়ে বলে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন খুঁজে পথ আমরা পাবই, সেখানে মানুষ হিসাবে মানুষের সঙ্গে মিলতে পারব" (১৩৪)। —যেমন আনিস ও সুবিনয় একাত্ম হতে পেরেছে, অসাম্প্রদায়িক হয়েছে। আনিস ও সুবিনয়ের বোন আরতির পূর্বরাগ এই সমস্যা-প্রধান গ্রন্থের স্নিগ্ধ দিক। কিন্তু লেখক ইঙ্গিতের মধ্যেই রেখেছেন এ অধ্যায়।

'পদচিহ্ন' সার্থক উপন্যাস হয়নি। সাহিত্য-কীর্তি হিসাবে 'পদচিহ্ন' হয়তো অনুপম নয়, তবু এর মধ্যে লেখকের আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। এই আন্তরিকতা উভয় সম্প্রদায়ের মূল অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি ফেরানোতে। অর্থনীতি সাম্প্রদায়িকতা বোধের মূল। হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্র শ্রেণী এই অর্থনৈতিক চালে শোষিত

হচ্ছে। জনজীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত মধ্যবিত্ত যুবশক্তির অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সমাজ-জীবনের মূল অসঙ্গতির কারণ ধরা পড়েছে। অর্থনীতির ধারা বেয়ে এই অসঙ্গতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আশাবাদীর চোখে জীবননিষ্ঠ চিত্র-মালার সমাবেশে উপন্যাসটিতে এক স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। সত্যেন সেন যে ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন সেখানে বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রয়োজন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারায় তিনি উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করেছেন। 'পদচিহ্ন'-তে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের কোনো সুস্পষ্ট পথ তিনি দেখাতে পারেননি। কোনো বিপ্লব বা দলের কথাও উল্লেখ করেননি। করেননি কারণ তাঁর পক্ষে তেমন কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। আবুল ফজলের সমাজতন্ত্র-বিলাসী চরিত্রদের তুলনায় সত্যেন সেনের অতীত ও বর্তমান জীবনের সান্নিধ্যে একটা বিভেদহীন সমাজ খোঁজার প্রয়াসী চরিত্রদের চিন্তাধারা অনেক বেশী বাস্তবমুখী এবং পাঠকের বিশ্বাস টেনে নিতে সমর্থ। সমাজতান্ত্রিক সমাধানের কথা না বলা হলেও 'পদচিহ্ন'তে সমাজতত্ত্বের মূল সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থ-নৈতিক অসাম্য থেকেই সব অসাম্যের উৎপত্তি। আনিস, সুবিনয়ের চিন্তাধারা সমাজতান্ত্রিক। তারা বিশ্বাস করে, "সে দিন আসছে, যেদিন সব মানুষ এক হবে, তাদের আলাদা করে রাখার জন্য কোন বাধার প্রাচীর থাকবে না"। যদিও তাদের সুর বর্তমানে 'ক্ষীণস্বর' তবু হতাশ হয়নি আনিস।

লেখক সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করেছেন, যেমন ব্যক্তিগত শুভেচ্ছায় আবুল ফজলও অসাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করেছেন। সত্যেন সেন হিন্দু নায়কের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িকতা বিবৃত করতে পারেননি। আবুল ফজলও পারেননি কোনো ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করে তার একটা ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে তাকে ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত করতে, তার মাধ্যমে সাম্প্র-দায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠবার বাণী প্রচার করতে। তাঁরা পারেননি কারণ তেমন চরিত্রের অসদ্ভাব ছিল তাঁদের সমাজে। এই দুই লেখকই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিরোধ-সৃষ্টি-করা আচার-অনুষ্ঠানগুলির কথা ও প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, এই সামন্তবাদী মানসিকতা-সম্পন্ন সমাজে বিভেদ ও দূরত্বকে শক্তিশালী করে এটাও একটা সত্য। ফলে উভয় লেখকই তাঁদের লেখায় বর্তমান সত্যকে বিশ্লেষণ না করে তাকে পাশ কাটিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন। অথচ উপন্যাস তো বাস্তবেরই প্রতিরূপ, আদর্শ জীবনের স্বপ্ন-ছবি নয়। সাম্প্রদায়িকতা-বোধ যে-শ্রেণীর স্বার্থে ছড়িয়ে পড়ে সে শ্রেণীকে বিশেষ করে চিহ্নিত না করার জন্য সত্যেন সেনের বক্তব্য দুর্বল হয়ে গেছে। আবুল ফজল ও তিনি দু'জনের কেউই তাঁরা পাকিস্তানী মানসিকতার ধারক নন। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে তাঁরা কেউই মূল সত্য হিসাবে উপস্থিত করেননি। শ্রেণী

সংগ্রামকে বাদ দিয়ে যে সমাজতন্ত্র হয় তা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নয়। তাঁর স্বদেশভক্ত, সুস্থ মানবিক চিন্তাধারার বাহক। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় এঁরা সন্তুষ্ট নন, তাঁরা মানুষের মুক্তি চান। কিন্তু মুক্তির উপায় ও প্রস্তুতির কথা তাঁরা ঠিক করে বলেননি। তবে উদ্যম তাঁদের পাথেয়, শুভবোধ হচ্ছে তাঁদের প্রেরণা।

আলাউদ্দিন আল-আজাদের মতো উদার বামপন্থী বা সত্যেন সেনের মতো কম্যুনিস্ট নন আবু রুশদ এবং সরদার জয়েনউদ্দীন। এঁরা নবসৃষ্ট পাকিস্তানের সমস্যাকে উপলব্ধি করেছেন নিজ নিজ অনুভূতি দিয়ে। বলা চলে কতকটা নিজের মনে যে আদর্শের ছবি এঁরা এঁকেছিলেন, নতুন রাষ্ট্র সেই আদর্শের প্রতিচ্ছবি হোক—এমন একটা আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি এঁদের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অনেক সুযের আশা' (ঢাকা, ১৩৭৩) এবং আবু রুশদের 'নোঙর' (ঢাকা, ১৩৭৪) প্রায় একই সময়ে রচিত। দুটো উপন্যাসেই ঘটনার বিস্তার পাকিস্তান সৃষ্টির পরের চার বছর পর্যন্ত এগিয়ে থেমে গেছে। একান্নো সালে এনে কাহিনীকে থামিয়ে দিয়েছেন তাঁরা দু'জনেই।

'অনেক সুযের আশা'র কাহিনী শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের সময় থেকে। এর নায়ক একজন কবি। আত্মীয়স্বজনহীন কবি জীবিকা উপলক্ষে সঞ্চয় করেছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অবলোকন করেছে জীবনরহস্যও। সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের বহু স্থান ঘুরে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তার সামনে জীবিকাজনের কোনো দ্বিতীয় পথ ঐ সময় খোলা ছিল না। কবি দেশে-বিদেশে ঐ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর কুফল ফলতে দেখল, এল দুর্ভিক্ষ, নৈতিকতার বেদনাদায়ক পতন ঘটল। এ ছাড়া কবি পাক-ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় প্রত্যক্ষ করেছে। লক্ষ্য করেছে আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার নেতাদের মনোভাব এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনের বিষয়ে কি ধরনের মানসিকতা পোষণ করে তাও অবলোকন করেছে। আন্দোলনে রত অনেক রকমের মানুষের মধ্যে কবির কাছে সব চেযে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে বিপ্লবী চেতনার হায়াৎ খাঁকে। হায়াৎ খাঁ সংগ্রামী। তার লড়াইকে সে নিজেই ব্যাখ্যা করেছে, "গরীবের বাঁচার লড়াই রুটির লড়াই" (১২১)। তার সংগ্রাম কায়েমী স্বার্থ ও শক্তির সঙ্গে, যে শক্তি তাদের মতো মানুষদের গরীব অশক্ত করে কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। হায়াৎ খাঁ কখনো সরকার-নিষিদ্ধ মজদুর ইউনিয়নের পথে, কখনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের রক্তাক্ত পন্থার মাধ্যমে বিদেশী শাসক-শোষক সরকার উৎখাতের কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকে। সে খাঁটি স্বদেশ ভক্ত। দেশবাসীর মঙ্গলের সঙ্গে শ্রমজীবীর মুক্তিও সে চায়। হায়াৎ খাঁর এমন ধরনের কর্মে উন্মাদনা দেখে কবি অনু

প্রাণিত হয়, কিন্তু এ ধরনের কাজ কবির প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। কারণ সে এমনই ভীরু যে প্রেমের ব্যাপারেও সাহসী হতে পারে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পৈশাচিক হত্যালীলার পর দেশের ঝিমিয়ে-পড়া স্বাধীনতা আন্দোলন পুনরায় জোরালো হয়ে উঠল। শিখ নেতাদের প্ররোচনায় পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল। সেই দাঙ্গা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল, "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিয়মই এই, এ বিষ বাতাসের চেয়ে হালকা" (৩২৬)। নিতান্ত অসাম্প্রদায়িক কবিও এমন দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা ভাবতে বাধ্য হল যে, "মানুষে মানুষে আলাদা হয়ে বাঁচতে হলেও বাঁচতে হবে" (৩৩২) এই সাম্প্রদায়িকতার ঝড়ে কত সংসার নষ্ট হল, কত মহান ব্যক্তির জীবনের অবসান ঘটল। বিপ্লবী হায়াৎ খাঁ শেষ অবধি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। কারণ নেতাদের কৌশলে এ আন্দোলনের সঙ্গে তখন সমাজতান্ত্রিক বুলি যুক্ত হয়েছে, "এমন একটা দেশ হবে পাকিস্তান, যে দেশের জনগণ সব রকম অন্যায় অবিচার এবং শোষণ থেকে হবে মুক্ত, ব্যক্তিস্বার্থ, অদম্য লালসা এবং দারিদ্র্যের ভয় থাকবে না তাদের" (১৪০)। শোষণমুক্ত রাষ্ট্রের আশ্বাস দিয়েছিল পাকিস্তান। সে জন্য হায়াৎ খাঁ বিশ্বাস করেছে, "পাকিস্তান কায়েম হতেই হবে, সে-ই এ দেশে গরীবের একমাত্র বেঁচে থাকবার উপায়" (৩০৭)। আর সব রকম সাম্প্রদায়িক ভাবনা মুক্ত হয়েও পরিস্থিতির চাপে কবিকে স্বীকার করতে হয় পাকিস্তান ছাড়া এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই।

দেশ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হল। কলকাতা থেকে আসবার সময় কবির পরিচিত মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এবং হায়াৎ খাঁ ও কবি নিজে ট্রেনের একই কামরায় উঠেছিল। হিন্দুস্থানের শেষ স্টেশন পার হয়ে গেলে ঐ কামরার যাত্রীদের চোখে নামে নিবিড় স্বপ্ন, পাকিস্তানী সঙ্গীতের সুরে ভরে ওঠে কক্ষটি। কবি কল্পনা করে, "ঐ আলোর পারে সে দেশ—সে দেশ স্বপ্নের দেশ —সে আজাদ দেশ আমার। যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, নাই অভুক্ত জনমানব" (৫৪৭)। উপন্যাস শেষ হয়েছে এই স্বপ্নিল পরিবেশে। 'অনেক সূর্যের আশা' শুরু হয়েছিল বাস্তব পরিবেশের মধ্যে। শুরু হয়েছিল একান্নোর পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলায় তখন সর্বব্যাপী হতাশার রাজ্য। সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল। এমন কি প্রকৃতিও বিরূপ, লেগে আছে বৃষ্টি-বন্যার উপদ্রব। ধর্মঘট আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, শ্রমিকরা তীব্র অসন্তোষে ফুঁসছে, কারখানায় ধর্মঘট হলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর গুলি চলছে।

পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলার প্রথম চার বছরের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে দিয়ে কবি ফিরে গেছে তার নিজের অতীত দিনে। উপন্যাসখানি তার স্মৃতি

চারণার ফল। বর্তমান থেকে সুদূর অতীতে স্মৃতির পথ বেয়ে চলা —বিচরণের সূত্রটি হচ্ছে স্বাধীন পাকিস্তানে পুলিশের গুলি বর্ষণে বৃদ্ধ হাযাৎ খাঁর অপমৃত্যু। কবি মর্মাহত হয়ে পুরনো দিনের কথা মনে করে। বিপ্লবী হাযাৎ খাঁর শোচনীয় পরিণতিতে কবি মর্মান্তিক দুঃখ বোধ করে। এই উপন্যাসে রাজনীতির ভূমিকা অনেকটা ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের মতো অপরিত্যাজ্য। সরদার জয়েনউদ্দীন তার উপন্যাসের ভূমিকায় রাজনীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৮৯] তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে বিপ্লবী হাযাৎ খাঁ। সে জন্য এর কবি চরিত্রটি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছে হাযাৎ খাঁর প্রতি। কবি চরিত্রটিতে মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্যিক শিল্পীদের এক ধরনের জীবন পলাতক মানসিকতা ধরা পড়ে। কবিকে লেখক যতই সহৃদয়তার সঙ্গে আঁকুন না কেন সে তার ভীরুতা এবং অরাজনৈতিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তার শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। সে মহাযুদ্ধে গিয়েও ফিরে আসতে পারে অথচ শ্রেণীদ্বন্দ্বের অনিবার্য শিকার হয় বিপ্লবী বৃদ্ধ হাযাৎ খাঁ। এমন কবিরা বেঁচে থাকে একটা উদারনৈতিক জগতের ভাবলোকে। হাযাৎ খাঁকে এরা নিপীড়িত জন রূপে ভালোবাসে কিন্তু ভালোবাসে না নিজের কবিতা এদের জন্য সংগ্রামী বাণী প্রচার করতে। কবি উচ্চবিত্ত হতে চায় না বটে, কিন্তু সে শ্রেণীচ্যুতও হয়নি।

সরদার জয়েনউদ্দীন তাঁর কবিকে শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। তার জীবন রহস্য সন্ধান কতকটা মধ্যবিত্তের ভাববিলাস। বরং অনেকটা সার্থক হয়েছে হাযাৎ খাঁ চরিত্রটির সংগ্রামী চেতনার বিকাশে। লেখক অবাঙালী শাসকদের স্বরূপ উন্মোচিত করেননি। কাহিনীতে বলিষ্ঠতা আসত যদি এর মধ্যে আশাবাদী মানসিকতা থাকত। শ্রেণীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হাযাৎ খাঁর অপমৃত্যু হয়তো বাস্তব চিত্র কিন্তু লেখক যদি শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে আস্থা রাখতেন তাহলে তিনি কবিকে শ্রেণীচ্যুত করতেন। তাঁর কবি ভাববাদীর বদলে হত বিপ্লবী। হাযাৎ খাঁ মধ্যবিত্তকে বিলুপ্ত করবার কথা ভাবতেই পারে না। তার লড়াই শাসকদের সঙ্গে। যেন মধ্যবিত্তরা টিঁকে থাকলে হাযাৎ খাঁদের কোনো অসুবিধা হবে না অথচ এমন ধারণা নিয়ে যথার্থ শ্রেণী সংগ্রাম হয় না।

৮৯॥ ভূমিকার একাংশে লেখক বলেছেন যে, "এ উপন্যাস পাঠ করে যদি কারো ভালো লাগে, মহাশান্তির আবাস-ভূমি পাকিস্তান চেয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাদের সেই আশা আকাঙ্ক্ষা ন্যায় নীতির কথা যদি কারো মনে মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে, তাহলে আমার শ্রম সফল হবে বলে মনে করব।" ভূমিকা, 'অনেক সূর্যের আশা'।

আবু রুশ্‌দের 'নোঙর'-এর নায়ক ব্যক্তিগত আদর্শের দৃষ্টিতে পাকিস্তান সৃষ্টিকে দেখেছে। 'অনেক সুখের আশা'র কবির মতো 'নোঙর'-এর কামাল বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে পাকিস্তান সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলেনি। কামালের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুধ্যান 'নোঙর'। কামাল যেমন আদর্শবাদী তেমনি আশাবাদীও। সে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাকে জাতির বৃহত্তম সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে দেখেছে। তার দ্বন্দ্ব আদর্শ নিয়ে। তবু তার ব্যক্তিগত আদর্শের সঙ্গে সে একটা জাতির জীবন সমস্যাকে এক করে দেখেছে বলে উপন্যাসটি একটি ব্যাপ্তি পেয়েছে।

কামাল শুভবাদী। তার একান্ত ইচ্ছা নতুন রাষ্ট্র একটা আদর্শ রাষ্ট্র রূপে গড়ে উঠুক। এর সকল নাগরিক হোক সৎ। কেন না সততাই মঙ্গলকে আহ্বান করে। মানুষের আত্মিক মূল্যবোধে সে আস্থা রাখে। অথচ অন্যকে সৎ করে তোলা দূরে থাকুক কামালের নিজের সততার নীতি পদে পদে বাধা পায়। অসৎ ব্যক্তিদের স্বার্থচক্র পাথরের দেওয়ালের মতো তার চারদিকে ঘিরে রয়েছে। কামাল নিজের শ্রেণীর আত্ম ও স্বার্থরক্ষার কৌশল দেখে আহত বোধ করে। তার লড়াই নিজের শুভ বোধের সঙ্গে অন্যের অশুভ বোধের। তিন পুরুষ ধরে কামালদের পরিবার কলকাতায় আছে। বাবা, মা, ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে কামাল একলাই চলে এল সদ্য স্বাধীন পূর্ব বাংলায়। কারণ তার দৃঢ় ধারণা নতুন রাষ্ট্রে তার অস্তিত্ব অর্থময় হবে। কলকাতায়ও সে ভালো চাকরি করত, সৎ ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার ছিল। কামাল স্বাতন্ত্র্যবাদী বাঙালী মুসলমান নয়। তবু সে নতুন রাষ্ট্রে এল কারণ কামাল গতিময় জীবনের সম্ভাবনা দেখেছে নতুন দেশে, "...মুসলমান বলেই পাকিস্তান যাবার জন্য তার মন আনচান করছে, তা নয়। নূতনের স্বাদ তাকে পেয়ে বসেছে, প্রাচীনের ক্লীবতা থেকে আত্মা মুক্তি পেতে চায়" (৭)। কামাল আশা করেছে 'মহৎ অস্তিত্বের সম্ভাবনা' নতুন রাষ্ট্রে সম্ভব হতে পারে। তার পিতার পরিবার পুরনো সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ আর স্তিমিত গতিহীন জীবন নিয়ে রয়ে গেল। কামাল একাই নিজের আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে চলে এল। প্রিয়জন-বিচ্ছেদ তার মনকে কম পীড়া দিল না। তবু সে আসতে বাধ্য হল। কারণ সে বিশ্বাস করে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আর তার মতো ব্যক্তিদের ঐ মহান্ ভবিষ্যতের 'উপাদান' তৈরী করতে হবে। কলকাতার তুলনায় বহুগুণে পশ্চাদ্‌বর্তী ঢাকা নগরীর জীবনযাত্রা, চাল-চলন। তবু কামাল ভাবতে চেষ্টা করে, "এখানকার মাটিকেই যেন আমি আমার মা বলে বুঝতে শিখি" (৮৬)।

'পাকিস্তান' নামটিকে ঘিরে কামাল যে আদর্শ, উদারতা ও সততার স্বপ্ন রচনা করেছিল তা একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। নতুন রাষ্ট্রে অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা দিল ক্ষয়ের চিহ্ন। বাংলাদেশীয়দের সত্তাকে বিলুপ্ত

করবার চেষ্টা চলছে, তাদের দাবি চাপা পড়ছে নানা অজুহাতে। সাধারণ মানুষ সরকারের প্রতি তাদের আস্থা হারিয়েছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অশিক্ষায় ধুঁকছে গ্রামীণ জীবন। উচ্চবিত্ত সমাজে অন্তঃসারশূন্যতা ও স্বার্থসংরক্ষণের নির্লজ্জ উদ্দীপনা প্রকট। শাসকশ্রেণীর ঔদাসীন্যে বঞ্চিত শ্রেণীর প্রাণ কণ্ঠাগত। কামাল দেখল, ঐ শাসক-সমাজকে সাহায্য করে তাদের মতো মধ্যবিত্ত বহু ব্যক্তি। সমাজের সর্বত্র ঘুণ-ধরা অসুস্থতা —নেই কোনো উজ্জীবনী শক্তি। তবু হতাশ হয় না কামাল। এই দেশেই তার মন একটা খুঁটি আশ্রয় করতে চায়। কারণ সে সামন্ততান্ত্রিক প্রাচীন জীবনধারণা, যা পেছনে ফেলে এসেছে তা পছন্দ করে না বলেই নব-রাষ্ট্রের গতিময়তা থেকে কোনো মহত্ত্ব সে পেতেও পারে এমন আশা রাখে। কামাল বিয়ে করল। বিবাহোত্তর জীবনে আনন্দ ও শান্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কটও যুক্ত হল। সে নিজে সৎ-জীবিকা অর্জন করে . ফলে তার অন্যান্য সহকর্মীদের মতো অর্থনীতির অসৎ-কৌশলে কুশলী হয়ে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে না পরিবারে, "মনের প্রসারিত প্রাঙ্গণে গীতি কবিতার মত এক এক করে মহৎ চিন্তা জেগে উঠলেও কামাল বাইরের জগতে তার কোন প্রতিধ্বনি দেখতে পায় না" (২৪০)। তবে সে জানে একদিন নিপীড়িত জনগণ 'মহাক্রোধে জেগে উঠবে' আর এই শাসক সম্প্রদায় তখন 'খড়ের কুটার মত মিলিয়ে যাবে' (২৪৩)। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কামাল আদর্শচ্যুত হয় না। কারণ এ দেশকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে, এ দেশে তার 'অস্তিত্ব পৃথক, নিবিড়, অন্তরঙ্গ' (২৬৫)।

কামাল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক বোধমুক্ত পাকিস্তানী মানসিকতার পার্শ্ব-সৃষ্টি। অনেক বাঙালী মুসলমান নিজের আদর্শের প্রতিচ্ছবি রূপে পাকিস্তানকে দেখতে চেয়েছিল একটা আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে। পাকিস্তান তেমন আদর্শ রাষ্ট্র হয়নি সবার জন্য। কামালের ইঙ্গিতময়তা সত্ত্বেও বোঝা যায় তার আদর্শায়িত পাকিস্তানের ধাঁচটা অনেকাংশে গণতান্ত্রিক। কামালের চেতনা বুর্জোয়াপন্থী। সে নিজে সব ছেড়ে চলে এসেছে সামন্ততান্ত্রিক অনড় জীবনযাত্রা তার অপ্রিয় বলে। কামাল আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত। তার দ্বন্দ্ব সমাজ ও রাষ্ট্রে বিরাজমান অশুভ বোধটির সঙ্গে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব 'নোঙর'-এর উপপাদ্য বিষয় নয়। মধ্যবিত্তের ক্ষয়চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে। কামালের মতো মধ্যবিত্ত যুবকদের আশা, বিশ্বাস, সততা ও সাংগঠনিক ইচ্ছা নিজের দেশ ও পরিবারকে একই সঙ্গে একই মানসিকতায় ভালোবাসার মধ্যে তার শুভবোধ যতটা প্রসারিত হয়েছে, ততটা প্রকাশিত হয়নি দেশের অশুভকে দূর করবার পথ সন্ধানের প্রচেষ্টায়। সে বলেছে, "এই সমাজের অঙ্গ আমি, এই পরিবেশেরই অংশ। যখন এই পুঞ্জীভূত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত লোক মহাক্রোধে জেগে উঠবে বন্যার উদ্দামতা নিয়ে তখন এখান

কার এই শাসক সমাজ খড়ের কুটার মত মিলিয়ে যাবে" —এমন ধরনের উপলব্ধির কারণে কামাল কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ধারায় চিন্তাবিদ্ না হয়েও একটা আশাবাদী ধারণা রেখে যেতে সক্ষম হয়। সে নিজে অন্যায় করেনি, খাঁটি থেকেছে।

আবু রুশ্‌দের উপন্যাস প্রায়-সার্থক হয়েছে বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও দ্বন্দ্ব তুলে ধরার জন্য। কিন্তু তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়নি এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রসারতা অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। তিনি তাঁর নায়ককে আশাবাদী করেছেন কিন্তু এ আশাবাদ ভাববাদেরই অন্য রূপ। কামাল পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া মানসিকতার দৃষ্টান্ত। উচ্চ শিক্ষাজাত সংস্কৃতি এবং মহৎ আদর্শ নিয়ে সে একটি নতুন রাষ্ট্রে এসেছে। এখানে সে আগন্তুক। কারণ সে স্বাতন্ত্র্যবাদী বাঙালী মুসলমান যেমন নয়, তেমনি সমাজতন্ত্রবাদীও নয়। অর্থাৎ পাকিস্তানে তার আসাটা রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে যাচাই করা নয়। ভাববাদী একটা আদর্শ নিয়েই সে এসেছে। তার লড়াই শুরু হল অশুভের সঙ্গে —ব্যক্তিগত একক লড়াই সেটা। কামালের মধ্যেই ধরা পড়ে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া মানসিকতার সীমাবদ্ধতা। আমরা দেখেছি, কামালরা ওর বেশী আর এগোতে পারছে না। সামন্তবাদী মূল্যবোধ সে পছন্দ করে না কিন্তু ভেবে দেখে না, সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন দুটো কিভাবে অশুভ চেতনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সে একক প্রচেষ্টায় এমন দুটো প্রবল শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে না! কামাল বুর্জোয়া চেতনার কিন্তু বুর্জোয়া যখন মানবমুক্তির সঠিক পথটি বেছে নিতে চায় তখন সে ভাববাদী কল্পনাবিলাস ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক পথের কথা ভাবে। এ কথা নিশ্চিত যে, কামালরা শ্রেণীচ্যুত হবে না। অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভ তার শ্রেণী থেকে বের হয়ে এসেছিল কেন না সে বিকাশোন্মুখ দেশীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, কামালের মতো মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরে নয়। শুভ জমিদারের অন্য পাঁচজন ছেলের মতো নয়, আবার ইউরোপে শিক্ষিত এ দেশীয়-দের মতো তার আচরণ নয়। কেন না জমিদারের ছেলে এবং ইউরোপ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তি কেউই শিল্পপতি হতে চায় না, এরা ছক-কাটা একটা সহজ জীবন চায়। শুভ শুধু শিল্পপতি হতে চায় না, শ্রেণীচ্যুতও হতে চায়। তার মতো লোকের পক্ষে শ্রেণীচ্যুত হওয়া অসম্ভব নয়। কেন না সে চাকরিজীবী নয় এবং তার পশ্চিমী শিক্ষা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। এ শিক্ষা তাকে একটা মোহ-মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েছে। ভাষা আন্দোলন যে পর্বে শুরু হবার অপেক্ষায় সে সময়ের ঠিক আগে সরদার জয়েনউদ্দীন ও আবু রুশ্‌দ উভয়েই তাঁদের উপন্যাসের কাহিনী শেষ করেছেন। হয়তো তাঁদের প্রত্যাশা ছিল ভাষা আন্দোলনের নতুন আবেদন ও গতির কাছে। উপন্যাস রচনাকালে যে

আন্দোলন তখন প্রবল ধারায় শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে পরিপুষ্ট করে তুলছিল।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (ঢাকা, ১৯৬৫) উপন্যাসের পটভূমির বিস্তারই সর্বাধিক। এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের রেখাবয়ব দেবার চেষ্টা করেছেন 'সংশপ্তক' উপন্যাসের স্রষ্টা। এ গ্রন্থে রয়েছে উনিশশো আটত্রিশ থেকে একান্নো সাল পর্যন্ত উভয় বাংলার একটা সামগ্রিক চিত্র। ঘটনার বিষয়বস্তু ও মূল চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে গ্রাম ও শহর বাংলাকে কেন্দ্র করে। আটত্রিশ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের পূর্ব সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের যুগান্তরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসের কাহিনীতে।

পড়ন্ত জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও জাহেদ সংস্কারমুক্ত সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ধারার কর্মী। পাকিস্তান আন্দোলনে দুই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর মূল নেতৃত্ব ছিল অবাঙালী মুসলমানের হাতে। অবাঙালী নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা বুর্জোয়া ও সামন্তস্বার্থের প্রতিনিধি ও সংরক্ষক। কিন্তু আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি বামপন্থী চেতনাও কার্যকর ছিল। এই চেতনা বুর্জোয়া ও সামন্তস্বার্থের বিরোধী এবং প্রধানত তরুণ সমাজের মধ্যে এই চেতনা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ জাহেদ পাকিস্তান আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ এই বামপন্থী ধারারই প্রতিনিধি। এ আন্দোলনের পক্ষে সে প্রচারে নেমেছে। তাকে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছে অনন্যোপায় হয়ে। কারণ জাহেদ বুঝতে পারে হিন্দু প্রতিবেশীর সঙ্গে সহাবস্থানের কোনো পথ এ দেশীয় মুসলমানদের নেই।[৯০] পড়াশোনা উপলক্ষে তাকে কলকাতায় থাকতে হয়। মুসলিম লীগের সংগঠন ও প্রচার কাজ চালাতে সে নিজের গ্রামে এসে প্রথমেই বাধা পেল সেকান্দরের কাছে। বয়সে কিছু বড় হলেও স্কুলজীবনে কাছাকাছি ক্লাসে পড়ত সেকান্দর। বর্তমানে সে হিন্দু-প্রধান গ্রাম তালতলির স্কুলের জুনিয়র শিক্ষক।

লেখক বাকুলিয়া-তালতলি দুটি পাশাপাশি গ্রামের ছক দিয়েছেন। গ্রামীণ জীবনের ঐ ছবিটি অন্য সব গ্রামের মতোই সামন্ততান্ত্রিক। সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আশরাফ-আতরাফের বিভেদের দৌরাত্ম্য ঐ কারণেই। এখানকার উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রাগৈতিহাসিক। উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর যোগাযোগ। গ্রামীণ জীবনে পড়ন্ত অভিজাত

৯০॥ জাহেদ এ বিষয়ে বলেছে, "আগত সেই স্বাধীন দেশে, স্বাধীন মর্যাদায় ওরা যে বাঁচতে পারবে সে নিশ্চয়তাটা খুঁজে পাচ্ছে না মনের ভেতর।" 'সংশপ্তক', (ঢাকা ১৯৭৫), পৃ. ১৬১।

পরিবারগুলিতে বর্ণসমারোহ রয়েছে, তবে সে বর্ণচ্ছটা অস্তগামী সূর্যের। গ্রামের বিচার ব্যবস্থাও স্বভাবতই সামন্ততান্ত্রিক। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মোড়ল ফেলু মিয়া নিজেই দুর্নীতিবাজ এবং ভণ্ড ধার্মিক। ফেলু মিয়ার দেশপ্রেম সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উৎসারিত। কারণ দেশকে ফেলু মিয়া নিজের জমিদারী রূপে গণ্য করে। তার সাগরেদ রমজানের মতো সেও লাম্পট্য ও সম্পদহানির কাজে লিপ্ত হলেও ঠিক রমজানের মতো একেবারে নীচ হতে পারে না। কারণ অভিজাত বংশে জন্ম বলে ফেলু মিয়ার আত্মসম্মানের একটা স্বতন্ত্র বোধ আছে। মুসলমান-প্রধান গ্রাম বাকুলিয়া। ইংরেজ আমলে হিন্দুসমাজ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণে বেশী পেয়েছিল বলে দরিদ্র বাকুলিয়ার চেয়ে তালতলির জীবন ধারণের মান অনেক উন্নত। পাকভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটো গ্রামেরই কিছুটা সক্রিয় অংশ ছিল।

বাকুলিয়ার মুসলমানরা দরিদ্র বলেই প্রায় সবাই অশিক্ষিত। সৈয়দ ও মিয়াবাড়ির ছেলেদের জন্য শুধু শিক্ষাদীক্ষা একচেটিয়া ছিল। কিন্তু কৃষকের সন্তান সেকান্দর মাস্টার অভিজাত বংশীয় না হয়েও বি. এ. পর্যন্ত পড়ে একটা অনন্য দৃষ্টান্ত রূপে গ্রামে অবস্থান করছে। সে এর বেশী পড়তে পারেনি অভাবের তাড়নায়। কৃষক ও দরিদ্র গ্রামবাসীর "অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্নেহ-প্রীতি আর বোধহয় অনেক আশা ভরসা ওকে ঘিরে" (৮৬)। সেকান্দর কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নয়; সে অসাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণী-সচেতন। আলিগড় আন্দোলন তখন উত্তর ভারতে চূড়ান্ত শক্তি সঞ্চয় করছে। জাহেদ উত্তর ভারতে গিয়ে আলিগড় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে, যেমন তার শ্রেণীর অনেকে সে সময়ে আসত। গ্রামে ফিরে সেকান্দরকে সে মুসলমানদের জাগিয়ে তুলবার আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করে; এও বলে যে, তাদের সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ইংরেজ শাসক আর হিন্দু বানিয়াদের বিরুদ্ধে। অবশেষে খুব একটা আগ্রহের সঙ্গে না হলেও সেকান্দর রাজী হয় জাহেদের সঙ্গে মুসলিম লীগের হয়ে কাজ করতে। যে জীবনকে অর্থনৈতিক শোষণ দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত করে রেখেছে সেই জীবন থেকে উদ্ধার পাবার স্বপ্ন জাহেদের চোখে। তার স্বপ্নে দেখা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের চিত্রটি এই রকম, "দেশের মাটি আমার, দেশের সম্পদ আমার, আমার মুক্তি কোটি কোটি মজলুমের পেটে দেবে অন্ন, গায়ে দেবে বস্ত্র আর মুখে ফোটাবে হাসির ছটা।" স্বার্থবাদী ভণ্ড স্বদেশ-প্রেমিক ফেলু মিয়াকে তাই সে হুঁশিয়ার করে দেয়, "আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখতে জেঁকে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু" (১৬৭)। জাহেদ বিশ্বাস করে যে, দরিদ্র সাধারণকে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে পারবে সেকান্দরের মতো ব্যক্তিরাই। কারণ এদের মতো ব্যক্তিরাই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ

করে। জাহেদের প্রচারে গণমুখী আদর্শ থাকাতে জনসাধারণ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপর দিকে শ্রেণীস্বার্থে আঘাত লাগাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই জাহেদের প্রচার কাজে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। জাহেদ এ সময়ে ঠিক শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য উৎসাহিত নয় আবার স্বদেশীআলাদের মতোও নয়। কারণ সে এ দেশের পিছিয়ে-পড়া নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য একটা শোষণমুক্ত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে। জাহেদের পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল, ঘরে এবং বাইরেও। এই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রচারক অচিরেই উপলব্ধি করল, "ওর সৎ আবেগ ওর সদিচ্ছাটাই সব কিছু নয়" (২৩২)। নিজের ঘরের অশান্তি (রাবুর বিয়ে নিয়ে যে গোলমাল) আর একই সঙ্গে মুসলিম লীগ বিরোধী স্বার্থ-সচেতন স্বদেশীআলা মুসলমানদের বিরুদ্ধতায় জাহেদ কলকাতায় চলে গেল। কলকাতাতে থেকেই সে দলের জন্য কাজ করবে বলে স্থির করল।

গ্রামে রইল সেকান্দর মাস্টার, যে জাহেদের অসমাপ্ত কাজ চালাবার দায়িত্ব বহন করবে, জনগণকে তাদের দাবি সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কঠিন আঘাতে সেকান্দর মাস্টারের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। "ঘরে ঘরে যুদ্ধের সর্বনাশ ডাকা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটাতে সান্ত্বনা, সহিষ্ণুতা আর আশার প্রতীক সেকান্দর মাস্টার। কিন্তু তাকে কি সান্ত্বনা দেবার আছে কেউ" (২৬২)? ঠিক 'গণদেবতা'র দেবুর মতোই সেকান্দর মাস্টারের জীবন। পরার্থে উৎসর্গীকৃত তারা কিন্তু যখন নিঃসঙ্গ তখনই ধরা যায় এই আদর্শবাদী পুরুষদের অসহায়তা। অন্যের দুঃখে বেদনা বোধ করে এরা, সাধ্যমতো প্রতিকারও করে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। যে জন্য দেবু জনগণের উপকার করবার বাসনায় রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিল সে রকম কোনো দলের আশ্রয়ে সেকান্দরকে দেখা যায় না। মুসলিম লীগের হয়ে সে কাজ করেছে সত্য কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক মানবদরদী ব্যক্তিটি কখনো নিজেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী রূপে সুস্পষ্ট করে তোলেনি। বাকুলিয়া-তালতলির জীবনচিত্র 'পঞ্চগ্রাম'-এর মতো —একই চিত্র একই রকম সামাজিক অবস্থান। কারণ, অর্থনৈতিক কাঠামো তারাশঙ্করের বীরভূমেও যা শহীদুল্লা কায়সারের নোয়া-খালিতে তাই-ই।

কাহিনীর মূল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে মালুকে দিয়ে। সে পরের আশ্রয়ে কৈশোর কাটিয়েছে। তারপর একদিন আত্মসম্মানের দায়ে নিজেই অজানা জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। নিজেকে সে খ্যাতিমান লোকশিল্পী, পল্লী-গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। মালু অসাম্প্রদায়িক। গায়ক হিসাবে সে যে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। সে বহু চরিত্র ও তাদের আচরণ দেখেছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে। মালু আর সেকান্দর মাস্টার নিঃসঙ্কোচে বাকুলিয়া-তালতলির উভয় সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ প্রীতি লাভ করছে। মালু ঘটনার

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঘটনার নিয়ন্তক নয়। কারণ যুদ্ধ, যুদ্ধের বিভীষিকা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পৈশাচিকতা, রাজনৈতিক দলাদলি সব কিছুর সে দর্শকমাত্র। ঘটনার পরিণতি দেখে সে আলোড়িত হয় কিন্তু সে কোনো বিষয়ে উদ্যম দেখায়নি বা প্রতিকারের চেষ্টা করেনি। যদিও তার শিল্পীসুলভ ঔদার্য, মানবিকতাবোধ তার মধ্যে এমন একটা চেতনা জাগিয়েছে যে এমন ধরনের বিপর্যয়ের প্রতিবিধান আবশ্যক। স্বল্পশিক্ষিত মালুকে অবশ্য মহৎ কাজে উদ্যমী করে তোলা যেতে পারে এমন ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন।

আমরা জানি, আমাদের শহরের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো স্থিরতা নেই। এখানে নিত্য নতুন অনুকরণ তৎপরতা। এর কারণ দেশীয় সংস্কৃতির নিম্নস্তর বর্তিতা। গ্রামে এই অনুকরণ তৎপরতা নেই, কেন না গ্রাম হচ্ছে অর্ধচেতন। শহরের তথাকথিত আধুনিকতা প্রীতির কারণে মালুদের মতো লোকশিল্পীর কদর কমে গেল। প্রকারান্তরে এটা শহরের কাছে গ্রামের সাংস্কৃতিক পরাভবেরই প্রতিচ্ছবি। মালুর তাহলে কি করণীয়? লেখক দেখাতে চেয়েছেন, মালুর মতো শিল্পীদের প্রয়োজন ও আদর আছে তাদের যোগ্য জায়গায়। গ্রামীণ জীবনে তার গানের কদর সীমাহীন। সে জাগরণী গান গেয়ে জাগাতে পারে অচেতন গ্রামবাসীদের, নিতে পারে চারণ কবির ভূমিকা। জেহাদী সুরে, জেহাদী গান সে শোনাবে মুক্তিকামী সহজ সরল মানুষকে। শহরে ব্যর্থ বিবাহিত জীবনে এবং শিল্পী হিসাবে সে লাঞ্ছিত হয়েছে। তার প্রত্যাবর্তন এবার গ্রামে —তার নিজস্ব এলাকায়। মালু জাহেদের কাছে একটা সার্থকতার পথ খোঁজে। নিজেকে সে বাবুদের সমাজসেবালমূক কর্মোদ্যমে জড়িয়ে ফেলে।

জাহেদের সমাজতন্ত্রবাদী কর্মসূচী আঁকা হয়েছে রেখাচিত্রে। কলকাতায় তাকে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মিটিং-এ আর প্রাক্-স্বাধীনতা কালের শ্রমিক-কর্মী রূপে। দেশ বিভাগের পর জাহেদের কর্মক্ষেত্র হল কুলিমজুরদের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে সে ক্রমাগত জনসাধারণের মুক্তির একটা উপায় খুঁজছে। তার ঐ সঠিক পথ সন্ধানের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ দেশের তরুণদের সঠিক পথ খোঁজার প্রয়াস। ভাববাদা রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক পথ এরা খুঁজছিল। কিন্তু সে সময় রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হবার দরুন অস্থির ও অনির্দিষ্ট বর্তমানে অবস্থান করে জাহেদের মতো নিঃস্বার্থ কর্মীরা যোগ্য পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। জাহেদ গ্রামে মুসলিম লীগের প্রচার কাজে বাধা পেয়ে এরপর থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় অসাম্প্রদায়িক কর্মক্ষেত্রে তৎপর থেকেছে। মালু, জাহেদ —এদের চাহিদা ও যথার্থ ক্ষেত্র জনজীবনের মাঝে। মালু বা সেকান্দর দলগত রাজনীতি পছন্দ করে না যেমন করে না গ্রামের সাধারণ মানুষরাও। কিন্তু লেখক জানেন, "ওরা চলমান মানুষ। কোথাও থমকে দাঁড়ায় নি ওরা" (৫৫০)। আর

জাহেদের দৃঢ় বিশ্বাস, "জীবনের পূর্ণতা একদিন আসবে, কোন না কোন পথে" (৫৫১) —এ বিশ্বাস মালুও পেয়েছে তার কাছ থেকেই।

শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মতো শহীদুল্লা কায়সারও মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে বিশ্বাসী। মালুর সম্ভাবনা যদিও তিনি দেখিয়েছেন কিন্তু সে প্রায় অচেতন চরিত্র। তিনি মালুদের শ্রেণীকে জাগাতে চাচ্ছেন কিন্তু জাহেদদের নেতৃত্বে। সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত ও কর্মক্ষেত্র 'সংশপ্তক'-এ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অনুচরেরা শোষণের মুঠিতে চেপে গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। নিষ্ঠুরতার ইতিহাস বহন করছে শত শত শূন্য ভিটা আর জীবনী-শক্তিহীন মানুষ —এ ধরনের একটা চিত্র তিনি দিয়েছেন। সাম্যবাদী প্রচার অবশ্য জাহেদের আচরণে ও বক্তব্যে ইঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে জাহেদের মতবাদ যে আঘাত হেনেছে সেটা বোঝা যায় যখন তাকে কারাগারে যেতে হল। সে কারাবন্দী হল কিন্তু তার হয়ে অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করবে রাবু, সেকান্দর, মালু এবং আরও অনেক লাঞ্ছিত জন। এ উপন্যাসে, 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'-এ যেমন রয়েছে তেমন কোনো সনাতন ধর্মীয় চেতনার কথা বলা হয়নি। বরং ধর্মের নামে অত্যাচার ও গোঁড়ামীর সমালোচনা রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো শহীদুল্লা কায়সারও স্বপ্ন দেখেছেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। দেখেছেন একই রকম অনুজ্জ্বল বাস্তবে অবস্থান করেই। তবে শহীদুল্লা কায়সার বুর্জোয়া চেতনাসম্পন্ন লেখক। সে জন্য তিনি জনগণের মুক্তির পথকে চিহ্নিত করেছেন। আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে না হলেও ভাববাদের ওপরে কতকটা উঠবার প্রয়াসী তিনি হয়েছেন। তারাশঙ্কর যেখানে একটা সামন্তবাদী ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে সনাতন ধর্মের জয়গান গেয়েছেন সেখানে শহীদুল্লা কায়সার ইহলোকের সমস্যার জন্য পারলৌকিক কিছু ভাবেননি।

রাবু 'সংশপ্তক'-এর একটি প্রধান চরিত্র। তার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে এ দেশের নারীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। রাবুর মতো মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা কলকাতায় থেকে উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও বুর্জোয়া সভ্যতার অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বুর্জোয়া সভ্যতার অঙ্গ হতে পারে না অবশ্য পুরুষরাও। পদে পদে আসে সামন্তবাদী সামাজিক চাপ ও বাধা। রাবুকে এ কারণে বেশবাসে হতে হয় সামন্তরীতির অধীন। শিক্ষা গ্রহণের ফলে সে হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বময়ী রমণী। গ্রামের অবলা রাবু একদা অত্যাচারী পিতার ভয়ে বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ পীরের স্ত্রী হতে হয়েছিল। কিন্তু পরে সে উচ্চশিক্ষার দৌলতে পরিবারের সকলের অমতে বৃদ্ধ স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করবার মতো সাহস সঞ্চয় করেছে। অবশ্য এমন সাহসী প্রত্যাখ্যানের পেছনে জাহেদের প্রতি তার ভালোবাসাও কার্যকর ছিল। রাবুও গ্রামে ফিরে এসেছে। শিক্ষকতায়,

দুঃস্থদের সেবায় সেকান্দরের মতো সেও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। জনজীবনের মধ্যে প্রসারিত হল তার জীবন। রাবু জাহেদের প্রেমে উজ্জ্বল হয়েছে, হয়েছে যোগ্য শিষ্যাও।

রমজান চরিত্রটি ক্রূর, বলদর্পী, ক্ষমতালোভী এবং শক্তিশালী। লেখকের অতুলনীয় সৃষ্টি রমজান। 'গণদেবতা'র শ্রীহরি রমজানের স্বগোত্র। সে লম্পট, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, পিশাচ। কিন্তু তারাশঙ্কর শ্রীহরিকে ধার্মিকতার আচ্ছাদনে পাশ কাটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। যদিও পঞ্চগ্রামের সবাই জানে, শ্রীহরি কতটা পাষণ্ড কিন্তু শেষ অবধি শ্রীহরির কোনো রূঢ় সমালোচনা নেই। রমজানের পরিণতি সে তুলনায় একেবারে বাস্তব। বাস্তব বলেই খাঁটি পাষণ্ড চরিত্র রূপে সে চিহ্নিত হয়েছে। রমজান ছিল ফেলু মিয়ার নায়েব। উত্তরোত্তর সে হল তালুকদার, প্রেসিডেন্ট, সব শেষে নিজের নামে গ্রামের স্কুলটি কিনে নিয়ে তার সর্বময় কর্তা। এ দেশীয় এক শ্রেণীর লোকের সম্পদ, শক্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের কলুষিত রাস্তাটিই হচ্ছে রমজানদের রাজপথ। শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত রাজনীতি এদের প্রশ্রয়দাতা, লালনকর্তা। সাধারণ মানুষ এদের অশুভ শক্তিকে ভয় পায়। কুটিল স্বার্থপর রমজান ধাপে ধাপে এগিয়ে সমাজের যে উঁচু স্থানটি দখল করেছে তার প্রতিটি সোপান উত্তরণের সঙ্গে সে রেখে গেছে তার জীবনে আহরিত ও আচ্ছাদিত পাঁকের নোংরা ছাপ। সে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ক্ষমতার আদুরে সন্তান। সমাজের কর্ণধার এই সম্পদশালী কানকাটা রমজানের সামাজিক অবস্থান যত উঁচুই হোক না কেন, সাধারণের চোখে সে নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্র। রমজানরা অভিশাপে মরে না, সেকান্দরের মতো নিঃস্বার্থ জনদরদী ব্যক্তির অভিশাপ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। লেখক বলেছেন যে, কারুর "ভগ্নশ্বাস ঝড় তুলতে পারেনি। অনুকূল বাতাসে তরতর করে এগিয়ে গেছে রমজানের পালতোলা নৌকা" (৫০১)।

আদর্শহীন অথচ আত্মস্বার্থে সফল এই অশুভ চরিত্রটিকে কেন লেখক এত গুরুত্ব দিলেন, এমন সজীব করে তুললেন? শহীদুল্লা কায়সার নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে কারাভোগ করেছেন। রমজানদের সমাজে নির্ভয়ে বসবাস করতে দেখে তাদের স্বরূপকে চিনতে জানতে যাতে অন্যরা বিভ্রান্ত না হয় সে জন্য তিনি চেনাতে চেয়েছেন রমজানদের, "রমজান যেন মর্মান্তিক আর করুণ কোনো কৌতুক নাটকের নায়ক। তাকে ঘিরে যেন ইতিহাসের প্রহসন" (৫০৩)। মালুর দৃষ্টিতেও রমজানদের স্বরূপ ঐভাবে উদঘাটিত হয়েছে।

মুসলমান কৃষকদের মতো নারীরাও সামন্ততান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। লেখক খোলাখুলিভাবে শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু সাম্যবাদী জাহেদকে কারাগারে নিয়ে যাওয়াতে

শাসকদের স্বরূপ কতকটা স্পষ্ট হয়। জাহেদ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নয়। কিন্তু সবার দৃষ্টিতে সে এমন একটা আদর্শবান কর্মী-পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত যে, তার প্রাধান্য প্রবল হয়ে উঠেছে। 'সংশপ্তক'-এর নায়ক আতরাফ মালু আর নায়িকা মালুর অগ্রজাতুল্য রাবু। আর এদের দৃষ্টিতে আদর্শায়িত জাহেদ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা বরেণ্য চরিত্র রূপে পরিগণিত হয়। এ গ্রন্থে সব চেয়ে কাছের, সব চেয়ে প্রিয় হচ্ছে সেকান্দর। জয়লাভ করে অথবা আমৃত্যু রণক্ষেত্রে লড়াই করে—এমন যোদ্ধাদের এখানে জীবন্ত করে চিত্রিত করা হয়েছে।

শহীদুল্লা কায়সার বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের আগে এ উপন্যাসের কাহিনী শেষ করেছেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর নিজেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আরও অনেকের মতো এই ভাষা আন্দোলনের কাছে তিনি অনেক প্রত্যাশা করেছিলেন, এর অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট সংগ্রামী চরিত্রগুলি সংশপ্তকের শপথে উজ্জ্বল। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মতো একটা সুনিশ্চিত প্রত্যয় শহীদুল্লা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে আরোপ করতে পারেননি। মানিকের প্রতিভা হয়তো তাঁর ছিল না। তিনি কারাভোগ করেছেন এবং তাঁর সমাজও কম অগ্রসর ছিল। মানিকের পাঠকের সঙ্গে পূর্ব বাংলার পাঠকের কিছুটা পার্থক্য বর্তমান। পূর্ব বাংলার পাঠক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও মানিক কারাভোগ করেননি, শহীদুল্লা কায়সার করেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয় শহীদুল্লা একটা নিষেধের মধ্যে ছিলেন। পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতার তৎপরতা মার্কসবাদী রাজনীতিকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল। তবু জনজীবনকে ভালোবেসে সেই নিপীড়িত জীবনকে পরিবর্তন করার সংগ্রামী মনোভাব তাঁর উপন্যাসে আভাসে হলেও সঞ্চারিত বলে তিনিও পাঠকের হৃদয়ে স্থান পান একজন রাজনীতি-সচেতন শিল্পীর পরিচয়ে।

উপন্যাস রচনা বুর্জোয়া চেতনার সহগামী। বুর্জোয়া চেতনা বিকাশিত হলে তবেই আসে উপন্যাস। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে এই চেতনার বিকাশ নানা ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়েছে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল মূলত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন ও বিকাশের প্রয়োজনে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুগঠিত ছিল না, তার মন ছিল সামন্তবাদের হাতে বন্দী। পূর্ববর্তী কালে তাই সার্থক উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়নি। মীর মশাররফ হোসেন বা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর লেখা প্রকৃত অর্থে উপন্যাস নয়। সামন্তবাদী মানসিকতা নিয়ে উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়—এই সত্য তাঁদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

মীর মশাররফ জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা ও তাদের জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে সমালোচনাপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আধুনিক

শিক্ষা পাননি, চাকরিও পাননি ডেপুটিগিরির। নিজেকে তিনি জমিদার বংশের বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং কর্মজীবনে জমিদার বাড়িতে কাজ করেছেন, তাই বুর্জোয়া চেতনা তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠেনি যা থাকলে উপন্যাস রচনা করা যায়। কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, কিন্তু কোন পথে কৃষকের মুক্তি আসা সম্ভব তার সন্ধান তাঁর জানা ছিল না। ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে এটা কল্পনা করাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কাছে আবেদন করাই একমাত্র উপায় জ্ঞান করেছেন ('জমীদার দর্পণ' স্মরণীয়)। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর চেতনাও গভীরভাবে সামন্তবাদী। তাঁর কল্পনায় পুথির উপকরণ বিদ্যমান। তবে তিনি ইংরেজ বিরোধী ছিলেন। কারাগারে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে। সময়ের দিক থেকে যেমন, রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকেও তেমনি, তিনি প্রাগ্রসর ছিলেন মীর মশাররফের তুলনায়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনা তার মধ্যে না এসে পারেনি। আসার কারণগুলি আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি। নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চেতনা অধিকতর প্রগতিশীল কিন্তু রূপকল্প বিচারে তাঁর উপন্যাস দুর্বল। এই দুর্বলতা প্রমাণ করে যে, সামন্তবাদী প্রভাব অবচেতনে তাঁর মধ্যেও ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম মধ্যবিত্তের সামনে সুযোগ ও সুবিধা এল। উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা অধিকতর সার্থকতা লাভ করল আগের তুলনায়। সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের আর সবার মতো বিশাল প্রত্যাশা ছিল নবসৃষ্ট পাকিস্তানের কাছে। তাঁদের প্রত্যাশিত সমাজ বাস্তবে গড়ে উঠল না। কিছুসংখ্যক তরুণদের মনে নতুনতর রাজনৈতিক চেতনা ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগল। অনেক সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী নতুন করে ভাবলেন কেন তাঁদের স্বপ্ন ব্যর্থ হল, সার্থক জীবনের ছকটাই বা কেমন হওয়া উচিত? পূর্ব বাংলার আলোচিত সব ক'টি রাজনৈতিক উপন্যাস কোনো না কোনো ভাবে জনগণের মুক্তির কথা ভেবেছে। অতীতকে বারবার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের সঠিক পথ নির্মাণ করবার এক আগ্রহে ব্যাকুল হয়েছেন ঔপন্যাসিকরা। ভবিষ্যতেও যেন বর্তমানের মতো দিকভ্রান্তি না ঘটে সে জন্য তাঁরা কোথাও প্রত্যক্ষে কোথাও পরোক্ষে সমাধানের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টাও করেছেন, যদিও তাদের সমাধান সর্বত্র বৈজ্ঞানিক নয়, স্পষ্টও নয়।

পূর্ব বাংলার সমাজ-জীবনে যে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করেছিল তার কারণ অর্থনৈতিক। এই বন্ধ্যাত্ব সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনি। শহরের মধ্যবিত্ত জীবন সদ্য গড়ে উঠছিল। তাকে উপন্যাসে উপস্থিত করবার ক্ষেত্রে অন্তরায় এই যে, ঐ জীবন সুদৃঢ় বা সুবিস্তৃত কোনোটাই নয়। সে জন্য দেখা যায় পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদের অনেকেই গ্রামীণ জীবন নিয়ে লিখেছেন। যেমন সৈয়দ

ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও শওকত ওসমান। এই গ্রামের জীবনে যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব আছে তা লেখকদের চোখে বড় হয়ে ওঠেনি। কেন না, তাঁরা এ জীবনকে অরাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবও গ্রামীণ জীবনে গভীরতা বা বিস্তার লাভ করতে পারেনি ; সে জন্য এঁদের উপন্যাসে রাজনীতি প্রায় অনুপস্থিত।

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি —এই আলোচনা লক্ষ্য করা গেল, এই অঞ্চলের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই কেন্দ্রীয় সত্য। এই শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ ও মানসিক প্রবণতা সমূহই রাজনীতিতে প্রতিফলিত। উপন্যাসের রাজনীতি দেশের রাজনীতিরই একটা সাহিত্যিক প্রতিরূপ। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীও কোনো স্থবির শ্রেণী না। তার মধ্যেও পরিবর্তন আছে, যদিও সে পরিবর্তন মৌলিক নয়। রাজনীতিতে এই পরিবর্তনও প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হচ্ছে শত্রু নির্ণয়ের ও নেতৃত্বের প্রশ্ন। এই উপমহাদেশের বড় শত্রু সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু বিদেশী সুতরাং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে তাকে শত্রুপক্ষ রূপে চিহ্নিত করা কঠিন কাজ হবার কথা না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সাম্রাজ্যবাদকে সব সময় শত্রু হিসাবে সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করা হয়নি। তার কারণ সম্ভবত দুটি। প্রথম কারণ, মধ্যবিত্তের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল ছিল, এখনও আছে। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদকে সুস্পষ্ট শত্রু রূপে চিহ্নিত করলে যে দায়িত্ব এসে পড়ে সেটা ভীতিকর, শত্রুর তখন বিরোধিতা করতে হয় এবং বিরোধিতা করতে গেলে তার হাতে নিগৃহীত হবার আশঙ্কা থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই দুই কারণই সত্য ছিল। স্বার্থ সূত্রে তিনি ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেটা একদিকে সত্য। তার চেয়েও বড় সত্য হল এই যে, তাঁর ও তাঁর শ্রেণীর পক্ষে ইংরেজকে ভয় করবার সঙ্গত কারণ ছিল। উভয়ত প্রভাবিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে তিনি শত্রু না বলে বরং মিত্রই বলেছেন, অন্তত 'আনন্দমঠ'এ। তার সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে 'আনন্দমঠ'ই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং প্রভাব বিস্তারকারী রচনা। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করেছে এবং এই মর্মপীড়া থেকেই তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আত্মরক্ষাকামীদের রাজনীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর আত্মপরিচয় কি? তিনি শুধু বাঙালী নন, যেহেতু তিনি ধর্মে বিশ্বাসী তাই তাঁর চূড়ান্ত পরিচয় তিনি বাঙালী হিন্দু, আরও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তিনি বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত। ইংরেজের মতো প্রবল শক্তির শত্রুতা করবে এমন শক্তি বা সাহস আত্মরক্ষাকামীদের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। তাই আপসের পথে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সামন্তবাদও এ দেশের সাধারণ মানুষের শত্রুপক্ষ কিন্তু মধ্যবিত্ত সামন্তবাদকে শত্রু মনে করেনি, বরং মিত্র মনে করেছে। এই মনে করবার পেছনেও

জাতীয়তাবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে একটা দূরত্ব বর্তমান তা পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যকার দূরত্বের অনুরূপ, এই অর্থে যে, এ ক্ষেত্রে শাসকরা ছিল পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রতিনিধি এবং শাসিতেরা সামন্তবাদী সমাজের। পুঁজিবাদী শাসকের হাতে নিগৃহীত হয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা সামন্তবাদকে আত্মসম্মান রক্ষার ও গৌরব করবার অবলম্বন হিসাবে প্রদর্শন করতে চাইল। তার মনোভঙ্গিটা হল এই রকমের —বড়াই করবার মতো বিষয় আমাদেরও আছে। জাতীয়তাবাদ তাই সামন্তবাদের দিকেই অগ্রসর হল। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে সামন্তবাদী মূল্যবোধকেই উঁচুতে তুলে ধরল। এই মূল্যবোধগুলিকে বেষ্টন করে আছে ভাববাদিতা ও ধর্মীয় চেতনা, যা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অসাধারণ মানুষের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি। ধর্মীয় চেতনা সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্রষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মঘাতী সংঘাতের কারণ হয়ে উঠেছে।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র বুর্জোয়া বিকাশের একজন অতিশয় উজ্জ্বল প্রতিনিধি। তিনি রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, বিজ্ঞান ও লোকরহস্যে তার আগ্রহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য, গদ্যের প্রবহমানতা, বক্তব্যের তেজস্বিতা, উপযোগবাদিতায় তাঁর আস্থা, ইউরোপীয় নৈতিকতায় ও সাম্যবাদে তাঁর জ্ঞান ও উৎসাহ সমস্ত কিছুই তাঁর মধ্যে বুর্জোয়া চেতনার বিকাশমান শক্তিকেই নির্দেশ করে। তবে এই বিকাশের ধারা খুব বেশী এগিয়ে যায়নি। পরাধীন দেশের বুর্জোয়াদের পক্ষে বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভবও ছিল না। কেন না সাম্রাজ্যবাদ তাকে বাইরে থেকে ঘিরে রাখে, অন্যদিকে সামন্তবাদ এই উপমহাদেশের বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে ভিতর থেকে টেনে ধরে। সেই জন্য উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁস একদিন আপনা হতেই অবসিত হয়ে যায়, দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু প্রতিক্রিয়া রেখে যায় ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন। এ বাহিনী সমাজের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে থাকা সম্ভব নয়, শাসকরা তাকে কখনো টিঁকতে দেবে না। সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের তাই অরণ্যেই থাকতে হয়। অসাধারণ সাহিত্যিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আরণ্যক অবস্থানকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। আবার ভক্তি করতে হলে ভক্তির যোগ্য বীরও আবশ্যক। সেই বীরও তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই বীরে অলৌকিক মহিমাও আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে কোনো চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ হতে তিনি দেখালেন না। আয়োজনের তুলনায় পরিণতি হয়ে পড়ল সামান্য। তাই দেখি বিসর্জন এসে প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে যায়, কারো বা দ্বীপান্তর হয়, কেউ বা দেবীত্বের 'দোকানদারি' পরিত্যাগ করে সপত্নী-শোভিত

গার্হস্থ্য জীবনের প্রবেশ করে। পরিণতির এই সামান্যতায় শক্তির যে অপচয় আছে সে যেন রাজনৈতিক শক্তির অপব্যয়েরই প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু শাসককে ভয় পেতেন তা নয়। ভয় ছিল সাধারণ মানুষকেও, যে মানুষের দুঃখ দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন, যাদের পক্ষে তিনি 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখেছেন। এই ভয়ের কারণেই তাঁকে বলতে হয়েছে যে, আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। অর্থাৎ নেতৃত্ব থাকবে মধ্যবিত্তের হাতেই, তাঁর বাইরে যাবে না, এবং সমাজের শ্রেণীগত বিন্যাসকে কিছুতেই বিনষ্ট করা চলবে না।

রাজনীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ কম। তিনি সমাজকেই বড় মনে করেন রাষ্ট্রের তুলনায় এবং সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের তিনি অবসান চান। কিন্তু আধুনিক কালে সমাজ তো রাষ্ট্র ব্যবস্থারই ক্রীড়নক, পরাধীন দেশে তা আরও বেশী করে সত্য। রাষ্ট্র ক্ষমতার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তাঁর কালে বঙ্কিমচন্দ্রের কালের তুলনায় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। কাজেই রাজনীতিকে উপেক্ষা করা মোটেই সম্ভব ছিল না। তাই দেখি, রাজনীতি তাঁর রচনাতে নানাভাবে আসছে। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদী। সন্ত্রাসবাদীদের উগ্র কর্ম-তৎপরতার পেছনে তিনি প্রবৃত্তির তাড়না ক্রিয়াশীল হতে দেখেছেন। রিপুকে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুত্ব দিতেন এবং সে জন্য তাঁর সন্ত্রাসবাদীদের প্রথম কাজ ব্রহ্মচর্য পালন করা। আর আত্মসংযমে অপরাগ হয়েই যেন রবীন্দ্রনাথের অতীনরা সন্ত্রাসবাদী হয়েছে।

সন্দীপের স্বদেশী উগ্রতাকে তিনি বিভীষিকা বলে মনে করেছেন। নেতৃত্ব থাকবে নম্র ও উদার নিখিলেশদের হাতে। কিন্তু নিখিলেশের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা কৈ? তাদের চরিত্রে প্রবলতা কোথায়? সামন্তবাদীদের শক্তি যে ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে নিখিলেশের নম্রতা ও অপারগতা যেন সেই সত্যেরই উন্মোচক। অন্যদিকে জমিদার বিপ্রদাস সাম্রাজ্যবাদের হাতে দুইভাবে নিগৃহীত। সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্য ব্যবসায়ী মধুসূদন তাকে অপমানিত করে, অন্যদিকে বিলেত-প্রবাসী ভাইয়ের পড়াশোনা ও বিলাসিতার রসদ যোগাতে গিয়ে তাকে দেউলিয়া হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদের দুই বাহু তাকে বিধ্বস্ত করতে উদ্যত। ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজ এ ক্ষেত্রে একত্র হয়ে গেছে।

নিখিলেশ ও বিপ্রদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। তিনি নিজে জমিদার ছিলেন, কাজেই জমিদারের প্রতি দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়ত তিনি ব্যবসায়ীদের পছন্দ করতেন না, বণিক ইংরেজ তাঁর কাছে ছোট-ইংরেজ, বড়-ইংরেজ হল বুদ্ধিজীবী। বঙ্কিমচন্দ্রও অবশ্য বণিক ও শাসক ইংরেজের মধ্যে তফাৎ করেছেন এবং শাসক ইংরেজের সুশাসন কামনা করেছেন, বণিক ইংরেজের প্রতিষ্ঠাকে চাননি। বুদ্ধিজীবী ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সামাজিক পরিচয় ঘটবার সুযোগ ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারী প্রথার অন্যায়ের কথা বলেছেন, কিন্তু এমন প্রশ্নও করেছেন যে তাঁর নিজের জমিদারী তিনি কাকে ছেড়ে দেবেন? সাধারণ মানুষ নিজেদের নেতৃত্ব নিজেরাই দেবে, পঙ্গুরা নিজেরাই হবে নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক এমন বিশ্বাস তাঁর মধ্যে আসা সম্ভব ছিল না। 'কালান্তর'-এ তিনি যে 'সোস্যালিজ্‌ম', 'কম্যুনিজ্‌ম', 'সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম', 'বলশেভিজ্‌ম' ও 'ফ্যাসিজ্‌ম' প্রভৃতিকে এক করে দেখেছেন [দ্রঃ. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ. ৪২৫] তার কারণ এই নয় যে, এই সকল মতবাদ বিদেশী, তার প্রকৃত কারণ এই যে, এ ধরনের চিন্তা এ দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করলে সেই সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে —বঙ্কিমচন্দ্র যার অনুমোদক ছিলেন না, অনুমোদক রবীন্দ্রনাথও নন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে জাতীয়তাবাদী নন। জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতায় যে অশুভের ছায়া আছে তাকে তিনি জানতেন। কিন্তু অপর পক্ষে তিনিও বঙ্কিমের মতোই ব্যক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় বেশী করতেন, কেন না বঙ্কিমের অসামান্য মানুষরা যেমন দল গড়ে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্ররা তেমন কাজে আগ্রহী নয়। রবীন্দ্রনাথ দল গড়ার বিরোধী। কিন্তু, ব্যক্তি যে চূড়ান্ত বিচারে ক্ষমতাহীন রবীন্দ্রনাথের মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কবিও তা লক্ষ্য করেননি।

রাজনৈতিক চিন্তায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটবর্তী। তিনিও জাতীয়তাবাদী। 'পথের দাবী'তে তিনি সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। সামন্ত-বাদের প্রতি তাঁরও আকর্ষণ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মীরা যেমন অরণ্যে আশ্রয় নেয়, শরৎচন্দ্রের কর্মীরা তেমনি আশ্রয় নেয় বর্মায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী আত্মসমর্পণ করে না। সব্যসাচীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার একটা কারণ শরৎচন্দ্রের কালে সাম্রাজ্যবাদ আরও বেশী নগ্ন হয়ে পড়েছে। সব্যসাচী বাঙালী মধ্যবিত্ত স্বার্থ ও চেতনার প্রতিনিধি। তার মতে ভদ্রলোকরাই হচ্ছে সবচেয়ে নিপীড়িত। কৃষকরা তার চিন্তায় নেই। সমাজের সাংগঠনিক পরিবর্তন শরৎচন্দ্রও চান না। তাঁর বিপ্লব বৈপ্লবিক নয়, ইংরেজ-বিরোধী মাত্র।

শরৎচন্দ্রের তুলনায় তারাশঙ্কর সামন্তবাদের সঙ্গে অনেক বেশী আপসকামী। তাঁর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই ওজস্বিতা দেখি। এই ওজস্বিতা ভাববাদী পরিমণ্ডল থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সাহিত্যিক জীবনের সূচনায় তিনি সামন্ত-বাদী আবেষ্টনীর মধ্যে ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে কলকাতায় এলেও সামন্ত-বাদী মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করেননি। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তিনি রাজনৈতিক কারণে কারাভোগও করেছেন। তাঁর কালে রাজনীতি সমাজ জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নিয়েছিল। তাঁর রাজনীতি

মূলত গান্ধীবাদী। অর্থাৎ তা সামন্তবাদী হলেও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনিও চাচ্ছেন মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাক। সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁর কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তাঁর প্রথম সাহিত্যিক জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর রাজনৈতিক কর্মীদের ক্রিয়াকর্মকে চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যেতে ভয় পেয়েছেন, তারাশঙ্করেও সেই একই ভয় লক্ষ্য করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর ইংরেজকে আর ভয় পাচ্ছেন না, ভয় পাচ্ছেন তথাকথিত সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে। রুশ-বিপ্লবের পরে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী মার্কসবাদী চিন্তার ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের যে বিস্তার ঘটে তার প্রভাব এ দেশে লক্ষ্য করা গেছে। কম্যুনিজমে বিশ্বাসী আকর্ষণীয় চরিত্র তারাশঙ্করও এঁকেছেন। কিন্তু তাৎপযপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এই যে, তাঁর বিজয়দা যতটা না শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী, তার চেয়ে বেশী বিশ্বাসী গান্ধীবাদে। এ ধরনের কম্যুনিস্ট ব্যক্তিত্ব যে রাজনীতিতে ছিল না তা অবশ্য নয়।

বিপরীত পক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসবাদীরা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করে এবং একদা সন্ত্রাসবাদীরাও মার্কসবাদী হয়ে ওঠে। রাজনীতিতে মধ্য-বিত্তের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখেছেন, কিন্তু তিনি এই অবস্থার সমর্থক নন। আলোচ্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁকেই শুধু দেখি মধ্যবিত্তের শ্রেণীচ্যুতিতে এবং ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনে মুক্তির পথ আছে বলে প্রত্যয় রাখেন। কিন্তু তিনি সার্থক ঔপন্যাসিক হতেন না যদি শ্রেণীচ্যুতি ও সামাজিক পরিবর্তনের দুঃসাধ্যতাকে চিত্রিত করতে ব্যর্থ হতেন। তাঁর উপন্যাসে তারা-শঙ্করের ওজস্বিতা নেই, কেন না তিনি ভাবালুতাকে পরিহার করে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদিতা অবলম্বন করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তারাশঙ্কর এবং মানিকের সমসাময়িক আরও কয়েক জন লেখককে আমরা পেয়েছি যাঁরা রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর গান্ধীবাদী চরিত্রদের শিল্পসম্মত উপায়ে এক ধরনের মাহাত্ম্য আরোপ করতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কম্যুনিস্ট চরিত্রের ক্ষেত্রে সেই শিল্পোত্তীর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ তাঁর কম্যুনিস্ট বিরোধিতা নিরাসক্ত নয়। বনফুলও তাঁর উপন্যাসে কুৎসিত করে এঁকেছেন কম্যুনিস্টদের। এই কুৎসার ভিত্তি রচিত হয়েছে তাঁর আপন শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের চেতন-অবচেতন অভিপ্রায় থেকে। মনোজ বসু সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি একজন উদারনৈতিক অহিংস কংগ্রেসী। কিন্তু তাঁর উদারনৈতিকতা দুর্বলতারই নামান্তর। তাঁর ভালো-বাসা ঘৃণাহীন, ফলে অগভীর বলে মনে হয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো তাঁর কোনো নির্দিষ্ট ও জোরালো মত নেই।

অন্যদিকে মার্কসবাসী ভাবনা চিন্তা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু

তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। মার্কসীয় মতবাদের বিজ্ঞানের দিকের চাইতে আদর্শবাদের দিকটাই তিনি বড় করে দেখেছেন।

গোপাল হালদার মার্কসবাদী লেখক। আমরা জানি যে, কম্যুনিস্টরা বিচ্ছিন্নতা বিরোধী। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের নায়ক অমিত কম্যুনিস্ট হয়েও আত্মমুখী। ফলে তাকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। নিজের পরিচিত ও পরিজনদের সাহায্য করতে উন্মুখ অমিত বিশ্বাসযোগ্য ও মানবিক। কিন্তু বিশ্বমানবের মুক্তি-চিন্তায় তাকে মগ্ন হতে দেখে তাকে তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এর কারণ হচ্ছে পরিচিতরা নিকটের লোক কিন্তু বিশ্বমানব তার কাছে এক কষ্ট-কল্পনা মাত্র।

মূল সাহিত্য ধারার পাশাপাশি, প্রায় সমান্তরালে, গড়ে উঠেছে মুসলিম সাহিত্যধারা। বাঙালী মুসলমানরা উপন্যাস লিখেছেন ধীরে ধীরে। কারণ এই সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ নানা কারণে বিলম্বিত হয়েছে। বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের চেতনায় সামন্তবাদ প্রীতি হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় মোটেও কম ছিল না। এদের চেতনা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এমন কি অসাম্প্রদায়িক ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কাজী নজরুল ইসলামও নিজের অজান্তে পাকিস্তানবাদী মানসিকতাকেই পরিপুষ্ট করেছেন।

পূর্ব বাংলার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু আপাত বৈসাদৃশ্যের অভ্যন্তরে একটা সাদৃশ্য আছে। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতেও মধ্য-বিত্তের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত—নেতৃত্ব প্রথমে ছিল অবাঙালী মধ্যবিত্তের হাতে, পরে চলে গেছে বাঙালী মধ্যবিত্তের হাতে। কায়েমী স্বার্থের সমর্থক লেখক পূর্ব বাংলায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম, কেন না কায়েমী স্বার্থের ভিত্তি এখানে দুর্বল। বাহান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটা অসাম্প্রদায়িক গণ-তান্ত্রিক বোধকে বিকাশিত করতে সাহায্য করেছে। সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও চিন্তার ছাপ রাজনীতিতে যেমন উপন্যাসেও তেমনি লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু এই চেতনা ও চিন্তাধারা সুস্পষ্ট হতে পারেনি। তার একটি কারণ অনুশীলনের অভাব, দ্বিতীয় কারণ ভীতি। এ ক্ষেত্রে লেখকরা সমাজ-পরিবর্তনকে যে প্রধানত ভয় করেছেন তা নয়, ভয় পেয়েছেন শাসক সম্প্রদায়কে। বামপন্থী রাজনীতির ওপর এখানে প্রবল নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল এবং সাহসী বামপন্থী লেখকদের কারা-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তদুপরি শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পূর্ব বাংলায় জন্মগ্রহণ করেননি। এর বস্তুগত কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধ্যাত্ব। এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো পূর্ব বাংলায় পেশাগত সাহিত্য-জীবী নেই। অর্থাৎ শুধু পাঠকের ওপর নির্ভর করে সাহিত্যচর্চা করা পূর্ব

বাংলায় সম্ভব ছিল না। পাঠকও অবশ্য লেখককে নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন শরৎ-চন্দ্রকে করেছে, তারাশঙ্করকেও। কিন্তু ততটা করতে পারে না যতটা সরকার বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পারে যদি লেখক হন সরকারের বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। প্রকাশ্য সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ উপন্যাসেই আমরা দেখেছি বামপন্থী মতানুবর্তী রাজনৈতিক চরিত্রগুলি কারারুদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার উপন্যাসে চিত্রিত সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী চরিত্রসমূহের কারাদণ্ড প্রমাণ করে যে এ দেশে ঐ ধরনের রাজনীতি বিপজ্জনক। কয়েক জন বামপন্থী লেখকের কারাভোগও ঐ একই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

এই অঞ্চলে—অবিভক্ত বঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব বাংলায়—রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম অনেক হয়েছে কিন্তু সে রাজনীতি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে পারেনি। এর কারণ নিহিত রয়েছে রাজনীতির পূর্বোল্লিখিত চরিত্রের মধ্যেই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ একদিন নিজের স্বার্থে যে সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, সমস্ত রাজনৈতিক উদ্যোগ ও প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই সমাজ নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বটে কিন্তু সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। মধ্যবিত্তই তাকে টিঁকিয়ে রেখেছে সমালোচনা করা সত্ত্বেও। তার একাংশ যখন চেয়েছে পরিবর্তন, বৃহৎ অংশ বাধা দিয়েছে। বেশীর ভাগ সময়ই মৌলিক পরিবর্তন চাওয়া হয়নি। রাজনীতির চিন্তাপ্রধান বাংলা উপন্যাসসমূহ যেন এই মূল সত্যেরই বিভিন্ন প্রকার স্মারক চিহ্ন। কোনোটি স্পষ্ট, কোনোটি বা কিছু কম স্পষ্ট।